শিশুসাহিত্যভগীরথ যোগীন্দ্রনাথ সরকার

রঞ্জিতা কুণ্ডু

ইণ্টারন্যাশানাল লিটেরেচার এ্যাসোসিয়েশান
১৯, এস, এন, ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৩

প্রথম সংস্করণ— ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীসুরপতি চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
ইণ্টারন্যাশানাল লিটেরেচার এ্যাসোসিয়েশান
১৯, এস, এন, ব্যানার্জী রোড,
কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রণ :
"প্রিন্টোগ্রাফ" ১৯, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

দিদিমা,

জীবন-উষার অরুণরাগে,
মনে পড়ে সবার আগে,
তুমি এবং হাসি খুসি দাদু
আমার ধূলোখেলার ঘরে,
কোন মায়াতে কেমন করে,
ছড়িয়ে ছিলে কি মোহ, কি যাদু।

কিছু বা তার আছে মনে
জীবন পথের সন্ধিক্ষণে,
কিছু বা তার হারাল কোন্ দেশে।

স্মৃতিসাগর মন্থন করি,
কিছু তাহার উধার করি,
ডুব দিয়ে তায় ডুবুরীরই বেশে॥

সেই মণি ও মুক্তাতে
গাঁথা মালা এই দু হাতে
জানি না এর কিবা আছে দাম।

যষ্ঠনববিংশতিতে,
আছ তবু দানটি নিতে,
সেই খুশীতে তোমারে তাই জানাই এ প্রণাম।

রঞ্জিতা

নিবেদন

আমার পরিচিত এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার শেষ দিকে অধৈর্য্য শ্রোতাদের স্থানত্যাগ করতে উদ্যত দেখলে উচ্চকণ্ঠে বলতেন, "আপনারা যাবেন 'না। আমার আরও কিছু বলবার আছে।" বলা বাহুল্য তাঁর এ আবেদন শ্রোতাদের কৌতুকের খোরাক জোগাত। আমিও কিন্তু সেই কথা দিয়েই আরম্ভ করছি। গ্রন্থের মূল অংশে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে অনেক কথাই তো বলেছি কিন্তু তবুও আমার যে আরও কিছু বলবার আছে। তবে অধৈর্য্য পাঠককে আমি ঐ ভদ্রলোকের মত নিষেধ করব না। ভাল না লাগলে তাঁরা অনায়াসেই এ অংশ উপেক্ষা করে যেতে পারেন।

আমার মনে হয়, শিশু সাহিত্যের পথিকৃৎ যোগীন্দ্র নাথ সরকারের সাহিত্য সাধনার বিষয় আজ পর্য্যন্ত যথেষ্ট আলোচনা হয় নি। অথচ আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিত জনকে এজন্য আক্ষেপ প্রকাশ করতে শুনেছি। এই রকম কয়েক জন বন্ধু বৎসর কতক পূর্বে আমাকে যোগীন্দ্র নাথের সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করেন। তাঁদের আগ্রহাতিশয্যে সসংকোচে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছিলাম, তা যে সম্পূর্ণ করে উঠতে পারব, সে দুরাশা ছিল না। ঐ কার্য্যসাধনে শুধু আমার ব্যক্তিগত অযোগ্যতাই অন্তরায় ছিল না। যোগীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ত্রিশ বৎসরের উপর গত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বন্ধুবান্ধব, অনুরাগী এবং আত্মীয়স্বজন যাঁরা তাঁর নিকট সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা জানতেন, তাঁরা অনেকেই আজ পরলোকে। সেইজন্য অনেক চেষ্টা করেও খুব বেশী কথা জানতে পারি নি। তবু যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, আজ তা গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করছি। ইতিপূর্ব্বে "যোগীন্দ্রনাথ সরকার" শীর্ষক আমার একটি নিবন্ধ ১৯৬৫ সনের ২৯শে অক্টোবর (১২ই কার্ত্তিক, ১৩৭২) সাপ্তাহিক "অমৃত"

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে কার্ত্তিক, ১৩৭৪ সনে যোগীন্দ্রনাথ শত-বার্ষিকী জয়ন্তী সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত স্মরণী গ্রন্থেও আমার আর একটি নিবন্ধ স্থান লাভ করে। ১৩৭২ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ "যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচনাবলী" নামে আমার একটি প্রবন্ধ অনুগ্রহ করে প্রকাশ করেন। মূলতঃ এই প্রবন্ধগুলির বক্তব্য নিয়েই আমার পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় রচিত হয়েছে।

১৮৯১ সন থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৭ সন পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৪৬ বৎসর যোগীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। তাঁর শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত "স্মরণী"তে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী লীলা মজুমদার, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, বনফুল, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি) ও স্বপনবুড়ো প্রমুখ অনেক প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার্পণ করেছেন। তবুও তাঁর সাহিত্য সাধনার সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার ভার ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য অপেক্ষা করে রইল। তাঁদের পথ যদি কিছুমাত্র সুগম করতে পারি, সেই আশায় এ পুস্তক প্রকাশ করছি।

যোগীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যখন তথ্য সংগ্রহ করছি, তখন বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু আমাকে হাস্যচ্ছলে বলেন, "দেখ, এমন কিছু লেখো, যা সকলে পড়তে পারে। সব বই যদি 'থিসিস্' হয়, তাহলে সাধারণ লোকে পড়বে কি?" তাঁর সে ইচ্ছাকে সম্মান দেবার জন্যও বটে, আবার আমার অযোগ্যতার জন্যও বটে, বর্ত্তমান পুস্তকটি আমার মত সাধারণ পাঠকদের জন্যই রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পালেরা যদি অনুগ্রহ করে এ পুস্তক পড়েন তো সন্তুষ্ট হব এবং শুধু সন্তুষ্ট নয়, কৃতার্থ হব যদি আমার ভুল ত্রুটি প্রদর্শন উপলক্ষ্যেও কোনও

সুধীব্যক্তি যোগীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে গবেষণামূলক একটি প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেন।

ছোটদের জন্য যে বই লেখা হবে, যে বই দেখে তারা আকৃষ্ট হবে, শুধু তার ভাষা নয়, রূপও মন ভোলান হওয়া চাই, এই সত্য যোগীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সকল গ্রন্থে, এমন কি, "খুকুমণির ছড়া" নামক মেয়েলি ছড়া সংগ্রহেও ছবির প্রাচুর্য্য পাই। একের পর এক ছবির বই শিশুদের, কিশোরদের উপহার দিয়ে যোগীন্দ্রনাথ তাদের অভিভাবকদেরও দৃষ্টিদান করলেন। তাঁরা বুঝলেন যে চিত্তাকর্ষক পুস্তক বালকের হাতে তুলে দিতে পারলে অবসর বিনোদনের জন্য সে কেবলই পড়ার ঘর ছেড়ে খেলার মাঠে ছুটবে না। সে যুগের বিখ্যাত স্বদেশসেবক শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী তাই বলেছেন, "We have known boys prefering Jogin Babu's books to actual play things". (ছেলেরা সত্যকার খেলনা ছেড়ে যোগীন্দ্রনাথের বইয়ের দিকে ঝুঁকেছে, এমন ব্যাপারও দেখেছি।)

যোগীন্দ্রনাথ যে যুগে লেখনী ধারণ করেছিলেন, তখন "সুরুচি", "সুনীতি" শব্দগুলি শুধু অর্থহীন শব্দমাত্র ছিল না। তাঁর রচনার মধ্যেও এই দুই আদর্শ বিরাজিত। কিন্তু তাঁর হাস্যকৌতুকের স্রোতের আবর্ত্তে পড়ে বালকবয়সীরা বুঝতেও পারে না যে তাদের এই রসিক দাদামশায় কত নিপুণ, অভিজ্ঞ শিক্ষক। তিনি শিশু ও বালকবালিকাদের হাসতে শিখিয়েছেন আর সেই সঙ্গে অভিভাবকদের বালকবালিকাকে হাসতে অনুমতি দিতে শিখিয়েছেন।

আর একটা কথা। বাংলা শিশুসাহিত্য আর বাংলা সাহিত্যে শিশু এ দুটি যে এক বিষয় নয়, সে কথা অনেকেই ভুলে যান। যে সাহিত্যে শিশুর বিষয় আলোচনা হয়, তাই যে শিশুসাহিত্য হবে, এমন নয়। শিশু বা কিশোরের যা বোধগম্য হবে, এবং সে যা উপভোগ করবে, তাই শিশুসাহিত্য। তা না হলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও ইংরাজী সাহিত্য জগতে একজন শিশুসাহিত্যিক

বলে গণ্য হতেন। বাংলায়ও এমন লেখক আছেন, যাঁদের রচনা শিশুপ্রেমিক উপভোগ করেন কিন্তু শিশু উপভোগ করে না। এই দুই শ্রেণীর রচনার মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদরেখা, তা নির্দেশ করে বাংলা শিশু সাহিত্যের বিষয় ব্যাপকভাবে গবেষণা করতে নিশ্চয়ই অগ্রসর হবেন অদূর ভবিষ্যতের কোনও কোনও গবেষক। সাহিত্য নিয়ে বিজ্ঞানের মত ল্যাবরেটরীতে 'একস্‌পেরিমেন্ট' চলে না নিশ্চয়ই। তথাপি যদি সত্যসন্ধানীর দৃষ্টি নিয়ে ঝাড়াইবাছাই করে কেউ সত্যকার শিশুসাহিত্যের মূল্যায়ন করেন, সেই সাহিত্যের ইতিহাসের পুরোভাগেই থাকবে যোগীন্দ্রনাথের নাম।

যোগীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার বিষয় কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই মনের মধ্যে সুপ্ত থাকলেও তাকে কার্যে পরিণত করবার ব্যাপারটা ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় আমার সহকর্মিণী বন্ধু গৌরীদি (৺নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বৌদিদি ডক্টর শ্রীমতী গৌরী গাঙ্গুলী) আমাকে শ্রীমতী আশা গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা একখানি বই দিলেন, "বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ।" বইখানিতে আশা দেবী অন্যান্য শিশুসাহিত্যিকের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধায় যোগীন্দ্রনাথের নাম স্মরণ করেছেন দেখে আমি পুস্তক রচনার ব্যাপারে নূতন করে উৎসাহ পেলাম। সেজন্য গৌরীদিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার পুস্তকের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সকল ইংরেজী আজগুবী ছড়া নিয়ে আলোচনা করেছি, আমার সহকর্মিণী বন্ধু শ্রীমতী ইলারাণী মল্লিকের সৌজন্যে একটি ইংরাজী সংগ্রহপুস্তকে সেগুলি একত্রে পাই। বইখানি বহুদিন আমার নিকট রাখতে দিয়ে তিনি আমার অনেক সাহায্য করেছেন। তার জন্য তাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। এরপর জাতীয় গ্রন্থাগারের বাংলা বিভাগের শ্রীমতী বাণী বসুর নিকট ঋণ স্বীকার করি। তিনিও তাঁর সঙ্কলিত শিশুসাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী পুস্তকটি আমাকে উপহার দিয়ে অশেষ উপকার করেছেন।

যোগীন্দ্রনাথের জীবনী অংশ রচনার অধিকাংশ উপকরণই পেয়েছি

আমার মেজমামা শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকারের নিকট। তিনি যোগীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর বিষয় বহু তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। নিজ জীবনের শেষ অবস্থায় যোগীন্দ্রনাথ যখন নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে অথর্ব্ব হয়ে পড়েন, তখন এই মেজমামাই (যাঁকে আমরা "কচিমামা" বলে সম্বোধন করি) যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর পুস্তক প্রণয়ণ ও প্রকাশে সাহায্য করতেন। পিতার পুস্তক প্রকাশনের ব্যবসায় এবং তার মাধ্যম "সিটি বুক সোসাইটি" নামক পুস্তকালয়টি তিনিই পরিচালনা করতেন। সেজন্য অন্যের অজ্ঞাত বহু তথ্য তাঁর জানা আছে। সে সব কথা তিনি আমাকে সাগ্রহে জানিয়েছেন। আমার গ্রন্থরচনার পূর্ব্বে মেজমামাই আমাকে যোগীন্দ্রনাথের রচনার তালিকা দিয়েছেন। যোগীন্দ্রনাথের রচিত যে সব পুস্তক আমার নিকট ছিল না, সেগুলি তিনি আমাকে উপহার দিয়েছেন, যোগীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে প্রকাশিত বিবিধ তথ্য, যোগীন্দ্রনাথের নিকট তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং গুণীজনের লেখা পত্রাবলী আমাকে দিয়েছেন। তাঁর (মেজমামার) স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত যোগীন্দ্র-নাথের বিষয় বহু কথাও আমাকে জানিয়েছেন। যোগীন্দ্রনাথের সপরিবারে গৃহীত আলোকচিত্রগুলিও তাঁর নিকট পাই। তিনি আমার প্রণম্য গুরুজন! তাঁকে ছাপার অক্ষরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার ঋণের বোঝা হাল্কা করতে চাই না। এ গ্রন্থ যে প্রকাশিত হল, তার জন্যই তিনি নিজের সব পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করবেন বলে মনে করি।

এ ছাড়া যোগীন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষদের বিষয় উপকরণ সংগ্রহে সাহায্য করেছেন যোগীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীযুক্তা নলিনী বসু (ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসুর পত্নী)। দেবেন্দ্রমোহন বসু প্রথম জীবনে যোগীন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন। তিনিও তাঁর "মাষ্টারমশাই"য়ের বিষয় কিছু তথ্য আমাকে জানিয়েছেন। যোগীন্দ্রনাথের বাল্য ও যৌবনের বিষয় কয়েকটি কৌতুককর

কাহিনী শুনিয়েছেন রুণিমামা (যোগীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় ডাক্তার অশোক কুমার মিত্র) আর কয়েকটি কাহিনী শুনিয়েছেন তাঁর প্রাক্তন ছাত্র স্বর্গীয় জীবনময় রায়। আমার দিদিমাও (যোগীন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী স্বর্ণলতা বা গিরিবালা দেবী, বর্ত্তমান বয়স ৯৬) তাঁর স্মৃতির থেকে কিছু উপহার দিয়েছেন আর নিজের মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে আমার বড়মামা ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ সরকারও দু একটি তথ্যের সন্ধান দিয়ে গেছেন। এঁদের সকলের নিকটই আমি ঋণী।

আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীজগৎপ্রসন্ন গুপ্ত মহাশয়কে ও ইন্টারন্যাশন্যাল লিটারেচার এ্যাসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ জানাই। জগৎপ্রসন্নবাবু এই প্রতিষ্ঠানের সত্ত্বাধিকারী শ্রীসুজয় শ্রীমলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে এবং সুজয়বাবু পুস্তক প্রকাশনার সর্ব্বরকম দায়িত্ব গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করেছেন।

তারপর আসে তাঁর নাম "সর্ব্বশেষের গানটি আমার আছে যাঁহার তরে।" তিনি যোগীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা আমার জননী পরলোকগতা বীণা দে। দাদামশায়ের সন্তানদের মধ্যে একমাত্র আমার মা তাঁর নিকট থেকে দূরে থাকতেন আমার বাবার কর্ম্মস্থলে। এজন্য দাদামশায় তাঁকে (এবং আমাদের জন্মের পর কখনও কখনও তাঁর পরিবর্ত্তে আমাদের বোনেদের) প্রতিদিন একখানি করে চিঠি লিখতেন। তার মধ্যে অধিকাংশই মা সযত্নে রক্ষা করেছিলেন এবং নিজ পিতৃদেবের মৃত্যুর পর সেগুলি একটি রেজিষ্টারে রেখে দিয়েছিলেন। এ চিঠিগুলি মার কাছে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল এবং আমি সেগুলির থেকে অনেক উপকরণ পাই। তা ছাড়া মাও নিজের শৈশব ও বাল্যকালের গল্প বলার সূত্রে দাদামশায়ের বিষয় বহু কথাই বহু সময় বলেছেন—একবারে নয়, একজায়গায় বসেও নয়, তবু সে স্মৃতিকথা আমার কাছে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আর সবচেয়ে সাহায্য করেছে এ

পুস্তক রচনা ও প্রকাশের বিষয় তাঁর আগ্রহ। মার জীবিতকালেই লেখা শেষ হয় কিন্তু তখনও প্রকাশের কোনও ব্যবস্থা করতে পারি নি। কবে এ পুস্তক প্রকাশিত হবে সে সম্বন্ধে মা ১৯৬৭ সালে মৃত্যুশয্যায় শয়ান অবস্থায়ও ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেছেন। বড় দেরী হয়ে গেল, তাঁর জীবনকালে এ পুস্তক প্রকাশিত হল না। এ ক্ষোভ আমার মনে চিরন্তন হয়ে থাকবে।

যোগীন্দ্রনাথের বিষয় আমার এই পুস্তকটিকে আমি তাঁর সম্বন্ধে সুধীজনের আলোচনার বীজ মনে করে প্রকাশ করছি। অনেক ত্রুটি থেকে গেল কিন্তু উপায় কি? আর কেউ যে ইতিপূর্ব্বে অগ্রসর হলেন না। তাই,

"মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।"

এইটুকুই আমার স্বপক্ষে বক্তব্য। ইতি—

খগোল, পাটনা — রঞ্জিতা কুণ্ডু

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	উৎসর্গ	
২।	নিবেদন	
৩।	প্রথম অধ্যায়—বর্ণমালা শিক্ষা ও হাসিখুসি	১
৪।	দ্বিতীয় অধ্যায়—যোগীন্দ্রনাথের আজগুবী ছড়া	২৩
৫।	তৃতীয় অধ্যায়—যোগীন্দ্রনাথের আজগুবী গল্প	৪২
৬।	চতুর্থ অধ্যায়—যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচনায় হাস্যরস	৬২
৭।	পঞ্চম অধ্যায়—যোগীন্দ্র সাহিত্যে আদর্শ শিক্ষাদান	৭৭
৮।	ষষ্ঠ অধ্যায়—যোগীন্দ্র সাহিত্যে প্রাণিতত্ত্ব ও শিকার কাহিনী	৯৩
৯।	সপ্তম অধ্যায়—"বিকাশ" ও "দীপ্তি"	১১৭
১০।	অষ্টম অধ্যায়—বন্দেমাতরম্	১২৮
১১।	নবম অধ্যায়—খুকুমণির ছড়া	১৩৬
১২।	দশম অধ্যায়—উপসংহার	১৫৫

দ্বিতীয় খণ্ড

১৩। যোগীন্দ্রনাথ সরকার

১৪। প্রথম খণ্ড—সংশোধন পত্র

১৫। দ্বিতীয় খণ্ড—সংশোধন পত্র

১৬। গ্রন্থপঞ্জী

১৭। পরিশিষ্ট

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

বর্ণমালা শিক্ষা ও হাসিখুসি

(ক)

বিদ্যাসাগর মশায় রচিত বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ আজও অনেক বাঙ্গালী শিশুর শিক্ষার সূত্রপাত করে। তবু এ বই দুখানি রচনার পূর্ব্বেও বর্ণমালা শিক্ষা দেবার জন্যই বিশেষভাবে রচিত কতকগুলি পুস্তকের সন্ধান পাই। তার মধ্যে স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত বর্ণমালা প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ উল্লেখযোগ্য। প্রথম ভাগের রচনাকাল আনুমানিক ১৮৪৯-৫০ সন এবং দ্বিতীয় ভাগের ১৮৫৪ সন। প্রথম ভাগে ৩৬ পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণমালা থেকে আরম্ভ করে ষত্ববিধি পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ পাঠ্য আছে। দ্বিতীয় ভাগে কিছু উপদেশমূলক গল্পও পাওয়া যায়।

শুধু যে শিশুর চিত্তবিনোদনের জন্যই এই গল্পগুলির প্রয়োজন হতে পারে কেবল তাই নয়, এর সাহায্যে তাদের শিক্ষাও দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব, স্কুল বুক সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষ'এ কথা জানতেন। সরলচিত্ত শিশুর কৌতুকপ্রিয় স্বভাব এবং জন্তু জানোয়ার প্রীতির ফলে শৃগাল ও সারসের গল্প বা ঐ শ্রেণীর কাল্পনিক কাহিনী স্বভাবতঃই তাকে মুগ্ধ করে এবং এই মুগ্ধতার অনুকূল বাতাসে শিক্ষাদান ব্যাপারটা নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ শিশুর চিত্তকে কখনই প্রসন্ন করে না। এবং "উপরোধে ঢেঁকি গিলতে" বাধ্য হলেও, তা তার পাকস্থলী পর্য্যন্ত পৌঁছায় না।

কিন্তু শিশুদের শিক্ষাদান করবার উদ্দেশ্যে তিন খণ্ড শিশুশিক্ষা রচনা করলেন যে পণ্ডিত, সেই মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ই তাঁর পুস্তকের তৃতীয় ভাগের "মুখবন্ধে" লিখেছেন,—

"কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত, শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ নির্ম্মলচিত্তে কোনপ্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত হংসীর স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ পাকস্থলী ও কাষ্ঠভার দর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন, পুরস্কারের লোভে বক কর্ত্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে

মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয় মধুর স্বরের পরিচয় দান প্রভৃতি অবাস্তব বিষয়সকল প্রস্তাবিত না করিয়া, সুসম্বন্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বন্ধ করা গেল।"

শ্রীমতী আশা গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন,—

"মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো রসিক কবি যিনি ভারতচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া 'বাসবদত্তা' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এই ভ্রান্তি বিস্ময়কর। তাঁহার 'পাখী সব করে রব' আজও শ্রেষ্ঠ শিশু কবিতা। চিত্তকে আর একটু সহৃদয় করিয়া এবং চিন্তাকে আরো কিছু প্রসারিত করিয়া দেখিলে মদমমোহন বুঝিতে পারিতেন, স্তুতিমুগ্ধ একটি নির্ব্বোধ কাকের কাহিনী শিশু মানসে যে শিক্ষার অঙ্কুরটি বপন করিয়া দিবে—দীর্ঘছন্দে রচিত গুরুগম্ভীর একটি নীতিনিবন্ধ তাহার এক দশমাংশও ফলপ্রসূ হইবে না,—হইতে পারে না।"

বস্তুতঃ শিশুর চিত্ত সত্য মিথ্যার আলোছায়ায় মায়ায় এক অপূর্ব্ব কল্পলোক সৃষ্টি করে। সেই লোকে প্রবেশ করবার চাবিকাঠিটি আমরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে হারিয়ে ফেলি। তবুও শিশু শিশুই, তাকে ঘুম পাড়াবার সময় তার চাঁদকপালে টিপ দিয়ে যাবার জন্য মা চাঁদমামাকে নিমন্ত্রণ করে, দুধ খাওয়ার সময়, "আয়রে পাখী লেজঝোলা" বলে পাখীকে আমন্ত্রণ জানান আর শিশুর বাল্যলীলা উপভোগ করতে করতে বলেন,—

"আয়রে আয় টিয়ে,
নায় ভরা দিয়ে,
'না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে,
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে,
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা,
খোকার নাচন দেখে যা।"

স্মরণাতীত কাল থেকে কত স্নেহমুগ্ধ জননী তাঁর সন্তানকে এমনি ছড়া বলেছেন। তাঁর নিমন্ত্রণে আকাশের নীল চন্দ্রাতপের সিংহাসন ছেড়ে চাঁদামামা কোনদিন নেমে আসেন নি, আর "ভোঁদড়"ও নিজের নৃত্য ভুলে খোকার নৃত্য উপভোগ করবার আমন্ত্রণ লিপি অগ্রাহ্য করেছে। তবু এ সব ছড়ায় নানাভাবে শিশুর জীবন গঠনে সাহায্য হয়েছে। শিশুকে মানুষ করবার জন্য মায়ের প্রচ্ছন্ন স্নেহই যথেষ্ট নয়, তার প্রকাশেরও প্রয়োজন।

এই ছড়াগুলি শুনে শিশুর চিত্তে মায়ের স্নেহের সম্বন্ধে একপ্রকার ধারণা জন্মায় এবং সেই ধারণা তাকে তাঁর উপর নির্ভর করতে শেখায়। মাকে ভালবাসলে তাঁর প্রতি যে নির্ভরতার ভাব আসবে, তারই ফলে শিশু জীবনপথে নির্ভয়ে অগ্রসর হতে পারবে। ছড়াগুলির দ্বিতীয় কাজ হল শিশুর ছন্দতৃষিত কর্ণকে পরিতৃপ্ত করা। তা ছাড়াও এর একটি তৃতীয় দিক আছে। সেটি হল শিশুর শব্দ-পরিচয়। বর্ণ পরিচয়ের মতই এরও মূল্য আছে। মায়ের বার বার বলা সত্ত্বেও চাঁদামামা মাটির বুকে নেমে আসেন না, কিন্তু ক্রমাগত চাঁদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে মাকে ঐ নামটি উচ্চারণ করতে শুনে শিশু চাঁদকে চেনে, মা যখন তার ললাট স্পর্শ করে কপাল বলেন, সে কপাল কথাটি শেখে আর অন্যান্য ছড়া থেকেও অন্যান্য বিশেষ্য শেখে। সুতরাং শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে কাল্পনিক ছড়া বা গল্পের ভূমিকা একেবারে তুচ্ছ নয়।

অবশ্য চিন্তায় ও কর্মে যিনি যতই অগ্রসরপন্থী হোন, কোন মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণ দেশকালের অতীত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগের মুখবন্ধে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালীর চিন্তাধারারই পরিচয় পাই। তবু এই তর্কালঙ্কার মহাশয়ই শিশু শিক্ষা প্রথম ভাগে লিখলেন সেই অবিস্মরণীয় কবিতা :

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগনে উদিল রবি সোনার বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ওঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥"

লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই যে কবিতাটির মধ্যে কাল্পনিক কিছুই নাই। তবু এটি শিশু চিত্ত মনোহর। খগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় ঠিকই বলেছেন,—

"কবিতাটি প্রভাতের মতো নির্ম্মল, প্রভাতী সুরে স্নিগ্ধ।" ১৮৪৯-৫০ সনের মধ্যে তিনভাগে শিশুশিক্ষা রচিত হয়। তারপর এল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার যুগ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের ইতিহাস জানেন না এমন বাঙ্গালী কমই আছেন। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় তিনি শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নানা পরীক্ষা চালান এবং ঐ উপলক্ষ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী ইত্যাদি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, গুরুগম্ভীর পুস্তক রচনা করেন। তারপর ১৮৫৫ সনের ১লা মে তিনি দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়সমূহের ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হলেন। ঠিক তার একমাস পূর্ব্বে (এপ্রিল, ১৮৫৫) শিশুদের পাঠারম্ভের জন্য তাঁর রচিত বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় এবং একমাস পরে (জুন, ১৮৫৫) প্রকাশিত হয় বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ। তাহলে বিস্মিত হতে হয় যে এই সদা কর্ম্মব্যস্ত, উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিটি শিশুদের জন্য চিন্তা করবার সময় পেতেন কখন? বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য, দয়ালুতা এবং সমাজ সংস্কার তাঁকে যে খ্যাতির অধিকারী করেছে, তার চেয়ে কিছু কম খ্যাতি দেয় নি ওই ক্ষুদ্র আয়তন বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ। বই দুটি আজও এতই বিখ্যাত যে লোকে বর্ণ পরিচয় নামটি সব সময় উল্লেখও করে না। অমুক শিশুটি প্রথম ভাগ পড়েছে বললে বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগই বোঝায়।

এই বইটি এতই জনপ্রিয় যে এর সম্বন্ধে কিছু লিখে এর পরিচয় দিতে যাওয়া প্রদীপ ধরে সূর্য্যের দীপ্তি প্রদর্শন করার মতই হাস্যকর। এই বই যে বাঙ্গালী শিশুকে শুধু বর্ণ পরিচয়ই করিয়েছে, তা তো নয়। "বড় গাছ, ভাল জল, লাল ফুল, ছোট পাতা" এই সরল বাক্যগুলির ধ্বনিব্যঞ্জনা স্বভাবতঃই শিশুর ছন্দপ্রিয় মনকে নাড়া দিয়েছে।

এই বর্ণপরিচয়ের "টেকনিক্যাল" দিকের বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই তার প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'এ জানিয়েছেন। এর পূর্ব্বে দীর্ঘ ঋকার ও দীর্ঘ ৯কার নামে দুটি অপ্রচলিত স্বরবর্ণ বর্ণমালার মধ্যে স্থান

পেয়েছিল। ঐ দুটির প্রয়োগ তখনকার দিনেও (অর্থাৎ ১৮৫৫ সনেও) ছিল না। তাই বিদ্যাসাগর তাঁর বর্ণপরিচয় থেকে ঐ দুটি বর্ণকে বাদ দিলেন। আরও কতকগুলি পরিবর্ত্তন করলেন যা নিয়ে শিশুর চেয়ে শিশুর অভিভাবকেরই বেশী প্রয়োজন। বস্তুতঃ বর্ণমালা সাজাবার প্রণালী যেমনই হোক তাতে শিশুর ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গেই তার সম্বন্ধ। তবু বর্ণমালা সাজানর রীতিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত এই পরিবর্ত্তনের ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

বর্ণমালা পরিচয়ের পর পাঠশিক্ষাদান আরম্ভ হয়েছে শুধু বিশেষ্য ও বিশেষণ দিয়ে। (যথা ঃ—বড় গাছ, ভাল জল ইত্যাদি। দ্বিতীয় পাঠে একটি করে বিশেষ্যের সঙ্গে একটি করে ক্রিয়া যোগ করা হয়েছে। যথা ঃ—পথ ছাড়, জল খাও, হাত ধর, বাড়ী যাও, ইত্যাদি। একটি কর্ত্তা ও একটি ক্রিয়াযুক্ত ক্ষুদ্রতম বাক্যের দ্বারা শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে।) পাঠ যতই অগ্রসর হয়েছে, বাক্যের মধ্যে শব্দের সংখ্যা ততই বৰ্দ্ধিত হয়েছে। এবং দীর্ঘ দীর্ঘ অনুচ্ছেদে পাঠ রচিত হয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশই তখনকার প্রচলিত রীতি অনুসারে উপদেশ। যথা ঃ—"কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি। ভাল করিয়া না পড়িলে পড়া বলিতে পারিব না।" (১৪ পাঠ) "তোমাকে বারণ করিতেছি, আর কখনও পড়িবার সময় গোল করিও না।" (১৬ পাঠ) "কাহাকেও গালি দেওয়া ভাল নয়।" (১৭ পাঠ) এবং সর্ব্বশেষে পাই সুবিখ্যাত গোপাল ও রাখালের কাহিনী যে রাখাল নামক দুষ্ট বালকটির দুষ্টামীর অন্ত নাই এবং যে গোপাল আদর্শবাদীর স্বপ্নরাজ্য থেকে বর্ণপরিচয় প্রথম পাঠের পথ বেয়ে পৃথিবীতে নেমে এসে পরম গম্ভীরমুখে একা বসে আছে। সে বড়ই নিঃসঙ্গ কারণ তার অনুরূপ একটিও বালক পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের জীবনবৃত্তান্তই বলে, এক পড়াশোনার ব্যাপারে ছাড়া আর কোনও বিষয়েই গোপালের সঙ্গে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের মিল খুঁজে পাওয়া যেত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চরিত্রপূজায় বিদ্যাসাগর অনুজ শম্ভুচন্দ্রের রচনা থেকে যে অংশটি উদ্ধৃত করেছেন, আমরাও সেই অংশটি এখানে স্মরণ করছি ঃ—

"পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত, সেদিন বলিতেন, আজ ভাল কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ

বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণ মাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া টাঁ্যাকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।"

শম্ভুচন্দ্রের রচনা থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন :—

"কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিত লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরী করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। কিন্তু পড়াশোনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ রক্ষা।"

সুতরাং রাখাল ও গোপালের কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার সময় হয় ঈশ্বরচন্দ্র নিজের বাল্যকালের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন (যেটি তাঁর মত প্রখর স্মৃতিসম্পন্ন মনীষির পক্ষে অসম্ভব মনে হয়), তা না হলে মধ্যবয়সে পৌঁছে নিজের সেই বালচপলতাকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে হয়েছিল কিন্তু সব শিশুর মধ্যেই বোধহয় একাধারে একটি করে রাখাল এবং একটি করে গোপাল বাস করে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগে শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা হত না বরঞ্চ শিশুকে নীতিশিক্ষা দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। বর্ণপরিচয় প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ উভয়ের মধ্যেই এই রীতিই তিনি অনুসরণ করেছেন।

তখনকার দিনে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে অনেক নূতনত্ব আনতে সমর্থ হলেও, শিক্ষার মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দেবার প্রচলিত প্রথাটিকে তিনিও অবহেলা করতে পারেন নি। গল্পের ছলেও নীতিশিক্ষা দিয়েছেন। তবে বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগের দশম অর্থাৎ শেষ পাঠে ভুবন নামক বালকটির কাহিনীর উপদেশের অংশ স্নেহান্ধ মাতা এবং মাতৃসমাজের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়েছে বলে মনে হয়। ভুবন যখন নিজের বিপথ গমনের জন্য স্নেহে অন্ধ

মাসীকেই দায়ী করল এবং জোরে কামড়িয়ে তাঁর কান কেটে নিল, তখন সে কাহিনীর উপদেশের মর্ম গ্রহণ করতে অসমর্থ শিশু শুধু কাহিনীর কৌতুকের দিকটিই বোঝে এবং খিলখিল করে হাসে। তার সেই হাস্যরোধ করবার জন্য কি বিধান দেওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আর কোনও একাদশ পাঠ দ্বিতীয় ভাগে পাই না।

(খ)

"শতাব্দীর শিশু সাহিত্য" গ্রন্থে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র যোগীন্দ্রনাথকে "বিদ্যাসাগরোত্তর যুগের পথিকৃৎ" বলেছেন। (যোগীন্দ্রনাথ কয়েকটি স্কুল পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেছিলেন কিন্তু সে অনেক পরে।) তাঁর প্রথম রচনা ১৮৯১ (?) সনে প্রকাশিত 'হাসি ও খেলা' শিশুদের গৃহপাঠ্য ও পুরস্কার প্রদানযোগ্য সচিত্র পুস্তক হিসাবেই রচিত হয়। "হাসি ও খেলা" প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই আছে, তা স্কুলে পড়িবার বই, তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণ উপকার হয় না।" এই হিসাবেই যোগীন্দ্রনাথ শিশু সাহিত্যে নূতন যুগের পথিকৃৎ। এই নূতন যুগ হল শিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে তার সঙ্গে খেলা করে করে শিক্ষা দেবার যুগ, সহজ কথায় হাসি ও খেলার মাধ্যমে তার মনকে আকর্ষণ করে তার জীবন গঠনের যুগ — সেই যুগের প্রবর্ত্তক যোগীন্দ্রনাথ। "বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ" গ্রন্থে শ্রীমতী আশা গঙ্গোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন,—

"যোগীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিতে হয় নাই—তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছেন।"

কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ শুধু যে নিজের রচনাই পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন তা নয়, তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের অনেকে শিশুমনোহর রচনাকে নিজ পুস্তকে স্থান দিয়ে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম ৺নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। নবকৃষ্ণ বাবুর একটি সুন্দর কবিতা যোগীন্দ্রনাথ তাঁর "রাঙ্গাছবি"তে প্রকাশিত করেছেন। কবিতাটির নাম "ভালো ছেলে ও মন্দ ছেলে"। এই কবিতাতে বর্ণ পরিচয়ের রাখাল ও গোপালের ছায়া দেখি। গোপালের মত ভালো ছেলেটি সোজা পাঠশালে

চলে যায়, সে রাস্তায় কথাও বলে না, খেলাও করে না। পাশাপাশি মন্দ ছেলের কথাও পাই। সে খেলা নিয়ে পথে দেরী করে আর,—

"পুকুরে ভাসায় জুতা
পাল তুলে দিয়ে।"

এর পরের পংক্তিগুলিতে দেখি পুরস্কারলোভী ভালোছেলেটি কখনও ঘাড় গুঁজে পড়ে চলেছে, কখনও অঙ্ক কষছে এবং বৎসর শেষে 'রাঙ্গাছবি' পুরস্কার নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ী যাচ্ছে। ভুল বলেছিলাম। গোপাল পৃথিবীতে একা নয়। এই ভালোছেলেটি তার একটি সমস্বভাব বংশধর। আর মন্দ ছেলে?

"মন্দ ছেলে সারাদিন
ঘোরে হেসে খেলে,
না চায় ছুঁইতে বই,
পায়ে ছুঁড়ে ফেলে।"

শুধু তাই নয়, 'চিক্কণ' বানান করতে বললে সে 'চয়েতে আকার' বলে, আর শ্লেট হাতে ধরে—

"মুখ লুকাইয়া দেয়
সন্দেশে কামড়।"

কবিতার শেষ পংক্তিকটিতে লেখক এই চঞ্চল বালকটিকে চরম শাস্তি দিয়ে ছেড়েছেন। যখন 'রাঙ্গাছবি' পেয়ে—

"ভাল ছেলে ধেয়ে চলে
পুলকিত মন,"

তখন বেচারা অন্যমনস্ক, চঞ্চল,—

"মন্দ ছেলে দাঁড়াইয়া
যেন জানোয়ার,
মাথায় গাধার টুপি—
খাসা পুরস্কার!"

এই মাথায় গাধার টুপি পরিয়ে ছাত্রকে শাস্তিদানের প্রথা শিক্ষাব্যবস্থায় Reign of Terror বা "আতঙ্কের রাজ্যের" যুগে বাংলার অনেক

বিদ্যালয়েই ছিল। যোগীন্দ্রনাথ রচিত রাঙ্গাছবির একটি কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণ হয়। সেটি হল "পাঠশালা"। এই রচনাটিকে ব্যঙ্গ কবিতাও বলা চলে। আবার সে আমলের বাংলাদেশের একটি সমাজচিত্র হিসাবেও এর মূল্য কম নয়। তখন গুরুমশায়দের যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল, এখানে তারই একটি চিত্র পাই। ছবিতে গুরুমহাশয়ের কানে খাগের কলম গোঁজা, চোখে চশমা এবং হাতে ছড়ি থাকা সত্ত্বেও তাঁর চেহারাই তাঁর পরিচয় দেয়। "চ্যাপ্‌টা নাকে চশমা আঁটা গুরুমহাশয়"টিকে দেখলেই মর্কটবংশীয় বলে চেনা যায়। তাঁর ছাত্রদের পরিচয়ও আছে পরের পংক্তিগুলিতে,—

"কানটি মলা খেয়ে ম'ল
গোয়ালাদের গুপী,
টেবির পড়া হয় নি ব'লে
মাথায় গাধার টুপি।"

'গুপী' ও 'টেবি' জাতীয় কুকুরশিশু নিয়ে যে গুরুমহাশয়ের অধ্যাপনা চলেছে, তাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যে কোন ডিক্টেটরকে লজ্জা দিতে পারে। তাই গুপী ও টেবির শাস্তি দেখে,—

"আর সকলে ভয়ে ভয়ে
মিটির মিটির চায়;
কার কপালে কি যে আছে
বলা নাহি যায়।"

এ কবিতা বানর আর কুকুরকে অবলম্বন করে মানুষের শিক্ষা-পদ্ধতিকেই ব্যঙ্গ। 'Spare the rod and spoil the child' যে যুগের মন্ত্র ছিল, সে আমলে,—

"এক গুরুতে জগত মাৎ—
কাঁপে পোড়োর দল;
মুখে শুধু—'কেঁউ কেঁউ'
চোখে শুধু জল!"

বাধ্যতামূলকভাবে ক্লাশে বসে পড়তে বোধহয় শিশুরা কোনকালেই ভালবাসত না। যোগীন্দ্রনাথের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন।

সুতরাং তাঁদের বাল্যকালে নিশ্চয়ই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা একই রকম ছিল। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশব স্মৃতি থেকে লিখেছেন,—

"নর্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া আমরা বেঙ্গল একাডেমি নামক এক ফিরিঙ্গি ইস্কুলে ভর্ত্তি হইলাম।...

এই ইস্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবু হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেওয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো,—ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই—ইহা খোপওয়ালা একটা বড় বাক্স। কোথাও কোন সজ্জা নাই, ছবি নাই, রং নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ...সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেওড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যায়—অতএব ইস্কুলের সঙ্গে আমার সেই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।"

এই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তদশকের অভিজাত সন্তানের শিক্ষা-জীবনের চিত্র। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানেরা যে সব পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করত, তার কথা আর না বলাই ভাল। আর এক পুরুষ পরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পথের পাঁচালীতে তার একটু আভাষ দিয়েছেন। পথের পাঁচালী বহুলাংশে বিভূতিভূষণের আত্মজীবনী। সুতরাং অপুর পাঠশালা বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শিশুশিক্ষার চিত্র। পথের পাঁচালীর চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে দেখছি :—

"গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়ীতে একখানা মুদীর দোকান করিতেন। এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ বাহুল্য ছিল না। তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বেপরোয়াভাবে বেত চালাইতে থাকেন যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া যায় মাত্র।"

সে যুগের গুরুমহাশয়দের কণ্ঠে যেন অবিরাম ধ্বনিত হত :— "ছাত্রশাসনায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" যোগীন্দ্রনাথের "খেলার গান"এ "কাজের লোক" কবিতাটিতে মাষ্টার তাই নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন,

"পড়তে বসে ফাঁকী দিলে বিতিয়ে করি লাল।"

গুরুমহাশয়কে ছাত্রদের ভয় ও তাঁর পশ্চাৎ ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আচরণ নিয়ে লেখক কৌতুকও করেছেন। হাসিরাশিতে "শক্তের ভক্ত" কবিতাটিতে দুদিকে দুটি করে ছাত্রছাত্রী নিয়ে মাঝখানে মাষ্টারমশাই চশমা চোখে দিয়ে চেয়ারে বসে আছেন। ছবির নীচে লেখা,

"যখন গুরু দৃষ্টি রাখে; পোড়োরা সব ঠাণ্ডা থাকে !"

অবশ্য মাষ্টার মহাশয়ের পোষাক এবং চেয়ারে বসা থেকে মনে হয় যে, এ স্কুল ঠিক প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালা নয়। বরঞ্চ যে সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করে যোগীন্দ্রনাথ জীবন আরম্ভ করেন, সেদিনের সেই সিটি স্কুলের সঙ্গে এই ইস্কুলের কিছু মিল আছে। তবুও শিক্ষার্থীর মনোভাব সেই একই,

"যখন গুরু পিছন ফেরে, আড়নয়নে সবাই হেরে !"

তারপর দুটি ছবির নীচে দেখি,

"ঢুকলে গুরু ঘরের কোণে দস্যিগিরি জাগে মনে !
তারপরেতে দুড়দাড়, পাড়াশুদ্ধ তোলপাড় !"

ছবিতে ছাত্রছাত্রীদের নেহাৎই শিশুরূপে দেখানো হয়েছে। এবং তাদের গুরুর দিকে 'আড়নয়নে' চাইবার ভঙ্গী দেখে এই কথাই মনে হয় যে, তাদের দুষ্টুমীতে যেন লেখকেরও সায় ছিল। বালক যোগীন্দ্রনাথ জয়নগরের গ্রাম্য পাঠশালায় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছিলেন, কলকাতায় সিটি স্কুলে পড়াতে এসে সেই অভিজ্ঞতাকে শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেন। তাঁর আমলে এত শিশু মনস্তত্ত্ব পড়বার ধুম ছিল না। কিন্তু যে হৃদয় না হলে শিশুর মনকে বোঝা যায় না, সেই হৃদয়ের সহানুভূতি দিয়ে তিনি সেদিনের বিদ্যার্থীসমাজের দুঃখ বুঝেছিলেন। তাই মনে হয়, 'রাঙাছবি'র যে মন্দ ছেলেটি,

"মুখ লুকাইয়া দেয়
সন্দেশে কামড়"

যোগীন্দ্রনাথের বর্ণ চেনাবার পদ্ধতিটি আমরা স্বরবর্ণের অব্যবহৃত ৯ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের অল্প ব্যবহৃত "ং"র ছড়া থেকে স্পষ্টরূপে বুঝতে পারি।

প্রত্যেকটি বর্ণের ছড়ার প্রত্যেকটি কথার মানে শিশু না বুঝুক, কখনও বা পশুপক্ষী, কখনও বা গতিশীল পদার্থের কথা বলে লেখক তাদের পরিচয় দিয়েছেন। "এক্কাগাড়ী খুব ছুটেছে"র "এক্কা" হয়তো সাধারণভাবে বাংলাদেশের শিশু চেনে না—যানটি বিহার, উত্তর প্রদেশের (সেদিনের সংযুক্ত প্রদেশ) দিকে প্রচলিত এবং সেখানেও এ যানটির প্রচলিত নাম 'টাঙ্গা' বা 'টম্‌টম্‌'। কিন্তু "এক্কাগাড়ী খুব ছুটেছে" শুনলে কোন দ্রুত ধাবমান গাড়ীর চিত্র নিশ্চয়ই শিশুর মনে উদিত হয় এবং মনকে আকর্ষণ করে। প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝে তবে তার রস ভোগ করতে হবে, শিশুর মনে এমন কোনও আব্দার নেই। সে অল্পে খুসি—অনেক সময় না বুঝে বেশী খুসি। রবীন্দ্রনাথও এই কথাই জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন,—

"নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভালো করিয়া স্মরণ করিবেন, তিনিই ইহা বুঝিবেন যে আগাগোড়া সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন। সেইজন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ভরাট করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয়, যাহা শ্রোতারা কখনই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে।"

দৃশ্যতাগুণ এই ছড়াগুলির তৃতীয় বিশেষত্ব। বিশেষ্যকে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই এমন কিছু এ ছড়ায় নাই, যার ছবি আঁকা যায় না।

হাসিখুসির বর্ণের ছড়ায় যুক্তাক্ষর যথাসাধ্য বর্জ্জন করা হয়েছে। "অ" থেকে "ঔ" পর্য্যন্ত স্বরবর্ণমালার মধ্যে একবার মাত্র এক্কা শব্দে "ক"এর দ্বিত্ব দেখি—তা ছাড়া সব শব্দই যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত। শিশু "আ"কার, "ই"কার যোগ করতে শিখলেই যাতে নিজের থেকে এই ছড়াগুলি পড়তে পারে, লেখকের সেদিকে দৃষ্টি ছিল।

এই বর্ণের ছড়ার আরও একটি বিশেষত্ব তার ধ্বনিমাধুর্য্য। যে শিশু নিজে পড়তে পারে না, সেও জননীর মুখে

"কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি,
খেঁকশেয়ালী পালায় ছুটি"

শুনে তালে তালে নাচে বা দুলতে থাকে। সুতরাং পশুপক্ষীর বা কোনও গতিশীল পদার্থের নাম উল্লেখ, বিশেষ্যের প্রাধান্য, দৃশ্যতাগুণ, যুক্তাক্ষর বর্জ্জন এবং ধ্বনিমাধুর্য্য সব মিলিয়ে এই ছড়াগুলি অমর হয়ে আছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় রচনার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হলে হাসিখুসি রচিত হয়। বর্ণমালা পরিচিতিকে বিদ্যাসাগর প্রদর্শিত পথ থেকে সম্পূর্ণ অন্য খাতে নিয়ে যাবার চেষ্টা যোগীন্দ্র রচনায় পাই।

হাসিখুসি যাদের জন্য রচনা করা হয়েছে, তারা ঠিক বিদ্যালয়গামী শিশু নয়। কোনও স্কুল পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা বরং যে ছেলেভুলানো ছড়ার সংগ্রহ যোগীন্দ্রনাথ "খুকুমণির ছড়া" নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, সেই ছড়াগুলির সঙ্গেই এদের সাদৃশ্য বেশী। খোকা বা খুকু মায়ের মুখে এগুলি প্রথম শুনবে, ছন্দধ্বনিতে ও রঙীন ছবিতে আকৃষ্ট হয়ে কৌতূহলের বশে জননীকে জিজ্ঞাসা করে করে অক্ষর চিনবে, এই যেন লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। তবু একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। যে বর্ণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, আদ্যক্ষরে সেই বর্ণসংযুক্ত এক একটি বিশেষ্যকে অবলম্বন করেই হাসিখুসির বর্ণের ছড়া রচিত আর ঐ বিশেষ্যগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে পাই। যে যে বর্ণাবলম্বী বিশেষ্য বর্ণ পরিচয় থেকে হাসি-খুসিতে গৃহীত হয়েছে, তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া গেল।

স্বরবর্ণ

	বর্ণ পরিচয়—১ম ভাগ		হাসিখুসি—১ম ভাগ
১।	অ — অজগর	… …	অ — অজগর আসছে তেড়ে।
২।	ই — ইঁদুর	… …	ই — ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে।
৩।	ঈ — ঈগল	… …	ঈ — ঈগল পাখী পাছে ধরে।
৪।	উ — উট …	.. …	উ — উট চলেছে মুখটি তুলে।
৫।	ঋ — ঋষি	… …	ঋ — ঋষিমশাই বসে পূজায়।
৬।	এ — এক্কা	… …	এ — এক্কাগাড়ী খুব ছুটেছে।

ব্যঞ্জনবর্ণ

বর্ণ পরিচয়—১ম ভাগ			হাসিখুসি—১ম ভাগ
১। ছ — ছাগল	...	...	ছ — ছাগলছানা লাফিয়ে চলে।
২। ট — টিয়াপাখী	...	...	ট — টিয়াপাখীর ঠোঁটটি লাল।
৩। ঢ — ঢুলি	...	...	ঢ — ঢুলিভায়া ঢোলক বাজায়।
৪। ত — তিমি মাছ	...	...	ত — তিমি আপন শিকার ধরে।
৫। ব — বাঘ	...	...	ব — বাঘের যত সাহস চোখে।
৬। ভ — ভালুক	...	...	ভ — ভালুক জানে হাসতে ভালো।
৭। য — যাঁতা	...	...	য — যাঁতা ঘোরে হাতের জোরে।
৮। ষ — ষাঁড়	...	...	ষ — ষাঁড় ছুটেছে পুকুর পাড়ে।
৯। স — সিংহ	...	...	স — সিংহ রাগে কেশর নাড়ে।

দেখা যাচ্ছে, ১২টি স্বরবর্ণের মধ্যে ৭টিতে এবং ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ৯টিতে বিশেষ্যগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তক থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ঐ নাম বা বিশেষ্যগুলি গ্রহণ করেই যোগীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হয়েছেন। তারপর তাঁর লেখনীর জাদুস্পর্শে ঐ বিশেষ্যগুলি সজীব হয়ে উঠেছে।

এরপর "আ"কার, "ই"কার যোগ করবার সময় আর বিদ্যাসাগর নয়, যোগীন্দ্রনাথ যদি কাকেও অনুসরণ করে থাকেন তো সে বাংলার নামহীনা ছেলেভুলানো ছড়া রচয়িত্রীদের। তবে ছেলেভুলানো ছড়াগুলির মধ্যে শিশুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার চঞ্চলতাকে শান্ত করা এবং তাকে ঘুমপাড়ান ছাড়া কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। যোগীন্দ্রনাথ রচিত ছড়াগুলির উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ 'আ'কার, 'ই'কার যোগ করে পাঠশিক্ষাদান, দ্বিতীয়তঃ ঐ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন শব্দ বা নামের সঙ্গে পরিচয়। "আ"কারের ছড়ায় তাই কেবলই ফলের নাম পাই :—

"শশা আর কলা খাও
খাও পাকা আম,
আনারস ডাব আতা
আর কাল জাম।"

এগুলিতে ভাব বা চিন্তাধারার যে পূর্ব্বাপরতা আছে, তাতে বাংলা ছড়ার চেয়ে ইংরেজী Nursery Rhymesএর সঙ্গেই এগুলির সাদৃশ্য অধিক বোধহয়।

হাসিখুসি দ্বিতীয় ভাগে ছড়ার সাহায্যে ছটি ঋতু এবং বার মাসের পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। বারমাসের ছড়াটিকে একটি বালকের শালিক পাখী পোষার কাহিনী বলা যেতে পারে। বৈশাখ মাসে পোষা শালিকছানার গায়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে ছোট্ট দুটি ডানা গজাল। আষাঢ় মাসে তার গায়ের পালক বাড়ল আর শ্রাবণ মাসে তার মুখে দু চারটি বুলি ফুটল! এমনি করে ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ মাসে ক্রমে ক্রমে তার বয়স, বুদ্ধি এবং শারীরিক বৃদ্ধির খবর পাই। তারপর

"পৌষমাসে থাকত খোলা খাঁচার দুটি দ্বার,
মাঘমাসে খেলতে যেত ইচ্ছা যথা তার।
ফাল্গুনমাসে দুষ্টবুদ্ধি জাগল তাহার মনে,
চৈত্রমাসে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল বনে।"

বালকবালিকাদের মাসের নাম মুখস্থ করানই এই ছড়ার উদ্দেশ্য ছিল।

পাখী বা পোকামাকড় পোষা অনেক বালকের অবসর বিনোদনের একটি বিশেষ উপায়। কোন কোন বালকের ক্ষেত্রে আবার এ খেয়াল কেমন বিষম খেয়াল হয়ে ওঠে, তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত পাঠে জানতে পারি। তিনি লিখেছেন,

"আমি তখন পশুপক্ষী পুষিতে বড় ভালবাসিতাম। পুষি নাই এমন জন্তুই নাই। টুনটুনি, বুলবুলি, দোয়েল, ছাতারে, শালিক, টিয়া এ সকল তো পুষিয়াছি, পিঁপড়েও পুষিতাম। ফড়িং ও পিঁপড়ে পোষা আমার একটা বাতিক ছিল। তাহাদিগকে অতি যত্নে কৌটার মধ্যে রাখিতাম। ফড়িংদিগকে কচি কচি দুর্ব্বাঘাস খাওয়াইতাম, পিঁপড়েদিগকে চিনি, মধু প্রভৃতি খাইতে দিতাম। পিঁপড়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে এতই ভালো লাগিত যে, আমি যখন ৬।৭ বৎসরের ছেলে, তখনো পিঁপড়ে হইয়া চারি হাতপায় পিঁপড়েদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম।"

এটি একটি বিশেষ বালকের কাহিনী হলেও এর থেকে বোঝা যায় সাধারণতঃ বালকেরা পশুপক্ষী পুষতে এবং তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে কত ভালবাসে। সুতরাং শালিকছানার বয়োবৃদ্ধির এবং বুদ্ধির বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বালক অনায়াসেই বাংলা মাসের নাম মুখস্থ করে।

হাসিখুসি ভিন্ন হিজিবিজিতেও বর্ণের ছড়া পাই কিন্তু শুধু বর্ণ পরিচয় করাবার উদ্দেশ্যে ওই ছড়াগুলি রচিত হয়নি। ওগুলিতে একটু শ্লেষেরও মিশেল আছে। যথা :—

অ-আ দু ভাই অজ বেয়াকুব
আসল কুঁড়ের ধাড়ি
গোঁফ দাড়ি সব পাকলো তবু
বগলে পাততাড়ি।

'ছড়া ও ছবি'তে যেন ধরে নেওয়া হয়েছে যে খোকা খুকুর অক্ষর পরিচয় হয়ে গেছে। সেই অক্ষর তারা ঠিক চিনল কিনা, বিভিন্ন উপায়ে তার পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্ণ পরিচয়ের পর শিশুকে পরীক্ষা করবার একটি বিচিত্র সনাতন উপায় ছিল একটি কাগজে গোল করে ফুটো করে যে কোন অক্ষরের উপর ধরে শিশুকে সেটি পড়তে বলা। এই উপায়ে জানা যেত শিশু সত্যই অক্ষর চিনেছে, না পরপর অক্ষরের নামগুলি মুখস্থ করছে। যোগীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারটিকে একটি নূতন ছাঁচে ঢালাই করে হাতীর উপর মাথায় 'অ', 'আ', ইত্যাদি অক্ষর লেখা বারটি ছেলেকে বসালেন ও সেই সঙ্গে ছড়া লিখলেন,

চেনা

হাতীর উপর হাওদা দিয়ে
বসলো বার ছেলে,
কেউ বা সোজা, কেউ বা বাঁকা,
ধলো কেউ বা কেলে!
খোকন বাবু বললে হেসে—
"সবাই আমার চেনা,
প্রথম ভাগের মধ্যে আছে,
পয়সা দিয়ে কেনা!"

এর দু পৃষ্ঠা পরে ব্যঞ্জন বর্ণের বিনাসূতের মোহনমালা পরিচয়ে লেখক খোকাবাবুর হাতে খড়ির ব্যবস্থা করেছেন। অজান্তে তার পরীক্ষাও হয়ে গেল। শিখতে তো খোকার আপত্তি নেই। কিন্তু যখন সেটা "হয় Zানতি পার না"র পর্য্যায়ে পড়ে, তখনই তার থেকে স্থায়ী ফললাভ হয়। তা না

হলে তেতো ঔষধ গেলার মত করে অক্ষর পরিচয় করলে শিক্ষাটা চিরদিনের জন্য বিভীষিকা হয়ে থাকে।

ছড়া ও ছবিতে বারের নাম এবং পক্ষের নামও ছড়ার সাহায্যে শেখানো হয়েছে। এর মধ্যে সাত বারের ছড়াটি বড়ই মনোহর। ছড়াটি হল :—

"সোমবারে আনবে ছানা দোকান হতে কিনি,
মঙ্গলেতে পেস্তা বাদাম, আনবে কাশীর চিনি।
বুধবারে চড়িয়ে কড়া আগুন দিবে জ্বেলে,
বেস্পতিতে ছানা চিনি, মিশিয়ে দেবে ঢেলে।
শুক্রবারে খুন্তি নাড়ার টুং-টাং সুর,
শনিবারে চৌদিকেতে সুগন্ধে ভরপুর !
রবিবারে নাইকো পড়া বই রাখো তুলে,
উৎসাহেতে লেগে যাও হাঁড়ির ঢাকা খুলে।"

ইংরেজীতে বারের নাম শেখাবার জন্য যে ছড়াটি আছে, তার চেয়ে যোগীন্দ্রনাথের ছড়াটি অনেক মধুর। ইংরেজী ছড়াটি হ'ল :—

Solomon Grundy,
Born on a Monday,
Christened on a Tuesday,
Married on a Wednesday
Ill on Thursday
Worse on Friday
Died on Saturday
Buried on Sunday.

That was the end of Solomon Grundy. ইংরেজী ছড়াটির মতই যোগীন্দ্রনাথের সাতবারের ছড়াটি এক হিসাবে একটি আজগুবী ছড়া। কারণ সাতদিন ধরে প্রস্তুত মিষ্টান্ন খেলে বালককে যে সুস্থ থাকতে হবে না, তা বলা বাহুল্য কিন্তু এই আজগুবী ছড়ার সাহায্যে লেখকের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছে। বালকের পাঠবিমুখ মনের বিরূপতা দূর করে তার মিষ্টরস লোভী মন এবং রসনা উভয়কে একই সঙ্গে রসাপ্লুত করে লেখক কৌশলে তাকে তার অজানিতে সাতবারের নাম মুখস্থ করিয়ে দিয়েছেন।

শিশুর পাঠারম্ভের ব্যাপারে হাসিখুসির ভূমিকা আলোচনা করতে বসলে হাসিখুসির অন্তর্গত "দশটি ছেলে"র কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শিশুকে যোগবিয়োগ শিক্ষা দেবার জন্যই হারাধনের দশটি ছেলে রচিত হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে হাসিখুসি প্রথম ভাগের ১৯ পৃষ্ঠায় একটি সংএর চেহারা এঁকে শিশুকে ১, ২ ইত্যাদি সংখ্যা পরিচয় করান হয়েছে। ঐ সংএর দুটি পা ১ ও ৯, দুটি হাত ২ এবং উল্টা ৩, মাথা এবং ধড় মিলিয়ে ৪, মুখের হাঁটি ৫, কান দুটি ৬ ও ৮, একটি চোখ ৭ ও আর একটি শূন্য।

এরপর হাসিখুসি—প্রথম ভাগে মুখে মুখে বিয়োগ শেখাবার জন্য যে ছড়াটি রচিত হয়েছে, সেই "দশটি ছেলে" আজ বাংলা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। হারাধনের দশটি ছেলে — পল্লীপরিক্রমার সময় একটি হারিয়ে গিয়ে নয়টি রইল। নয়টি ছেলে কাঠ কাটতে গেলে একটি ছেলে কেটে দুখান হল। আটটি বাকী রইল। এর পরের ছড়াটি আজগুবী :—

"হারাধনের আটটি ছেলে
বসলো খেতে ভাত,
একটির পেট ফেটে গেল,
রইল বাকী সাত।"

এরপর সাতটি ছেলের সবগুলিই কোন না কোন কারণে মারা গেলে হারাধনের অবশিষ্ট বংশধরটি :—

"কাঁদে ভেউ ভেউ
মনের দুঃখে বনে গেল
রইল না আর কেউ!"

আবার হাসিখুসি দ্বিতীয় ভাগে হারাধনের দশটি ছেলের ফিরে আসা উপলক্ষ্য করে বালকবালিকাদিগকে যোগ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ছড়াগুলি প্রায় আগাগোড়াই আজগুবী। প্রথম ছড়াটি হ'ল :—

"হারাধনের সেই যে ছেলে
গিয়েছিল বনে;
সাপে খাওয়া ভা'য়ের দেখা
পেলো ওঝার সনে!"

এরপর মাছে গেলা ছেলেকে মাছের পেটে পাওয়া গেল, (ধন্বন্তরির ?) ওষুধের গুণে আগাড় খেয়ে মরা ছেলে "চক্ষু মেলে হাসে" ; বাঘ শিকারে গিয়ে বাঘের পেটে এক ভাইকে পাওয়া গেল, পিছলে পড়ে মরা ছেলেকেও কি জানি কি মন্ত্রবলে হাঁসপাতালে ডাক্তাররা বাঁচিয়ে দিলেন, "জলে—ডোবা" ছেলেটিকে করিম গাজী নামক অপূর্ব্ব সাঁতারু তুলল ; তারপর,

"হারাধনের সাতটি ছেলে
দরজী ডেকে ঘরে,
পেটফাটা সে ভা'য়ের পেটে
রিপুকর্ম্ম করে !
হারাধনের আটটি ছেলে
সুখ দুঃখের সাথী ;
কাটাছেলে লাগায় জোড়া
'হরে' জোলার নাতি।"

হারাধনের শেষ পুত্রটিকে চোরের ঘরে পাওয়া গেল। এই শেষ ছড়াটিই যা সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেনি কিন্তু তাতে কি এসে যায় ! যে ভাবেই হোক বেচারা হারাধন তার ছেলেগুলিকে ফিরে পেলেই হ'ল। তাতে খোকাবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেও বাঁচে আর দ্রুত মুখে মুখে যোগ করতেও শিখে যায়।

হারাধনের দশটি ছেলের কাহিনীতে রাজনৈতিক দাবাখেলার ইঙ্গিত আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। আমার মনে হয় যে, এটি রচনার সময় শিশুদের বিশুদ্ধ আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাদানের দিকেই লেখকের দৃষ্টি ছিল। হাসিখুসি প্রথম ভাগের রচনাকাল ১৮৯৭। ভারতীয় রাজনীতির তখন শৈশব, এমন কি, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যে একমাত্র চিন্তা ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিকদের তপস্যার মত ছিল, সেই স্বাধীনতা আন্দোলনও তখন প্রকৃত অর্থে আরম্ভ হয় নি। তাই মনে হয় যে, এগুলি শিশুমনোরঞ্জন এবং শিশুশিক্ষাকল্পেই রচিত। অবশ্য তারপর তাকে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে তার উপর তো লেখকের কোন হাত নেই। শ্রীবুদ্ধদেব বসু যোগীন্দ্রনাথের বিষয় লিখেছেন :

"মুখে বোল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি ছেলে তাঁরই ছড়া আওড়ায়—সেই ধাবমান অজগর আর লোভনীয় আম্রফলের চিরনূতন নান্দী পাঠ—মায়ের পরেই তাঁর মুখে মুখে কথা শেখে। যোগীন্দ্রনাথ, তাঁর হাসিখুসির দানসত্র নিয়ে, তাঁর উৎসর্গিত জীবনের রাশি রাশি উপচার নিয়ে, আজকের দিনে একজন লেখকমাত্র নেই আর; হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান, শিশুদের বিশ্ববিদ্যালয়। ঠিক তাঁর পাশে নাম করতে পারি এমন কোন বিদেশী লেখকের সন্ধান আমি আজও পাই নি; 'হাসিখুসি'র সঙ্গে তুলনীয় কোন ইংরেজী পুস্তক এখনো আমাকে আবিষ্কার করতে হবে!···

"যোগীন্দ্রনাথের রচনা একান্তভাবে অন্তঃপুরের; স্কুলের নয়, পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মতোও না, যেন মা ছেলের বিশ্রম্ভালাপের ভাষা—ঠিক তেমনি স্নিগ্ধ কোমল সহাস্য তাঁর গলার আওয়াজ। ঐ আওয়াজটি ফরমাশ দিয়ে পাওয়া যায় না বলেই যোগীন্দ্রনাথের জুড়ি হলো না; তাই এই বিভাগে, পথিকৃৎ হয়েও এখনো তিনি সর্ব্বোত্তম।"

("বাংলা শিশুসাহিত্য"—শারদীয়া দেশ, ১৩১৯, পৃঃ ৪৬)

বাঙ্গালী শিশুর বর্ণপরিচয়ের ব্যাপারে যোগীন্দ্রনাথের দানকে অনেকটা আলোবাতাসের মত প্রাকৃতিক সম্পদের পর্য্যায়ে ফেলে অনেকেই আর তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করবার কথাও ভাবেন না। বুদ্ধদেববাবুর এই প্রশংসাপূর্ণ মন্তব্য তাই স্মরণীয়।

"হাসিখুসির দানসত্র নিয়ে, তাঁর উৎসর্গিত জীবনের রাশি রাশি উপচার নিয়ে" "মিষ্টিদাদু" যোগীন্দ্রনাথ (এই নামেই তাঁর এক পৌত্র তাঁকে সম্বোধন করত) আজও সাহিত্যশরীর নিয়ে বর্ত্তমান কিন্তু তাঁর সেই উপহার গ্রহণ করবার জন্য বাঙালীকেও প্রস্তুত হতে হবে। কবিগুরুর কথা স্মরণ করি :—

"যেখানে প্রাণ নাই, বোবার সভা
সেখানে গান নাহি জাগে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

যোগীন্দ্রনাথের আজগুবী ছড়া

মানুষ তার চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি এবং মননশীলতার জন্য গৌরববোধ করে এবং যখনই কোনও ব্যাপারকে সে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে পারে না, তখন সে বলে, "পাগলের কাণ্ডকারখানা !" সাহিত্যের মধ্যেও সে তার প্রতিদিনের চেনা জীবনেরই অবিকল প্রতিচ্ছবি না হোক, একটু কল্পনার পালিশ লাগান রূপ দেখতে চায়। অবশ্য মাঝে মাঝে এই কল্পনা তাকে বিশ্বব্যাপারে অসম্ভব অনেক কিছুরই স্বপ্ন দেখায়—তবুও মোটামুটি তার কল্পনার একটা সীমা আছে। শিশুর জগতে কিন্তু সবই বিপরীত। যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কলিত এবং ১৩০৬ সনে প্রকাশিত "খুকুমণির ছড়া"র ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই কথারই উল্লেখ করে বলেছেন,

"প্রকৃতির কারখানা হইতে নির্মিত হইয়া মানবশিশু সদ্যঃ সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিয়াছে কিন্তু এখনও প্রকৃতির শাসন, নিয়মের শাসন তাহাকে বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে নাই ; যে নিয়মের প্রভাবে সেই কারখানা পরিচালিত হইতেছে, সেই নিয়মের অস্তিত্বে তাহার একেবারে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। তাহার স্বাধীন, মুক্ত জীবনের নিকট প্রকৃতির মূর্ত্তিও সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল ও সংযমরহিত। তাহার নিকট জগতের খানিকটা প্রাকৃত, খানিকটা অতিপ্রাকৃত নহে, সমস্তটাই অতি প্রাকৃত। অথবা বয়স্ক লোকে যাহাকে অতিপ্রাকৃত বলিতে চায় বা যাহার অস্তিত্বে শঙ্কিত বা চিন্তিত বা হতবুদ্ধি হয়, যাহাকে প্রাকৃতের মধ্যে টানিয়া আনিবার জন্য আপনার বুদ্ধি শক্তিকে বিনিয়োগ করে, তাহাই তাহার নিকট একমাত্র প্রাকৃত। শিশুবুদ্ধি এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক দেখে না। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বন্ধন ও নিয়মের ও শৃঙ্খলার এই সম্পূর্ণ অভাবে তাহার কিছুমাত্র শঙ্কাবোধ বা দ্বিধাবোধ হয় না। এই শৃঙ্খলাহীন, নিয়মহীন, বিপর্য্যস্ত জগতের মধ্যে সে পরিপূর্ণ উল্লাস ও আনন্দ উপভোগে সমর্থ হয়।"

এই জন্যই বোধহয় ইংরাজী Nursery Rhymesএর মতই বাংলা ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে Nonsense rhymes বা আজগুবী ছড়ার প্রাধান্য

দেখি। যা কিছু প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত এবং সচরাচর ঘটতে দেখা যায় না, অথবা কখনই ঘটা সম্ভব নয়, তারই উপর শিশুর স্বাভাবিক আকর্ষণ। বয়স্করা যাকে অবাস্তব বলে, অসম্ভব বলে পরিহার করেন, তারই মধ্যে সে পায় কৌতুকের খোরাক। তাই ইংরেজীতে রচিত বহু পুরাতনকালের আজগুবী গীত এবং ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়—তাদের অনেকগুলির বয়স তিনশ, সাড়ে তিনশ বলে আন্দাজ করা হয়। অবশ্য তার পরবর্ত্তীকালেও নূতন নূতন আজগুবী ছড়া রচিত হয়েই চলেছে এবং তাতেই এগুলির জনপ্রিয়তা (শিশুপ্রিয়তা?) প্রমাণিত হয়েছে। এমনি একটি Nursery Nonsense হল Crazy Arithmetic। ছড়াটি এইরূপ :—

"4 in 2 goes twice as fast,
If 2 and 4 change places ;
But how can 2 and 3 make four
If 3 and 2 make faces ?"

এই ছড়াগুলির মতনই বাংলা ছেলেভুলানো ছড়ার আদি রচয়িত্রী কে বা কারা ছিলেন, তা কেউ জানে না। তাঁদের উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল চঞ্চল শিশুকে ভুলিয়ে শান্ত করা এবং তাকে ফাঁকি দিয়ে ঘুমপাড়ানো। সেই ভুলিয়ে রাখার ব্যাপারটিকে সুসম্পন্ন করবার জন্য কত যে আজগুবী ব্যাপারের কল্পনা তাঁরা করেছেন, তার অন্ত নেই। কখনও বলেছেন,

"গড়গড়ের মা লো, গড়গড়ের মা,
তোর গড়গড়েটা কৈ ?
হালের গরু বাঘে খেয়েছে,
পিঁপড়ে টানে মৈ !"

কখনও বলেছেন,

"ও জামাই খেয়ে যা রে
সাধের নূতন তরকারি,
শিলভাতে, নোড়াভাজা,
কোদাল চড়চড়ি !"

যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কলিত খুকুমণির ছড়ায় এমন বহু ছড়াই আছে, যার মধ্যে অর্থসঙ্গতি আবিষ্কার করা দুরূহ কিন্তু সেজন্য এগুলির রস উপভোগে

শিশুর কোন অসুবিধাই হয় না কারণ শিশু যা কিছু শোনে, তার মধ্যে সে আভিধানিক অর্থের সন্ধান করে না বা তর্কশাস্ত্রসম্মত যুক্তি চায় না। সে কথার মাধ্যমে ছবি দেখতে দেখতে শোনে,

"আয় চাঁদ নড়িয়া,
ভাত দেব বাড়িয়া।
মাছ কেটে মুড়ো দেব,
ধান ঝেড়ে কুঁড়ো দেব,
রাঙা সুতোর কাপড় দেব,
চড়ে বেড়াতে ঘোড়া দেব—
খোকার কপালে টুকু দিয়ে যা!"

নাম-না-জানা পল্লীগ্রামের গরঠিকানীয়া ছড়া রচয়িত্রীদের মুখে মুখে রচিত ছড়ার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একদা "মেয়েলী ছড়া" নামে এক প্রবন্ধ লিখে কোন সভায় পাঠ করেছিলেন। তারপর তিনি আরও কিছু ছড়া সংগ্রহ করেন। এইরকম অনেক ছড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে কাজটা অধিকদূর অগ্রসর না হয়েই থেমে যায়। তারপর ছড়া সংগ্রহের কার্য্যে ব্রতী হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং তাঁর সংগৃহীত সেই ছড়াগুলিকে "খুকুমণির ছড়া" নাম দিয়ে ১৩০৬ সনে প্রকাশ করলেন। বইটির ৪১০টি ছড়ার মধ্যে বহু আজগুবী ছড়া আছে কিন্তু শুধু সঙ্কলনই নয়, যোগীন্দ্রনাথ নিজেও বহু আজগুবী ছড়া লিখেছেন এবং তাঁর শিশুপাঠ্য বিভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। ("খুকুমণির ছড়া"র প্রথম সংস্করণে আড়াই শতের মত ছড়া ছিল) লেখবার সময় তার সম্মুখে ঊনবিংশ শতকের মধ্য ভাগে রচিত কিছু ইংরেজী আজগুবী ছড়াও ছিল। তার মধ্যে ১৯৬৩ সনে প্রকাশিত এডওয়ার্ড লিয়রের nonsense verses এবং ১৮৬৫ সনে প্রকাশিত Lewis Carollএর এ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের অন্তর্গত আজগুবী ছড়াগুলিরও নাম করা যেতে পারে।

যোগীন্দ্রনাথ নিজে এজাতীয় ছড়া কবে প্রথম লিখেছিলেন, তা সঠিক জানতে পারিনি। তবে ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত "সন্দেশ" নামক শিশু মাসিকে (প্রথম প্রকাশ ইংরেজী ১৯১৩, বঙ্গাব্দ ১৩২০) তিনি অনেক আজগুবী ছড়া লিখেছিলেন। পরে এইগুলি তাঁর "হিজিবিজি" গ্রন্থে

প্রকাশিত হয়   প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায়ের আবোলতাবোলের বিখ্যাত কবিতাগুলিরও জন্ম এই সন্দেশের পাতাতেই।

কিন্তু "হিজিবিজি" প্রকাশের বা "সন্দেশ"এর জন্মের অনেক পূর্ব্বেই যোগীন্দ্রনাথ 'হাসিরাশি'তে লিখলেন এক আজগুবী ছড়া—"মজার মুল্লুক।" তার আরম্ভ এইরূপ :—

"এক যে আছে মজার দেশ,
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ,
দিনে চাঁদের আলো!"

আয়নার দিকে তাকালে যেমন সবই উল্টো হয়ে দেখা দেয় এই মজার মুল্লুকেও তেমনি সবই উল্টো।

"আকাশ সেথায় সবুজ বরণ,
গাছের পাতা নীল,
ডাঙ্গায় চরে রুই কাতলা,
জলের মাঝে চিল!"

শুধু বর্ণনাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে মজার ছবিও আছে। একটি কথা বলে রাখা আবশ্যক। যোগীন্দ্রনাথের রচনার আনুষঙ্গিক ছবিগুলি বিভিন্ন আর্টিষ্টের দ্বারা অঙ্কিত হলেও ওগুলি সম্পূর্ণরূপে তাঁরই নির্দ্দেশে অঙ্কিত হ'ত। সুতরাং ওগুলির পরিকল্পনার গৌরব তাঁরই প্রাপ্য।

মজার মুল্লুকের পরের অনুচ্ছেদগুলিতে এবং সঙ্গের ছবিগুলিতে দেখি সেই আজবদেশে নেংটি ইঁদুর দেখে বেড়াল পালায় আর ছেলেরা রসগোল্লা ফেলে ক্যাষ্টর অয়েল খায়। এই পংক্তি ক'টি রচনার কালে যতদূর সম্ভব Robert Browning রচিত শিশু কবিতা হ্যামেলিনের বহুরূপী বাঁশীওয়ালার কথা কবির মনে পড়ে থাকবে, সেই যে হ্যামেলিনের বিকট এবং আজব ইঁদুর যারা রাঁধুনীর হাতার "সুপ" খেয়ে নেয়, লোকের গির্জ্জায় যাবার বাহারে টুপীতে বাসা করে বসে থাকে, এমন কি, মহিলাদের আলাপ আলোচনার স্বর পর্য্যন্ত যাদের কিচির মিচির কিচ্‌মিচ্‌এ ডুবে যায়, আর,

"They fought the dogs and killed the cats,
And bit the babies in the cradles".

মনে হয় সেই অদ্ভুত কুকুরজয়ী, বেড়ালমারী, "সূপ"খাকী ইঁদুরগুলো বা তাদের বংশধরেরাই যোগীন্দ্রনাথের মজার মুল্লুকে এসেছিল। তাই

"সেই দেশেতে বেড়াল পালায়
নেংটি ইঁদুর দেখে।"

এই মজার দেশে আরও কত অদ্ভুত, অদ্ভুত কাণ্ড হয়। মণ্ডা মিঠাই তেতো বোধ হয় আরো ওষুধ খেতে ভালো লাগে, অন্ধকারকে শাদা আর শাদাকে কালো দেখায়। ছবিতে দেখি শিশি শিশি ক্যাষ্টর অয়েল নিয়ে ছেলেরা খাচ্ছে। আর পরের পংক্তিগুলি,

"ছেলেরা সব খেলা ফেলে
বই নে' ব'সে পড়ে;
মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া
লোকের পিঠে চড়ে।"

ইংরেজীতে কোথাও কোনও ভাব দেখলে এবং ইংরেজী জানা কোন ভারতীয় লেখকের রচনাতে অনুরূপ চিন্তার আভাস পেলেই আমরা ধরে নিই যে নিশ্চয়ই দেশী লেখক বিদেশী লেখকের নকল করেছেন কিন্তু হাসিরাশিতে যোগীন্দ্রনাথের রচনার অনেক পরে ইংরেজীতে George Orwell লিখলেন তাঁর Animal Farm—রাশ্যান্ কম্যুনিজ্‌মের ওপর তাঁর স্যাটায়ার। জোন্‌স নামে এক খামারের মালিকের জানোয়ারেরা কিভাবে তাকে খামার থেকে বার করে দিয়ে নিজেরাই মালিক হয়ে বসল এ তারই কাহিনী। কার্ল মার্কসের উদ্ভাবিত 'শ্রেণী সংঘর্ষ' এবং 'শ্রমিক বিপ্লব' এর থিওরী নিয়েই এই স্যাটায়ার রচিত। তবুও ঐ গুরুগম্ভীর পংক্তিগুলি যেখানে জন্তুরা গাইছে,

"Soon or late the day is coming,
Tyrant Man shall be o'erthrown
And the fruitful fields of England
Shall be trod by beasts alone"

সে স্থলে "মজার মুল্লুক" এর

"মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া
লোকের পিঠে চড়ে"

এই পংক্তি কটির প্রতিধ্বনি পাই। যোগীন্দ্রনাথ অবশ্য ব্যঙ্গ রচনা লেখেন নি। বালক বালিকাদের আমোদের খোরাক জোগানই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু সহজ ভাষার পশ্চাতে গভীর চিন্তাধারার সন্ধান করতে বসলে এই কথাই মনে হয় যে সম্পূর্ণ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা কোনদিন সম্ভব নয়। যাদের আজ আমরা অত্যাচারিত বলে করুণা করছি, তারা যদি কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে তারাও নিজেরা আবার অত্যাচারিত শ্রেণীতে পরিণত হবে। এ শুধু রাজনীতি বা সমাজনীতির কথা নয়, মনস্তত্ত্বের কথা। সকলেই জানেন যে, যে বধূ অত্যাচারী শাশুড়ী, ননদের সঙ্গে চোখের জলে ভেসে ঘর করত, কালক্রমে সেই একদিন দারুণ অত্যাচারী শাশুড়ীতে পরিণত হ'ত। তাই ঘোড়া যদি স্বাধীন হয়ে হাতে ক্ষমতা পায়, তাহলে সে মানুষকে ঘোড়া বানিয়ে তার পিঠে চড়বেই। এই হিসেবেই George Orwell এর Animal Farm এ যোগীন্দ্রনাথের রচনার প্রতিধ্বনি পাই।

এরপর যোগীন্দ্রনাথের "মজার মল্লুক" এ দেখি,

"জিলিপী সে তেড়ে এসে
কামড় দিতে চায়;
কচুরি আর রসগোল্লা
ছেলে ধরে খায়।"

এই পংক্তি কটিতে পূর্বের পংক্তিগুলির অনুরণণ দেখি—আজ তুমি যাকে খাচ্ছ সে একদিন তোমাকে খাবে। ভক্ত কবি কবীরদাস বলেছেন,

"মাটি কহে কুম্ভারকো, তু ক্যা রুঁদৈ মোহি।
ইক দিন্ অ্যায়সা আয়েগা, ম্যয় রুঁদোগী তোহি॥

মৃত্তিকা কুম্ভকারকে বলছে, "আজ তুমি আমাকে দলিতপিষ্ট করছ কিন্তু একদিন এমন আসবে যখন তোমার দেহটাকেও আমি অমনি করব।" অর্থাৎ এই পঞ্চভূতে গঠিত দেহ পঞ্চভূতে মিশে যাবে। "মজার মুল্লুক" এর পরের পংক্তিগুলিও সবই আজগুবী।

"ঘুঁড়ির হাতে বাঁশের লাটাই
উড়তে থাকে ছেলে;
বঁড়শী দিয়ে মানুষ গাঁথে
মাছেরা ছিপ ফেলে।"

অভিনিবেশ সহকারে পড়লে এর মধ্যেও নিহিত অর্থ আবিষ্কার করা যায়। ঘুঁড়ি ওড়ান বালকদের বিশেষ প্রিয় খেলা কিন্তু কেন বালকেরা এ খেলা এত ভালবাসে? এই প্রশ্নের উত্তর যোগীন্দ্রনাথের হাসিরাশি রচনার অনেক পরে ইংরেজীতে সমারসেট্ মম্ রচিত "The Kite" নামক ছোট গল্পে পাই। ঐ গল্পে এমন একটি লোকের কাহিনী বলা হয়েছে যে বাল্যকাল থেকে তার প্রবল প্রতাপশালিনী মায়ের পাল্লায় পড়ে কোনরকম স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নি। তার মায়ের ভয় ছিল পাছে সে সাধারণ লোকের "অসভ্য" ছেলে-পিলের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে যায়। মা তার সঙ্গতৃষ্ণা নিবারণের জন্য তাকে ঘুঁড়ি ওড়ানর নেশা ধরিয়ে দেন। পরে তার ঐ নেশা এমন আকার ধারণ করে যে ঐ উপলক্ষ্যে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ ও ক্রমে মনোমালিন্য হয়। সে বিরোধ চরমে ওঠে, যার ফলে সে কারাবরণ করতে বাধ্য হয়। মমের গল্পের নায়ক হারবার্ট সানবেরির ঘুঁড়ি ওড়ানর বাতিকের সমর্থনে লেখক বলেছেন যে সে নিজের অজানিতে ঘুঁড়ির সঙ্গে আপন সত্ত্বাকে একীভূত করেছিল এবং ঘুঁড়ি যখন নীল আকাশের অসীম নীলিমায় ইতস্ততঃ উড়ে বেড়াত, হারবার্টও তখন তার বাস্তবজীবনের সীমাবদ্ধতা ভুলে গিয়ে অনন্ত আকাশে স্বচ্ছন্দ গতির আনন্দ উপভোগ করত। "মজার মুল্লুক"এর যে ছেলেটি ঘুঁড়ির সুতোয় বাঁধা হয়ে আকাশে উড়ছে, তার ছবি দেখে এবং মানসিক অবস্থা কল্পনা করে খোকাবাবুও নিশ্চয়ই ঐ হারবার্টের মতনই মেঘলোকে স্বচ্ছন্দবিহারের কল্পনা করে আনন্দে অধীর হবে।

সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখাটা তো শিশুর মনে খুব শক্ত বনেদের প্রাচীর দিয়ে গাঁথা হয়নি। এ অনেকটা ভারত-চীন সীমান্তের মত। পার্থক্যের মধ্যে ভারত-চীনের সীমারেখাটিকে চৈনিকেরা গায়ের জোরে বদলে দিচ্ছে, আর শিশুর কল্পনারাজ্যে সত্যমিথ্যার সীমারেখাটা লেখক বা কবির লেখনীর যাদুদণ্ডের স্পর্শে রচিত হচ্ছে, ভাঙ্গা হচ্ছে, আবার নূতন করে গড়া হচ্ছে।

মজার দেশের সঙ্গে তুলনীয় একটি ইংরেজী Nursery Rhyme পাই William Brighty Rands রচিত Lilliput Leveeতে।

এটিও একটি Nonsense Rhyme বা আজগুবী ছড়া। ছড়াটির নাম Topsy Turvey World. ছড়াটি হ'ল :—

"If the butterfly courted the bee,
And the owl the porcupine ;
If churches were built in the sea,
And three times one was nine ;
If the pony rode his master,
If the buttercups ate the cows,
If the cat had the dire disaster
To be worried, sir, by the mouse ;
If mamma, sir, sold the baby
To a gipsy for half a crown ;
If a gentleman, sir, was a lady ;—
The world would be upside down !
If any or all of these wanders
Should ever come about,
I should not consider them blunders,
For I should be Inside-out !"

Lilliput Levee লেখা হয়েছিল ১৮৬৪ সনে অর্থাৎ প্রায় "আজি হতে শতবর্ষ আগে।" সুতরাং যোগীন্দ্রনাথ "মজার মুল্লুক" লেখবার সময় এটি দেখে থাকতেও পারেন। কিন্তু দুটি কবিতার তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে "মজার মুল্লুক" এ মজা অনেক বেশী। দেখা যাচ্ছে যে, ইঁদুরের বেড়াল মারা ব্যাপারটাকে সব আজগুবী ছড়াতেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এমন কি, বাংলার নাম-নাজানা গরঠিকানীয়া ছড়া রচয়িত্রী কোন্ শ্বাশতকালের ঠান্‌দির কল্পনায়ও এই চিত্রই ধরা পড়েছিল। তিনি বল্লেন,

"ওরে ও নটেশাক,
তোর দেশে কি এই বিচার—
ইঁদুর বেড়ালে ধরে খায় !"

কিন্তু ইংরেজ কবি পুরুষমানুষ, ঠান্‌দির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবেন কেন ? ইঁদুরকে দিয়ে বেড়াল খাইয়েই এই কল্পনাপ্রবণ মহিলাটির তৃপ্তি হল না। এরপর তিনি ছড়া কাটলেন,

"শুন গো মা ভগবতী,
ছাগলে গিলেছে হাতী,
পুঁটিমাছ তানপুরা বাজায় !"

সুতরাং যোগীন্দ্রনাথের ছড়ায় শুধু সাগরপারের প্রভাব নেই। পল্লীবাংলার শাশ্বতকালের ঐ গুণগুণ ধ্বনিটুকুও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

পৃথিবীতে অর্থাৎ বাস্তবজগতে যা কিছু প্রতিনিয়ত ঘটছে, ঠিক তার বিপরীত ছবিটি দেখিয়েই "মজার মুল্লুক"এর আজগুবী চিত্রটি রচিত হয়েছে। অবিকল ঐ ভাবেরই ছায়া দেখি, "হিজিবিজি"র "উল্টা বুঝ্‌লি রাম" অথবা "ছড়া ও ছবি"র "ছেলে ও বুড়ো" কবিতায়। "উল্টো বুঝলি রাম" কবিতাটি এইরূপ ঃ

উল্টা বুঝ্‌লি রাম—আরে
উল্টা বুঝলি রাম !
কা'কে করলি সওয়ার, আর
কার মুখে লাগাম !
কেউ বা বসে লুটছে মজা,
ভাবছে কি আরাম !
আর টানতে গাড়ী দরদরিয়ে
ঝরছে কারো ঘাম।"

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ঘোড়ারা জামাকাপড় পরে ছাতা মাথায় দিয়ে ফিটন গাড়ীতে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছে আর দুটি ছোট ছোট ছেলে ঘোড়ার স্থলাভিষিক্ত হ'য়ে গাড়ী টানছে। বলা বাহুল্য গাড়োয়ানটিও এক্ষেত্রে ঘোড়া। এই পংক্তি কটি এবং ছবিটি সবই মার্কসীয় দর্শন ও শ্রেণী সংঘর্ষের কথা স্মরণ করায়—সেই সঙ্গে Orwell রচিত Animal Farm এর কথা মনে হয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। তাছাড়াও Lilliput Leveeর "If the pony rode his master"এর প্রতিধ্বনিও ছড়াটিতে আছে।

"ছড়া ও ছবি"র "ছেলে ও বুড়ো" অবশ্য সহজ সরলভাবে রচিত।

ছেলেরা সব ঘুমিয়ে আছে—মুখে চুষিকাঠি ! এই পংক্তিটির সঙ্গে কতকগুলি বৃদ্ধের চুষিকাঠি মুখে দিয়ে শুয়ে থাকার ছবি দেখি।

এরপর আর একটিমাত্র পংক্তি আছে,

"বুড়োরা সব খেলছে পাশা—চশমা নাকে আঁটি !"

এই পংক্তিটির সঙ্গের চিত্রে দেখি কয়েকটি বালক তাকিয়া ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানতে টানতে পাশা খেলছে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের "ইচ্ছাপূরণ" গল্পটি স্মরণ হয়। সে গল্পের নায়ক কে বলা মুস্কিল। বৃদ্ধ পিতা সুবলচন্দ্র ও বালক পুত্র সুশীলচন্দ্র দুটি চরিত্র আছে গল্পটিতে। সুবলচন্দ্র শৈশবে যথাযথভাবে লেখাপড়া না শেখার জন্য অনুতপ্ত হয়ে ভাবছিলেন যে, যদি শৈশব ফিরে পাওয়া যায়, তিনি আর সময় নষ্ট করবেন না। তাঁর পুত্রও ভাবছিল যে পিতার মত বয়স্ক হলে সে বয়স্কদের শাসনের হাত থেকে নিস্তার পায়। সেই সময় ইচ্ছা ঠাকরুণ সেই স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। পিতাপুত্রের মনস্কামনা জানতে পেরে, তিনি উভয়কে (অবশ্য তাদের অজানিতে) বর দিলেন। পরের দিন সকালে উঠে পিতা পুত্রের বয়সী ও পুত্র পিতার বয়সী হয়ে গেল। এর ফলে যে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হ'ল, রবীন্দ্রনাথের গল্পটি তাই নিয়েই রচিত। "ছেলে ও বুড়োর ভাবও একই।

"ছড়া ও পড়া"র "ভারী সুবিধা" আর একটি আজগুবী কবিতা। বেচারা দাশুর পাঠশালাতে পড়া শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে গুরুমশাই কারণে অকারণে তাকে কানমলা দিতে লাগলেন। ফলে কানটি লম্বা হয়ে তার হাঁটু ছাড়িয়ে ঝুলতে লাগল। দাশুর কিন্তু এতে খুবই সুবিধা হ'ল। ঐ একই কানে তার শীতকালে লেপ, বর্ষাকালে ছাতা ও গ্রীষ্মকালে হাত পাখার কাজ সারা হতে লাগল। এটিকে শুধু আজগুবী কবিতা না বলে ব্যঙ্গ কবিতাও বলা চলে কারণ কবিতাটিতে সে যুগের প্রবল প্রতাপান্বিত গুরুমশাইয়ের ছাত্রশাসনের প্রতিও কটাক্ষ আছে।

এডওয়ার্ড লিয়রের Nonsense Rhyme এ লম্বা নাক দিয়ে অনেক ব্যঙ্গ কবিতা আছে। যথা—

'There was an Old Man with a nose,
Who said, "If you choose to suppose,
That my nose is too long
You are certainly wrong!
That remarkable Man with a nose".

ছবিতে দেখি একটি মোটা সোটা বৃদ্ধের নাক এত লম্বা হয়ে গেছে যে নাকটির মাঝখানে প্যাঁচ দিয়ে ঘুরিয়ে সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই রকমই আর একটি লিমারিকে একটি নাকেশ্বরীকে দেখা যাচ্ছে। তিনি আবার আগুলফলম্বিত নাক সামলাতে না পেরে নাকটিকে বহন করবার জন্য এক বৃদ্ধাকে বেতন দিয়ে নিযুক্ত করেছিলেন। কবিতাটি এইরূপ :—

"There was a Young Lady whose nose
Was so long that it reached her toes;
So she hired an Old Lady,
Whose conduct was steady,
To carry that wonderful nose."

নাকের বিষয় তৃতীয় কবিতায় আর এক "নাকু"কে দেখি, যার নাকের উপর বিশ্বের যত পাখী বাসা বেঁধে বসেছিল। কবিতাটি হ'ল :—

"There was an Old Man, on whose nose,
Most birds of air could repose:
But they flew away
At the closing of the day,
Which relieved that Old Man and his nose."

যোগীন্দ্রনাথের রচিত লম্বা নাকের কবিতাটি আরও চমৎকার। এটি হিজিবিজির "নাক।—সাবধান!"এ হট্টমালার দেশের গল্প। নামটি বাংলাদেশে প্রচলিত রূপকথার দেশের নাম। সেই রাজ্যের গদাই কর্ম্মকার বেচারা খাঁদা লোক দেখে হাসার ফলে শাস্তিস্বরূপ তের হাত লম্বা নাকের অধিকারী হয়। এ স্থলেও মনে হয়, প্রচলিত বাংলাপ্রবাদ "বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি" লেখক স্মরণ করে থাকবেন। বেচারা গদাই আবার বার হাতও নয়, একেবারে ছোট্ট। তবু তার নাক তের হাত লম্বা হয়ে গেল। ফলে বেচারা হাত বাড়িয়ে নাকের ওপরে নাগাল পেত না, নাকটাকে গাছের ডালে রগড়ে চুলকোতে হ'ত। লিয়রের ছড়ার বৃদ্ধ লোকটির মতনই কাকচিল গাছের ডাল ভেবে তারও নাকে বাসা বাঁধত কিন্তু ঐ বৃদ্ধের তো আর খেলাধুলার সমস্যা ছিল না। বেচারা গদাই ছেলে মানুষ। তার চুকপাটি আর লুকোচুরি খেলা সবই ওই নাকের জন্যই মাটি হত। লিয়রের পাঁচ পংক্তির ছড়ায় বৃদ্ধের নাকি বৃদ্ধির কোনও কারণ পাওয়া যায় না কিন্তু গদাইয়ের নাক

লম্বা হ'ল তার বুদ্ধির দোষে। তাই লেখক বালকবালিকাদের সাবধান করে বলেছেন,—

"কর্ম্মদোষে চিরদুঃখী গদাই কর্ম্মকার,
এ কথাটা ভুল না কেউ তোমরা খবর্দ্দার।"

আজগুবী ছড়ার হাস্যরসের সঙ্গে এই উপদেশ দান সে যুগের শিক্ষাপদ্ধতির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ দান বা আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাদান এই ছিল সেদিনের motto। তৎকাল প্রচলিত প্রথাটিকে যোগীন্দ্রনাথ অবহেলা করতে পারেন নি।

এইরকমই আজগুবী ছড়ার সঙ্গে শিক্ষার মিশ্রণ দেখি "হিজিবিজি"র "বাপরে বাপ"—কবিতায়। দুটি ছোট ছেলে গাছ কাটার অপরাধে বনদেবীর কোপে পড়ে কেমন করে ধীরে ধীরে গাছে পরিণত হ'ল, তারই কাহিনী। ছবিতে দেখি ছেলে দুটির একটি করে পায়ের থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে সমস্ত দেহই গাছে পরিণত হচ্ছে।

লিয়রের ছড়ায় লম্বা নাকের কথা আছে। যোগীন্দ্রনাথ তাঁর ছড়ায় লম্বা কানওয়ালা দাশুর কথা লিখলেন, লম্বা নাকওয়ালা গদাইয়ের কথা লিখলেন। আবার বিশাল লম্বা তালগাছের মত পাওয়ালা লোকের গল্প লিখলেন হিজিবিজির "দোলনা"তে। একটি ছোট ছেলে বলছে,—

"আমি দুলতে যখন চাই,
    ঘোষপাড়াতে যাই;
ঠেংটা উঁচু করে দাঁড়ায়
    বংশীমুদীর ভাই।
এই ঘাড়ে যার চাপ,
    এ নন্দঘোষের বাপ,
দুইটিতে যে যমজ এরা
    সন্দেহ তায় নাই।"

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বংশী মুদীর ভাই তার অস্বাভাবিক লম্বা পা নন্দঘোষের বাপের কাঁধে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর সেই পায় দোলনা টাঙিয়ে একটি ছোট ছেলে দুলছে। যোগীন্দ্রনাথের অনেক ছড়াই তাঁর ভাষার গুণে

হাস্যরস উৎপন্ন করে। আবার কোনও কোনও ছড়া যেমন "নাক!—সাবধান!" বা "দোলনা"—এগুলি আনুষঙ্গিক ছবি না হলে অঙ্গহীন হয়ে পড়ত বলে মনে হয়। সমস্ত ছড়াটি লিখতে একপৃষ্ঠা লেগেছে। সেই পৃষ্ঠার ডানধারে "গদাই" নামে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে এবং ছড়ার শিরোনামার উপর দিয়ে গদাইয়ের নাক পৃষ্ঠার বামদিক পর্য্যন্ত প্রসারিত। সেই নাকের ডগা থেকে মাকড়সা জাল বুনতে বুনতে পৃষ্ঠার বাঁদিকের নীচে পর্য্যন্ত চলে গেছে। ছবিটা না থাকলে ছড়ার অঙ্গহানি হত, তাতে সন্দেহ নাই কিন্তু যেখানে আজগুবী কবিতা ভাষাশ্রিত, যথা,—

"এক যে আছে মজার দেশ
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ,
দিনে চাঁদের আলো।"

সেক্ষেত্রে সঙ্গে ছবি না থাকলেও কবিতার হাস্যরস ক্ষুণ্ণ হ'ত না বোধহয়। কিন্তু আনুষঙ্গিক চিত্রগুলি না থাকলে লিয়রের লিমারিকগুলি কতটা হাসির খোরাক জোগাত বলা যায় না। বস্তুতঃ লিয়র ছিলেন মূলতঃ ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টর। তাঁর নিয়োগকর্ত্তার শিশু পুত্রকন্যাদের আমোদ দেবার জন্য এবং কতকটা নিজের অবসর বিনোদনের জন্য তিনি ঐ আজগুবী ছড়া এবং ছবি রচনা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ভাগ্য এমনই যে ঐ হেলাফেলার রচনাই তাঁকে অমর করে রাখল! ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টর লিয়র এবং লিমারিক লেখক লিয়রকে একসূত্রে গেঁথেছে লিমারিকের সঙ্গের চিত্রগুলি। লিয়র ভারতভ্রমণে এসে যে Indian Journal লেখেন, তার ভূমিকায় Ray Murphy বলেছেন,

"Modern appreciation of Lear as an artist is based on two achievements which he regarded as sidelines. He gave a new idiom to humorous drawing—that deceptively simple line based on a child's view of an absurd adult world set in a style which has infected most modern comic artists and can be found in the current issue of the Punch or the New Yorker."

লিয়রের সাম্প্রতিক কবিস্বীকৃতি তাঁব দুইটি কৃতিত্বেব জন্য, যা নিজে তিনি গৌণ মনে কবতেন। ব্যঙ্গচিত্রে তিনি অভিনব দ্যোতনা এনেছেন। বযস্কদেব চিন্তাজগতের অদ্ভুত দিক্‌টা শিশুব চোখেব পংকলায যে আকার নেয তা তিনি অতি সূক্ষ্মভাবে দুই একটি তুলিব পোঁচবায চমৎকাবভাবে ফুটিযেছেন। তার রচনাশৈলী বর্তমান যুগেব প্রায সব ব্যঙ্গচিত্র শিল্পীদেব উপবই প্রভাববিস্তাব কবেছে। 'পাঞ্চ' অথবা 'নিউ ইওর্কাব'এব বর্তমান সংখ্যাব মধ্যে এটা লক্ষণীয়।

লিমারিক নামক লিয়ব-বচিত পাঁচ লাইনেব ছড়াগুলি সুকুমার বায়েব "আবোলতাবোল" এবং যোগীন্দ্রনাথেব "হিজিবিজি" প্রমুখ অন্যান্য বইয়ের ছড়ার উপর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব অবশ্যই বিস্তাব কবেছে কিন্তু তাব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে ঐ সব বইয়েব ছবিব উপব।

লিয়র অঙ্কিত অনেক ছবিরই প্রভাব দেখি সুকুমার রায় এবং যোগীন্দ্রনাথের ছবিব উপব। যথা, লিয়বেব একটি লিমাবিক আছে,

"There was an old Man of Coblenz,
The length of whose legs was immense ;
He went with one prance
From Turkey to France,
That surprising old Man of Coblenz."

এব সঙ্গে যে বিশাল পাওয়ালা টিঙটিঙে বোগা লোকটির ছবি আছে, তাব সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথেব "দোলনা" ("আমি দুলতে যখন চাই, ঘোষপাড়াতে যাই")র ছবি তুলনীয়।

আবার আর একটি লিমারিক,

"There was an Old Man of Dundee,
Who frequented the top of a tree,
When disturbed by the crows,
He abruptly arose,
And exclaimed, "I'll return to Dundee."

এর সঙ্গে গাছের উপব বসে থাকা একটি লোকেব ছবি দেখি, যার সঙ্গে "হিজিবিজি"র "ঘোড়ার ডিম" (ঘোড়ায় নাকি পাড়ে না ডিম-ঐ দেখ তাব বাসা ; ডিমের উপর বসে ঘোড়া তা দিচ্ছে খাসা) এব ছবি তুলনীয়।

পাঁচ পংক্তির আজগুবী একটি মাত্র ছড়া যোগীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন। এটি হ'ল "ছড়া ও ছবি"র রূপকথা। ছড়াটি এই :—

"এক যে মা, তার ছয়টি ছাঁ,
দুইটি খাঁদা,
দুইটি হাঁদা,
আর দু'টি—
একেবারে বোম্বাই গাধা !"

অবশ্য এটিকে সম্পূর্ণ আজগুবী ছড়া বলা চলে না। কারণ অসম্ভব কিছুই এতে নেই। অসম্ভব বা আজগুবী ব্যাপারে পূর্ণ দুটি বই লিখেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ। এটির একটি হ'ল "হিজিবিজি", অপরটি "আষাঢ়ে স্বপ্ন"। যোগীন্দ্রনাথের "কেমন হত" এবং "অদল বদল" নামক দুটি ছড়ার সঙ্গে সুকুমার রায়ের "খিচুড়ি" শীর্ষক ছড়ার সাদৃশ্য যে কোনও পাঠকেরই চোখে পড়বে। যোগীন্দ্রনাথের "কেমন হত" ছড়াটি হ'ল :—

"বাঘের মুখে ঝুলতো যদি
রামছাগলের দাঁড়ি,
শূয়োর যদি পাখীর মত
উড়তো ডানা নাড়ি ;
গাছের ডালে বসে বাঁদর
গোঁফে দিত চাড়া,
ভুতুম পেঁচা আসতো ছুটে
বাগিয়ে বিষম দাঁড়া ;
উৎসাহেতে ধোপার গাধা
গাইত যদি গান,
দেখে শুনে চমকে তবে
উঠতো না কার প্রাণ !"

এর সঙ্গের ছবিটিতে দেখি যে, যে গাছের ডালে ডানাওয়ালা বাঁদর বসে আছে, তারই নীচে লম্বা দাড়ি নিয়ে ব্যাঘ্রমশাই উপবিষ্ট এবং তাঁর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে গাধা গান গাইছে। "অদল-বদল"

কবিতাটিতেও অনুরূপভাবে এবং সঙ্গের ছবিটি সেই ভাবেরই ছায়া। এর সঙ্গে সুকুমার রায়ের "খিচুড়ি" অর্থাৎ

"হাঁস ছিল সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না।"

তুলনীয়। পার্থক্যের মধ্যে দেখি যোগীন্দ্রনাথ দুটি করে জন্তু বা পাখীর কাজ অদলবদল করেছেন খেয়ালখুসি মতন আর সুকুমার রায় গুরুত্ব দিয়েছেন ভাষার উপর। একটি প্রাণীর নামের শেষ অক্ষর এবং আর একটির নামের প্রথম অক্ষর যেখানে এক, সেখানে সেই দুটি প্রাণীর নাম জুড়ে দিয়ে সুকুমার রায় এক কিম্ভূতকিমাকার জীব বানিয়েছেন। দুজনের বহু ছড়াতেই ভাবের মিল দেখা যায়। বলা বাহুল্য ছড়াগুলি আজগুবী। যোগীন্দ্রনাথ যখন "ছড়া ও ছবি"তে লিখলেন, "তখন আর এখন", সুকুমার রায় লিখলেন, "পালোয়ান"। "তখন আর এখন"এর বীরটি বলে,

"তখন যদি দেখতে আমায়, উঠতে ভয়ে ঘেমে,
শুনলে হাঁকার ভূমিকম্পের কম্প যেত থেমে।"

শুধু তাই নয়, রাজবাড়ীতে প্রয়োজন হলে, এই বীরটি আশি হাজার মণ পিঁপড়ের দুধ সরবরাহ করত আর আস্ত তালের গাছকে খড়কে করে দাঁত খুঁটত। হাতী নিয়ে তার লোফালুফি দেখে সকলে তাকে "মল্ল মহারাজ" বলে ডাকত কিন্তু কেউ যদি তার সেই মূর্ত্তি দেখতে চায়, সেই ভয়ে সে বলে,

"সেদিন আর নাই কো রে ভাই,
সেদিন আর নাই,
তিনটি হাতীর ভারেরই এখন হাঁপিয়ে মারা যাই।"

"আবোলতাবোল" এর "পালোয়ান" এর নাম ষষ্ঠী চরণ। তিনিও খেলার ছলে যখন তখন হাতী লোফেন, গুণ্ডার মারা বাঁশ তাঁর কনুয়ে লেগে ফট্ করে ফেটে যায় আর তার মাথায় লেগে প্রকাণ্ড ইটও ভেঙ্গে যায়। শেষ পর্য্যন্ত লেখক বলেছেন,

"বললে বেশি ভাববে শেষে, এ সব কথা ফেনিয়ে বলা
দেখবে যদি আপন চোখে যাও না কেন বেনিয়াটোলা।"

কবিতার মাধ্যমে ব্যঙ্গ বা শ্লেষ সুকুমার রায়ের একটি সর্ব্বজন পরিচিত বৈশিষ্ট্য কিন্তু এক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথের কবিতায় তা নেই। যাঁরা নিজেদের

পৌরুষ নিয়ে বা দেহশক্তি নিয়ে বৃথা দর্প করেন, যোগীন্দ্র রচনাটি তাঁদের প্রতি কটাক্ষ। "তখন আর এখন" এর মল্ল মহারাজটি নিজের গুণে নিজেই মোহিত অথচ তার কথার যাথার্থ্য পাছে কেউ যাচাই করে, সেই ভয়ে বলে, এ সবই তার অতীত দিনের কাহিনী।

"সেদিন আর নাইকোরে ভাই,
সেদিন আর নাই—
ভাবতে গেলে সে সব কথা বড়ই ব্যথা পাই।"

যোগীন্দ্রনাথ রচিত আজগুবী ছড়া আরও অনেক আছে কিন্তু তার মধ্যে আজগুবীতম হ'ল "লাসি-রাশি'র "অবাক কাণ্ড ভাই"। কবিতার আরম্ভ হ'ল—

"অবাক কাণ্ড ভাই!
এমন ব্যাপার আর কখনো
জন্মে দেখি নাই!
দিশেহারা খিদের চোটে—
তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে
ধরলে এ উহায়;
পেটের জ্বালা ঘুচলো বটে,
প্রাণ বাঁচান দায়!"

গল্পটি বলছে একটি খরগোস; মুখে সিগারেট নিয়ে শরবণের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে সর্পদ্বয়ের লীলা দেখে অবাক!

তিন sttnzaর কবিতা। প্রথম stanza তে সাপ দুটির দেহ পরস্পরের পেটের মধ্যে চলে গেছে, ছবিতে এমনি দেখা যায়। তাই "পেটের জ্বালা ঘুচলো বটে" কিন্তু প্রাণ যে যায়।

দ্বিতীয় stanzaতে পরস্পরকে ভক্ষণ করা আরও একটু অগ্রসর হ'ল, খরগোস ভায়াও বিস্ময়ে কোমরে দুই হাত রেখে নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বলল,

"নামমাত্র যখন বাকি,
তখন দু'য়ে মুখোমুখি
উগরে ফেলতে চায়;
প্রাণের তরে টানাটানি,
কিন্তু নিরুপায়!"

কিন্তু বিস্ময়ের তখনও বাকী ছিল। শেষ stanzaতে খরগোস ভায়া একেবারে মাথায় এক হাত রেখে নৃত্যের ভঙ্গীতে বলছে,

"অবাক কাণ্ড ভাই!
এমন ব্যাপাব আর কখনো
জন্মে দেখি নাই!
দেখতে দেখতে কি যে হ'ল—
কোথায় যেন মিলিয়ে গেল
ভেল্কী-বাজী প্রায়!
এখনো তা ম'নে হ'লে
দিচ্ছে কাঁটা গায়!"

ছবিতে দেখি গোল ছায়াটুকু রেখে দুটি সাপেরই কায়া মিলিয়ে গেছে। Mr. Rabitকে তো Lewis Caroll তাঁর Alice in Wonderlandএর মারফৎ বিখ্যাত করেই গেছেন। জন্তুজানোয়ারের মাধ্যমে মানবীয় ভাষায় ভাবপ্রকাশ বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। সেই হিসেবে দেখতে গেলে শিশুসাহিত্যের শতকরা নব্বই ভাগই আজগুবী কিন্তু এখানে তো শুধু তা নয়; এমন একটা বর্ণনা করা হয়েছে, যা বাস্তবে ঘটবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। অ্যাটম্ বোমা ফেলে শহরের পর শহর নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যায় কিন্তু দুটি প্রাণী পরস্পরকে আক্রমণ করে উভয়েই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এ একেবারে ভোজবাজী, —কখনও হয়নি, বোধহয় কস্মিন্‌কালেও হবে না।

এক হিসেবে "মজার মুল্লুক"এব চেয়েও এটি বেশী আজগুবী। কারণ "মজার মুল্লুক"এর মজা ভাষাশ্রিত, ঘটনাকে আশ্রয় করে নয়। কথাটা একটু ব্যাখ্যা কবে বোঝান প্রয়োজন! প্রথমেই পাঠককে "মজার মুল্লুক"এর ছবিগুলিব দিকে চোখ বুজিয়ে শুধু কথাগুলির দিকে মনোযোগ দিতে বলব। "মজার মুল্লুক"এর প্রথম পংক্তিকটিতে দেখি যে সেখানে অন্ধকারটাকে শাদা দেখায়, শাদা জিনিষ কালো। এখানে "শাদা জিনিষ" কথাটাকে Rhythmএর খাতিরে ব্যবহার করা হয়েছে। "শাদা জিনিষ"এর অর্থ হল আলো। তাহলে অর্থ দাঁড়াল এই যে মজার মুল্লুকে অন্ধকার শাদা আর আলোর বর্ণ কালো। এই মজা সম্পূর্ণরূপে ভাষাশ্রিত। যদি ভবিষ্যতে কোনদিন ভাষাবিবর্ত্তনে 'আলো' অ র

'অন্ধকার' শব্দদুটি পরস্পরের সঙ্গে অর্থ পরিবর্ত্তন করে, তাহলে আর মজার দেশের মজা থাকবে না। ওই রকমই পরের পংক্তিগুলিতে আকাশের নীলিমা আর বৃক্ষপত্রের হরিৎবর্ণ সেও ভাষার প্রকাশ ভঙ্গিমা মাত্র। "নীল" আর "সবুজ" এই বিশেষণ দুটি যদি পরস্পরের সঙ্গে অর্থ পরিবর্ত্তন করে নেয়, তখন

"আকাশ সেথা সুনীলবরণ
গাছের পাতা নীল,"

এর মধ্যে কোনও অসম্ভাব্যতা থাকবে না। এরপর (১) রুইকাতলা এবং চিল, (২) রসগোল্লা ও ক্যাষ্টর অয়েল, (৩) বেড়াল ও নেংটি ইঁদুর ইত্যাদি শব্দের জোড়া যদি পরস্পরের সঙ্গে অর্থ বদলাবদলি করে, তাহলে "মজার মুল্লুক"এর মজা কতটা থাকবে, বলা যায় না। অবশ্য সঙ্গের ছবির দিকে তাকালে আর একথা বলা যাবে না, সেটা ঠিকই। কিন্তু "অবাক কাণ্ড"র যে ব্যাপার, তা বাস্তবে ঘটা কোনক্রমে সম্ভব নয়। সেইজন্যই ছড়াটি যোগীন্দ্রনাথের সব আজগুবী ছড়ার মধ্যে আজগুবীতম। Alice in Wonderlandএর Aliceএর ভাষায় "Curioser and Curioser." আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, যোগীন্দ্রনাথ বালকবালিকাদের হাসাবার জন্যই এ ছড়া লিখেছিলেন কিন্তু ভেবে দেখলে এই আজগুবী ছড়ার মধ্যেও নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করা যায়। পরস্পর ঝগড়া অর্থাৎ দেশজ ভাষায় যাকে বলে "খেয়োখেয়ি", তা উভয়েরই সর্ব্বনাশ ডেকে আনে, হয়তো এই সর্ব্বজনবিদিত সত্যটিকেই লেখক নূতন করে বলতে চেয়েছিলেন। সাপ একবার কোনও প্রাণীকে গিলতে আরম্ভ করলে ইচ্ছে থাকলেও ছাড়তে পারে না। বিবাদের সময়ও লোকের মনের ভাব অনেকটা ওই রকমই হয় কিন্তু প্রতিপক্ষও যদি সমান শক্তিশালী হয় এবং তার মনেও যদি ওই রকম "নাছোড়বান্দা" ভাব থাকে, তাহলে উভয়েরই সর্ব্বনাশ। এ কথাটি ব্যক্তিগত জীবনেও সত্য, আবার রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সত্য। তবে যে ব্যাপারের মাধ্যমে এ তথ্যটি পরিবেষণ করা হয়েছে, সেই ব্যাপারটি বস্তুজগতে অসম্ভব, তাই অবিশ্বাস্য এবং আজগুবী। বালকবালিকারা নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝে না। তাদের কচি মুখে হাসি দেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত এই আজগুবী ছড়া যোগীন্দ্রনাথের সার্থক সৃষ্টিগুলির মধ্যে অন্যতম।

তৃতীয় অধ্যায়

যোগীন্দ্রনাথের আজগুবী গল্প

যোগীন্দ্রনাথের বিভিন্ন শিশুপাঠ্য পুস্তকে আজগুবী ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু আজগুবী গল্পও পাই। "আজগুবী" শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? যা কিছু অসম্ভব ও ভিত্তিহীন, তাই অবিশ্বাস্য, সুতরাং আজগুবী! অবশ্য জানোয়ারের কথা বলা ব্যাপারটাই আজগুবী এবং সেই হিসেবে দেখতে গেলে, প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত বিভিন্ন দেশের রূপকথা থেকে আরম্ভ করে ঈশপের কাহিনীগুলি পর্য্যন্ত সবই আজগুবী। সেক্ষেত্রে বলতে হয় যে শিশুসাহিত্যের মধ্যে অধিকাংশই আজগুবী। কিন্তু শুধু জন্তুদের মানুষের ভাষায় কথা বলাই নয়, আরও কিছু উদ্ভট বা অবিশ্বাস্য ঘটনা বা দৃশ্যের সন্ধান যে সাহিত্যে পাই, তাকেই প্রকৃত অর্থে non-sense বা আজগুবী বলা চলে।

যোগীন্দ্রনাথ রচিত আজগুবী গল্পগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল, "আষাঢ়ে স্বপ্ন"। নামটিই গল্পের অসম্ভাব্যতা জানিয়ে দেয়। এ গল্পের নায়ক স্বয়ং লেখক। স্বপ্নটি জানোয়ারের দেশের স্বপ্ন। লেখক সারাদিন চিড়িয়াখানায় ঘুরে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্ন দেখেন যে তিনি যেন সিংহ, বাঘ আর ভাল্লুকের দেশে গিয়েছেন। সেখানে,

"চারিদিকেই জানোয়ারের বাড়ী ঘর, জানোয়ারের পথ ঘাট, জানোয়ারের হাটবাজার। জানোয়ারগুলো যেন সকলেই স্বাধীন; আবার সম্প্রতি যেন তাহারা কিছু অধিকমাত্রায় শান্ত শিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সিংহ বাঘেরও যেন রক্তমাংসে আর তেমন রুচি নাই! তাই, তাহাদের কাহাকেও আর আটকাইয়া রাখিবার দরকার হয় না।"

যতদূর সম্ভব ১৯০১ সনে প্রকাশিত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "আষাঢ়ে গল্প" বইখানির নামের অনুকরণে যোগীন্দ্রনাথ নিজের বইয়ের নাম দেন "আষাঢ়ে স্বপ্ন।" আষাঢ়ে গল্পই যথেষ্ট অবিশ্বাস্য, তার উপর আবার আষাঢ়ে স্বপ্ন।

স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনা সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে কবে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল, সঠিক জানিনা। ইংরেজী সাহিত্যে দেখি, চসারের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ

শতাব্দীতে উইলিয়ম ল্যাংল্যাণ্ড তাঁর পিয়ার্স প্লাওম্যান গ্রন্থে স্বপ্নের কাহিনী শোনালেন। এটি একটি রূপক। এর প্রথম অংশে লেখক তাঁর সমসাময়িক সামাজিক চিত্র দেখিয়েছেন এবং পরে বাইবেলের "গসপেল" অনুসরণ করে চললে সংসারটা কিভাবে পরিবর্ত্তিত হতে পারত, তারই কাহিনী আছে। এর পরও আরও বহু লেখক সাহিত্যে স্বপ্নের অবতারণা করেছেন, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে আজবদেশে অর্থাৎ অসম্ভব ঘটনার দেশে চলে যাওয়া আমাদের একটি লেখক এবং একটি বইয়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সে লেখক Lewis Caroll এবং সে বই তাঁর রচিত শিশু এপিক "অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড"। এই সর্ব্বজন পরিচিত কাহিনীটির সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের কাহিনীর যেমন কতকগুলি সাদৃশ্য আছে, তেমনই বহু পার্থক্যও আছে। সাদৃশ্যের মধ্যে দেখি, অ্যালিস্ যে অদ্ভুত দেশে গিয়েছিল, সেখানে বহু অসম্ভব ঘটনা ঘটেছে। আষাঢ়ে স্বপ্নের জানোয়ারের দেশেও অনুরূপ ব্যাপার দেখি কিন্তু "অ্যালিস্" আজবদেশে গিয়ে শুধু খরগোস, ইঁদুর, হাঁস, টিকটিকি ইত্যাদি নিরীহ জানোয়ারের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। আষাঢ়ে স্বপ্নের জানোয়ারগুলি কিন্তু প্রায় সবই হিংস্র জন্তু অথচ কি মন্ত্রবলে জানি না, তারা হিংসা ভুলে গেছে। এই দুই রচনার মধ্যে আর একটি পার্থক্য লক্ষণীয়। অ্যালিস্ স্বপ্নে আজবদেশে গিয়েছিল, এ কথা প্রথমে স্পষ্টরূপে বলা হয় নি বরঞ্চ গল্পটি পড়লে প্রথমে মনে হয় যে কোন যাদুকরের মন্ত্রবলে এই মাটির পৃথিবীতেই নানা অসম্ভব ঘটনা ঘটছিল। সত্য সত্যই বুঝি কখনও ওষুধ খেয়ে, কখনও কেক খেয়ে অ্যালিসের আয়তন অবিশ্বাস্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছিল। ব্যাপারটি যে স্বপ্ন তা বুঝতে পাঠকের সময় লাগে। আষাঢ়ে স্বপ্নে স্পষ্টরূপে বলেই দেওয়া হয়েছে যে লেখক স্বপ্ন দেখছিলেন। জানোয়ারের মুল্লুক আবার "কিপলিং" রচিত The Jungle Books বা Mowglie Stories এর কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় কিন্তু Mowglie Storiesএ দেখি, জন্তু জানোয়ারেরা বাস্তবে যেরূপ আচরণ করে, তারই একটু হেরফের করে এক মানবশিশুকে জঙ্গলে বাস করতে পাঠিয়ে গল্পটি লেখা হয়েছে। আষাঢ়ে স্বপ্নে কিন্তু দেশটা নামে জানোয়ারের রাজ্য হলেও সমস্ত দেশটাই মানুষের দেশে পরিণত হয়েছে। এমন কি, প্রত্যেক জন্তু সেখানে সভ্য মানুষের মত কাপড়চোপড় পরে বেড়াচ্ছে, রাজা অর্থাৎ সিংহ তাঁর ভালুক নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটাচ্ছেন,

লোকে অর্থাৎ জানোয়ারে লেজমোটা ডাক্তারের কাছে (অবশ্য তিনিও জানোয়ারই) চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে, জানোয়ারের ছেলেপিলে ভালুক পণ্ডিতের কাছে পড়াশোনা করছে অর্থাৎ মানুষের জগতে যা কিছু ঘটে, সবই কোনও না কোনও আকারে এখানে ঘটছে। এমন কি, এদেশে হ্যাটকোট পরা সাহেবের বেশে পুলিশ সার্জেন্টও ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইনিও অবশ্য মানুষ নন, একটি বুল্‌ডগ্‌। লেখকের সঙ্গে তাঁর গাইড চতুর্ভুজ শেয়ালের কথাবার্ত্তা থেকে জানতে পারি যে সে দেশে নবাগতদের খবরাখবর রাখাই তাঁর কাজ। এই পুলিশ সার্জেন্টটি স্বভাবতঃই দেশদেশান্তরের সিকিউরিটি পুলিশের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ সার্কাসে যেমন জানোয়ারদের দিয়ে দুপায় হাঁটান, হাতীকে দিয়ে ফুটবল খেলান, কুকুর দিয়ে অঙ্ক কষান হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রে যেন সেই সব ব্যাপারই স্বাভাবিকভাবে ঘটে চলেছে।

গল্পের প্রথমেই লেখক সাক্ষাৎ পেলেন এক শেয়ালের। তার নাম চতুর্ভুজ। ঈশপের কাহিনীর মারফৎ সাধারণভাবে সারা পৃথিবীতে, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদের মাধ্যমে বিশেষভাবে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট শৃগালের ধূর্ত্ততার কাহিনী অমর হয়ে আছে। যদিও চতুর্ভুজ মানে যার চারটি হাত আছে, তবু মনে হয় হয়তো শৃগালের বিশেষণ "চতুর" কথাটি থেকেই এই চতুর্ভুজ নামটি লেখকের মনে পড়েছিল। এ ক্ষেত্রে চতুর্ভুজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লেখকের গাইড বা দিশারীর কাজ করতে আরম্ভ করল।

চতুর্ভুজের সঙ্গে আজবদেশ পরিক্রমায় বার হয়ে লেখক প্রথমেই দেখেন যে বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে এক পেঙ্গুইন পাখী সিপাই সেজে পাহারা দিচ্ছে। সঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক একটি চিত্রও পাই। অবশ্য প্রত্যেক জানোয়ারেরই মানুষের মত জামাকাপড় পরা এবং মানুষেরই ভঙ্গীতে রকমারী হাস্যকর চিত্র এই কাহিনীকে সরস, উজ্জ্বল করেছে। চতুর্ভুজের সঙ্গে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করে লেখক দেখলেন যে রাজামশাই অর্থাৎ পশুরাজ সিংহ-ভালুক নাপিতকে দিয়ে দাড়ি কামাচ্ছেন, চুল ছাঁটাচ্ছেন। লেখকের প্রশ্নের উত্তরে চতুর্ভুজ বলে, "রাজামশাই এখন ক্ষৌরী হচ্ছেন।" এই দেশজ শব্দটি আজকের যুগের সভ্যভব্য শিশুরা নাও বুঝতে পারে কারণ

রূপকথা তো আর তারা ঠাকুরমা, দিদিমার মুখে শোনে না, বইয়ের সাহিত্যিক ভাষায় পড়ে। কিন্তু "ক্ষৌরী" শব্দটি যেন এক নিমেষে আমাদের বাঁশঝাড় আর পানাপুকুরের পাশ দিয়ে সেই কুটীর প্রাঙ্গণে নিয়ে যায়, যেখানে তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম সেরে মা যখন রাত্রের রান্না সারতে হেঁসেলে ঢুকেছেন, তখন পূব বা পশ্চিমের কোঠার "দাওয়ায়" বসে ঠান্‌দিদি কটি নিদ্রাতুর ক্ষুদ্র প্রাণীকে নাপিত-ভায়া আর শেয়ালের গল্প বলছেন। উদ্দেশ্য ভাত না নামা পর্য্যন্ত তাদের জাগিয়ে রাখা। সেই সব দিনের সেই সব কাহিনীর রাজামশাইয়েরা নাপিতকে দিয়ে "ক্ষৌরী" হতেন। তাই লেখকের ভাষার বৈশিষ্ট্য এস্থলে লক্ষণীয়।

বিদ্যাদিগ্‌গজ নামক ভালুক পণ্ডিতের পাঠশালার কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এক ভালুক ছাত্র পড়া বলতে না পাড়ায় গুরুমশাই তার কান ধরে তাকে পাঠশালা থেকে বার করে দিচ্ছেন, এই রকম একটি ছবিও এই সঙ্গে আছে। ছাত্রটির গোঙানি শুনে লেখক প্রশ্ন করাতে চতুর্ভুজ বলে, "এক ছোকরা দুয়ে দুয়ে যোগ করে পাঁচ লিখেছে, তাই গুরুমশাই রাগ করে তার কান ধরে পাঠশালা থেকে তাকে তাড়িয়ে দেবার মতলব করেছেন আর ছেলেটা কাঁদছে।" লেখক তার উত্তরে বল্লেন, "মানুষের ছেলে হলে বলত,

"দুয়ের পিঠে দুই,
বিছানা পেতে শুই,"

তারপর লেখক চতুর্ভুজকে মানুষের দেশের ছেলেদের সম্বন্ধে দুটি গল্প বল্লেন। একবার একটি ছেলেকে জল বানান করতে বলাতে সে অনেক ভেবেচিন্তে ভয়ে এক গা ঘেমে শেষে বলল 'ফ্‌' আর 'স'। আর একটি ছেলের হাতে পাঁচটা সন্দেশ দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এর থেকে যদি কেউ একটা খায়, তবে আর কটা থাকবে? সে প্রশ্ন শুনে কেঁদে আকুল হয়ে বলল, "আমি একটাও দেব না।"

প্রথম গল্পটি অবশ্য সম্পূর্ণ আজগুবী নয়। সেকালে গুরুমশাইদের ছাত্রশাসন যে কি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করত, তার কথা সকলেই জানেন। কিন্তু কখনও কখনও বুনো ওলরূপী গুরুমশাইদের বাঘা তেঁতুলরূপী ছাত্রও জুটত। আবার কখনও কখনও শিশুর সরলতার জন্য দ্বিতীয় গল্পের মত ব্যাপারও যে একেবারে ঘটত না, এমন নয়।

মানুষের শিশুদের সম্বন্ধে লেখকের এই উক্তি আমাদের Alice in Wonderlandএর সেই অংশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে (স্বপ্নের মধ্যে) ভূগর্ভে বসে এ্যালিস্ একের পর এক আশ্চর্য্য ঘটনায় বিহ্বল হয়ে গিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছে যে সে সত্যি এ্যালিস্ কিনা। তার পরিচিত মেবেল নামে একটি বালিকা ছিল। এ্যালিস্ ভাবছে, "আমি মেবেল নই তো? আচ্ছা, দেখা যাক্, আমি তো অনেক কিছু জানি আর মেবেল আমার থেকে অনেক কম জানে।" তার কি কি মনে আছে, তা দেখবার জন্য অর্থাৎ নিজের বিদ্যে যাচাই করবার জন্য এ্যালিস্ মনে মনে নামতা আওড়াতে আরম্ভ করল, "Let me see : four times five is twelve, and four times six is thirteen, and four times seven is —oh dear ! I shall never get to twenty at this rate".

অবশ্য এ্যালিসের ক্ষেত্রে কোন গুরুমশাই উপস্থিত ছিলেন না। সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে।

আষাঢ়ে স্বপ্নের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হ'ল দুটি উপকাহিনী। একটি জানোয়ারের দেশের 'লেজমোটা' ডাক্তারের কেরামতির গল্পটি, অন্যটি গাইড চতুর্ভুজের শিকার কাহিনী। পাঠশালা থেকে বার হয়ে একটা ছোট নদীর ধারে উপস্থিত হয়ে লেখক দেখলেন যে ঘাটে একখানা নৌকো বাঁধা আছে এবং নদী পার হবার জন্য বিস্তর জানোয়ার জড়ো হয়েছে কিন্তু খেয়ামাঝি কুমীর গরহাজির। আফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে, তবু তার দেখা নেই। তখন খবর পাওয়া গেল যে দাঁতে ব্যথা হওয়াতে কুমীর "লেজমোটা" ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য গিয়েছে। লেজমোটা নামটি এস্থলে লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন,

"পাড়াতে এসেছে এক নাড়ীটেপা ডাক্তার,
দূর হতে দেখা যায় অতি উঁচু নাক তার,
নাম লেখে ওষুধের, এ দেশের পশুদের,
সাধ্য কি বোঝে তাহা এই বড় জাঁক তার।"

আষাঢ়ে স্বপ্নের ডাক্তার কিন্তু স্বয়ং জানোয়ার এবং লেজমোটা বিশেষণটি তাঁর সম্বন্ধে আক্ষরিক অর্থে এবং নিহিতার্থে উভয় অর্থেই প্রযোজ্য। গূঢ় অর্থেই বা তাঁর লেজ মোটা হবে না কেন? তিনি কি যে সে চিকিৎসক? তাঁর চিকিৎসাবিদ্যার পরিচয় দিতে গিয়ে চতুর্ভুজ লেখককে

বলে, জ্বরজাড়ি বড় একটা এখানে নেই ; লেজছেঁড়া রোগই এখানকার প্রধান রোগ। এমন দিন প্রায় যায় না, যে একজন না একজনের লেজ না ছেঁড়ে। তা ডাক্তারও তেমনি সরেস। তাঁর ওষুধের গুণে বোঁচা লেজ গজিয়ে উঠতে বোধহয় এক মুহূর্ত্তও সময় লাগে না! আবার যদি তিনি সেই ছেঁড়া লেজটুকুর কাটামুখে এক ফোঁটা ওষুধ দেন, অমনি দেখতে দেখতে তা থেকে একটা আস্ত নতুন জানোয়ার গজিয়ে ওঠে।" চতুর্ভুজ এরপর একটি বিশেষ ঘটনার কথা ও বলে। কদিন আগে এক শেয়ালের লেজ ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেই ছেঁড়া লেজ মুখে করে সে ডাক্তারের কাছে যায়। একফোঁটা ডাক্তারী ওষুধ পড়বা মাত্র একটা নতুন লেজও বার হ'ল আর ছেঁড়া লেজ থেকে আর একটা শেয়ালও গজিয়ে উঠল। তারপর দুই শেয়ালে গল্প করতে করতে বাড়ী গেল। দ্বিতীয় অর্থাৎ শিকারের কাহিনীটিও সমান কৌতুককর। চতুর্ভুজ বলছে,

"আমার নিজের একটা গল্প বলি, শোন ; একবার শিকারে বার হয়ে আমি একটা রাঙ্গা হরিণ দেখতে পাই। তার সর্ব্বাঙ্গ ঠিক যেন মখমলে ঢাকা! এমন সুন্দর হরিণ দেখলে চামড়াখানির ওপর কার না লোভ জন্মে ? কি উপায়ে ওটা আস্ত পাওয়া যায়, তাই ভাবতে লাগলাম। যদি গুলি করে হরিণটি মারি, তাহলে তো চামড়ার দফারফা! শেষে অনেক ভেবেচিন্তে এক উপায় ঠিক করলাম। হরিণ খুব মোটা একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি পকেট থেকে একটা পেরেক বার করে বন্দুকে পুরে, তার লেজে গুলি করলাম। আমার লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ! পেরেক ঠিক হরিণের লেজ ফুঁড়ে গাছে বিঁধে গেল! অনেক টানাটানিতেও সে পালাতে পারল না। তখন আমি একখানা ধারাল ছুরি দিয়ে তার নাকের মাঝামাঝি খানিকটা চিরে দিলাম, আর একগাছা বেত নিয়ে খুব জোরে তাকে মারতে লাগলাম। মারের চোটে ছটফট করতে করতে বেচারা হরিণ সেই চেরানাকের ফাঁক দিয়ে বার হয়ে পালিয়ে গেল! আস্ত চামড়াখানা নিয়ে আমি বাড়ী ফিরলাম।"

উভয় কাহিনীই যে সম্পূর্ণ আজগুবী তা বলে দিতে হয় না। এ কাহিনী দুটি Rudolph Erich Rapse রচিত The Adventures of Baron Munchhausenএর গল্প আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সে গল্পের নায়কের

জীবনে আজগুবী, অসম্ভব ব্যাপারের পর ব্যাপার ঘটে চলে। যুদ্ধের পর ঘোড়াকে জল খাওয়াতে গিয়ে ব্যারন্ ম্যানচুসন্ আশ্চর্য্য হয়ে দেখেন যে ঘোড়া জল খেয়েই যাচ্ছে। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন যে শত্রুপুরীর মধ্যে দিয়ে যাবার সময় লোহার দরজা গায় পড়ে ঘোড়ার শরীরের অর্দ্ধেক কেটে বেরিয়ে গেছে। সামনের অর্দ্ধেক চড়ে তিনি চলে এসেছেন এবং সেইজন্য ঘোড়া যতই জল খাচ্ছে, পেছনের কাটা অংশ দিয়ে ততই জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এর পর ঘোড়ার দুটি অংশ একত্র করে শেকড়বাকড় দিয়ে জুড়ে দেবার ফলে ঘোড়ার পিঠে দিব্যি একটি ছোট গাছ গজাল। তার ছায়ায় বসে ব্যারন্ অনায়াসে যুদ্ধ করতে লাগলেন। আর একবার ঘোড়ায় চড়ে নদী পার হতে গিয়ে ব্যারন্ দেখলেন যে ঘোড়া তাঁর ভার বইতে পারছে না। ঘোড়া এবং সওয়ার উভয়েই ডুবে যাচ্ছে। তখন তিনি নিজের চুল মুঠো করে ধরে নিজেকে ঘোড়ার পিঠ থেকে তুলে ধরলেন। ঘোড়া হাল্কা হয়ে নদী পার হ'ল এবং অপর পারে গিয়ে ব্যারন্ ঘোড়ায় চড়লেন। বইখানিতে এ রকম বহু কাহিনীই আছে। এ বইখানি জার্ম্মাণ লেখকের লেখা হলেও ১৭৮৫ সনে ইংরেজী ভাষায় লণ্ডনে প্রথম প্রকাশিত হয়। সারভেন্টিস্ রচিত ডন্ কুইক্সোটের মতনই এ বইখানিও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। এবং পরবর্ত্তী বহু সাহিত্যিককে প্রেরণা জোগায়। বাংলাসাহিত্যের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত "কঙ্কাবতী"র উপর এ বইখানির প্রভাব লক্ষণীয়।

যোগীন্দ্রনাথও ব্যারন্ ম্যানচুসনের কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সন্দেহ নাই কিন্তু আষাঢ়ে স্বপ্নে তাঁর নিজস্ব রচনাকৌশল এবং ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। চতুর্ভুজের সঙ্গে রাজবাড়ীতে ফিরে এসে লেখক দেখলেন "সেখানে লোকে লোকারণ্য অর্থাৎ জানোয়ারে জানোয়ারারণ্য।" শুনলেন যে সেদিন রাজার ছেলের বিয়ে। এই উপলক্ষ্যে তাঁরা নানা রকম মজা দেখলেন। প্রথমে দুটি ভালুক—একটি ধাড়ি ও একটি ছানা—পরস্পরের হাত ধরে নাচল। এ ভালুকওয়ালার দড়িতে বাঁধা ভালুক নয়। দিব্যি স্যুটবুট পরা পাইপ মুখে ভালুকের নাচ। তারপর সিংহ ও ভালুকের ক্রিকেট ম্যাচ্ হ'ল। এই ম্যাচের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তা বালকদের নিকট নিশ্চয়ই অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে বোধ হবে। খেলার শেষে টাগ-অব-ওয়ার

ও তারপর জানোয়ারের জাতীয় সঙ্গীত হ'ল। তার প্রথম চারটি পংক্তি,

"সামনে এসে দাঁড়ায় হেন
শক্তি আছে কার?
একেবারে ঘারটি ভেঙ্গে
রক্ত শুষি তার!"

শুনে লেখকের মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। তারপরের চার পংক্তি হ'ল,

"ছোট বড় পার ক'রেছি—
হাজার হাজার;
জোর যার মুল্লুক তার
এই নীতি সার!"

এমন ভয়ঙ্কর গান শুনে লেখকের ভয় বেড়েই চলল। শেষ পর্যন্ত,

"কাকেও না ডরি মোরা
মানুষ ত ছার,
সারা জগৎ কেঁপে ওঠে
ছাড়িলে হুঙ্কার।

এই চার পংক্তি শুনে লেখক চতুর্ভুজের সঙ্গে স্থানত্যাগ করলেন। এই ভয়ঙ্কর জাতীয় সঙ্গীতটি এবং তা শুনে লেখকের ভয় আমাদের Alice in wonderlandএর কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়। এ্যালিস্ আজবদেশে উপস্থিত হয়েও নিজের বেরাল ডায়ানার কথা ভুলতে পারছে না এবং কখনও তার কথা বলে, কখনও কুকুরের কথা বলে তার সদ্যপরিচিত বন্ধু mouse বা ইঁদুর ভায়াকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। ইঁদুর যে ভয় পাবে তা না বুঝে এ্যালিস্ সরল মনেই তার বেরালের কথা বলছিল। চতুর্ভুজও সরল মনেই গল্পের নায়ককে এই জাতীয় সঙ্গীতটি শুনতে নিয়ে গিয়েছিল।

জানোয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিলিপুটের দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গালিভারের উপর সন্তুষ্ট হয়ে লিলিপুট সম্রাট একদিন তাকে সেই দেশে প্রচলিত নানারকম আমোদ প্রমোদ দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। সেই উৎসবক্ষেত্রেও রকমারী নাচের পর পুতুলের আকারের সেই মানুষেরা

অর্থাৎ তাদের সৈন্যেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে দু ফিট উঁচু কয়েকটি লাঠির মাথায় বাঁধা গালিভারের রুমালের উপর নকল যুদ্ধের খেলা দেখাল। মনে হয়, এই নকল যুদ্ধই আষাঢ়ে স্বপ্নের ক্রিকেট খেলায় পরিণত হয়েছে।

গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্তের সঙ্গে আষাঢ়ে স্বপ্নের সাদৃশ্য অতি অল্প। তদানীন্তন রাজনীতিকে কটাক্ষ করে তিক্তচিত্তে সুইফ্‌ট বইখানি লেখেন। কিন্তু স্যাটায়ারের মাধ্যম হিসাবে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাল্পনিক প্রাণীদের গল্প বল্লেন সুইফ্‌ট, তাদের পুতুল মনে করে ছোটরা বইখানির মধ্যে রস পেতে আরম্ভ করল এবং বইখানি তাদের জন্যই লেখা বলে মনে করল। রোম্যান্সকে ব্যঙ্গ করে রচিত ডন্ কুইকসোটেরও এই দশা হয়েছিল। আষাঢ়ে স্বপ্নের বেলা এমন ব্যাপার ঘটে নি। যাদের জন্য পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে, সেটি তাদের হাতেই রয়ে গেছে।

যে যে ইংরেজী বইয়ের নাম উল্লেখ করেছি, যথা ক্যারলের Alice in Wonderland, কিপ্‌লিংএর The Jungle Book, এরিক্ র‍্যাপ্‌সের The Adventures of Baron Munchhausen, এমন কি, সুইফ্‌টের Gulliver's Travels, এ সব কটিরই ছায়া আছে আষাঢ়ে স্বপ্নে কিন্তু সে ছায়া শরতের মেঘের মতই অপসৃয়মান। সব মিলিয়ে যে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে, সেটি যোগীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভঙ্গীতে রচনা। যোগীন্দ্রনাথের রচনার বহু পরে রচিত আর একটি বইয়ের কথাও এক্ষেত্রে মনে পড়ে। সেটি George Orwell রচিত The Animal Farm, সেখানেও জন্তু-জানোয়াররা সম্পূর্ণ মানবোচিত আচরণ করছে দেখা যায় কিন্তু Animal Farmও স্যাটায়ার। মার্কস্‌বাদ এবং শ্রমিক বিপ্লবকে ব্যঙ্গ করে ওটি রচিত হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথের রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বালকবালিকাদের আনন্দদান। অবশ্য রচনাটির মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ একেবারে নাই, এমন কথা বলা যায় না।

ডাক্তারের কাহিনীটি আজগুবী হলেও ওর মধ্যে শল্যচিকিৎসা শাস্ত্রকে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ করা হয়েছে বলেই মনে হয়। How to be a Doctor প্রবন্ধে বিখ্যাত হাস্যরসিক Stephen Butter Leacock ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে, আজকালকার ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসার জন্য গেলেই. তাঁরা ছুরি দিয়ে

রোগীর কানের একাংশ কেটে নিয়ে পরীক্ষার জন্য একটা শিশিতে পুরে লেবেল লাগিয়ে রাখেন আর কাঁচি হাতে নিয়ে রোগীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে করতে ভাবেন, শরীরের অন্য কোন্ অংশ কাটা যায়। অবশ্য প্রবন্ধটি সম্পূর্ণই হাস্যরসাত্মক। তবে হাসির সঙ্গে শ্লেষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সহজ রোগকেও জটিল করে তোলে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান। আষাঢ়ে স্বপ্নের লেজমোটা ডাক্তারও অতি দাম্ভিক আধুনিক শল্যচিকিৎসক বা Surgeonদের প্রতীক বলে মনে হতে পারে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে যোগীন্দ্রনাথ যখন লিখেছেন, তখনও Surgery অর্থাৎ শল্যচিকিৎসার এত উন্নতি হয়নি এবং কবিরাজ মশাইয়ের বিধান নিয়ে তুলসীপাতার রসের অনুপান দিয়ে স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ আর চ্যবনপ্রাশ খেতে অভ্যস্ত দেশবাসী তখনও এ্যালোপ্যাথী চিকিৎসা ব্যাপারটাকেই বক্রকটাক্ষে দেখত।

তারপর যে বুলডগ পুলিশ সার্জেন্ট দেশে কোনও নতুন লোক এলেই খোঁজখবর রাখেন, তাঁর অস্তিত্বও মানুষের দেশের security policeএর সম্বন্ধে কটাক্ষ বলে মনে হতে পারে।

মেলার মধ্যে যখন হাতীর পিঠে চড়ে সিংহরাজ এলেন, একটা বানর তার মাথায় ছাতা ধরে ছিল। তখন চতুর্ভুজ যে উক্তি করে, তা লক্ষণীয়। সে বলল, "রাজার মাথায় কে ছাতা ধরে রয়েছে জান? ও আমার জ্ঞাতিভাই! দেখলে আমাদের কত সম্মান?"

চতুর্ভুজের এই অহঙ্কার আমাদের সেই গল্প স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন লোক খুব গর্ব্ব করে বলছে,

"বড় সাহেবের মাঝি,
তার যে ধরে কাছি,
তার বাড়ীর কাছে আছি।"

বিদেশী সরকারের, অথবা তদানীন্তন ধনী জমিদারের প্রসাদপুষ্ট ব্যক্তি, এমন কি তাদের "জ্ঞাতিভাই" অর্থাৎ দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের মিথ্যা দম্ভের প্রতি লেখক এস্থলে ইঙ্গিত করেছেন।

সবশেষে জানোয়ারের জাতীয় সঙ্গীত। ভারতের স্বাধীনতা তখন স্বপ্নমাত্র। জাতীয় সঙ্গীত বলতে গ্রেটব্রিটেনের জাতীয় সঙ্গীত, "God save the king"ই মনে পড়ে। কিন্তু শুধু ঐ জাতীয় সঙ্গীতই নয়,

লেখকের হয়তো আর একটি সঙ্গীতের কথা মনে হয়েছিল—সেটি উপনিবেশ স্থাপনকারী ব্রিটিশদের দম্ভসঙ্গীত,

"Britannia rules the wave,
Britain never shall be slave"

জানোয়ারেরা প্রায় ঐ সুরেই গাইছে,

"কাকেও না ডরি মোরা
মানুষ ত ছার ;
সারা জগৎ কেঁপে উঠে
ছাড়িলে হুঙ্কার !"

আষাঢ়ে স্বপ্নে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন থাকলেও রচনাটি হাল্কা জাতীয়। তরুণ বয়স্কদের মনোরঞ্জনের জন্যই এর রচনা। তাই উপসংহারে লেখক বলেছেন, "সকালে উঠিয়া রাত্রের স্বপ্নের কথা যাহাকে বলি, সেই হাসিয়া মরে !"

আষাঢ়ে স্বপ্নের দ্বিতীয় স্বপ্ন একটি দীর্ঘ কবিতা। এটি আগাগোড়াই সূক্ষ্ম ব্যঙ্গে ভরা। যোগীন্দ্রনাথ রচিত আজগুবী গল্পের কথা বললে আরও তিনটি গল্পের কথা মনে পড়ে—কুমীরের বাপের শ্রাদ্ধ, ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ ও গ্রামধন।

"কুমীরের বাপের শ্রাদ্ধ" খেলার সাথী বইটির অন্তর্গত। গল্পের নাম প্রচলিত বাংলা idiom ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের করা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কুমীরের বাপের শ্রাদ্ধ। তাই ছবিতে দিখি, সামিয়ানার নীচে একধারে সারি সারি ব্যাঙ, ইঁদুর, বেরাল, শেয়াল, চিতা, সিংহ সব বসে আছে। আর সামিয়ানার সামনে বসে বানর পুরোহিত কুমীরকে মন্ত্র পড়াচ্ছেন। লেজের আসনেই উপবিষ্ট। গল্পে দেখি, শ্রাদ্ধ শেষ হতে বেলা দুপুর হয়ে যাবার পরও খাবার কোনও আয়োজন না দেখে পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ইঁদুর ব্যাঙকে খেল, বিড়াল খেল ইঁদুরকে, শিয়াল খেল বিড়ালকে, চিতাবাঘ শিয়ালটাকে খেল, চিতার পালা এলে সে গেল বাঘের পেটে, বাঘ হলেন পশুরাজ সিংহের খাদ্য। আর অবশিষ্ট পশুটিকে অর্থাৎ সিংহকে খেয়ে কুমীর মহা আরামে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে, পেটে হাত বুলোতে বুলোতে গুড়গুড়ি টানতে লাগল। অতি ভোজনের ফলে চিৎ হয়ে অর্দ্ধশায়িত

সিংহের একটি এবং সিংহকেও উদরসাৎ করে তাকিয়া ঠেস দেওয়া গুড়গুড়ির নল মুখে করা ধুতি পরা কুমীরের একটি মজার ছবি পাই। কিন্তু এই সারাংশ থেকে লেখকের মজলিশি ভাষার আভাস পাওয়া সম্ভব নয়।

ইঁদুর যখন ব্যাঙকে গিলল,

"ব্যাপার দেখে বিড়াল তো চটে লাল। ফলার খেতে এসে এরকম অভদ্রতা! রাগে পুষি এমন ক্ষেপে উঠল যে টুঁটি ছিঁড়ে ইঁদুরকে ভদ্রতা না শিখিয়ে কিছুতেই ছাড়লে না।"

শিয়াল বেড়ালকে খাবার পর,

"এইবার চিতাবাঘের পালা। সে ভাবলে 'আমি ভদ্রতাও জানিনে, দাবী দাওয়াও বুঝিনে, আমি শুধু ধরবো আর টুঁটি ছিঁড়বো।" এই ভেবে শেয়ালকে ঝাপটে ধরে সে যা করলে তা বোধ হয় না বল্লেও চলে।"

শেষ পর্য্যন্ত,

"ব্যাপার দেখে কুমীর মহাখুসী! এই তো আসল ফলার; একেবারে হেউ-ঢেউ কাণ্ড! আয়োজন এমন প্রচুর যে, কারো একটি কথা বলবার যো-টি নেই।

"কুমীর ভাবলে ভোজের ব্যাপার চুকেছে, এখন আমি নিজের যোগাড় দেখি। এই ভেবে পশুরাজকে সাপটে ধরে সে আপনার প্রকাণ্ড মুখের মধ্যে ফেলে দিলে। রাজা অনেক আপত্তি করলেন বটে কিন্তু সবই মিছে। খিদেয় কুমীরের পেট চুপসে এতক্ষণ আমসি হয়েছিল, এখন সেটি ফুলে একেবারে ঢাকাই জালা!"

এ ভাষা একেবারে মজলিশি ভাষা—মজলিশ মানে বড়দের ক্লাব বা কোন সভা বা আড্ডা নয়। এ সেই মজলিস যেখানে চারিদিকে কচি কচি উৎসুক মুখ ও অবাক চোখের চাহনি এবং মাঝখানে একটি মাত্র দাদামশায় স্থানীয় বক্তা। তাঁর অনবদ্য ভঙ্গীতে যে বিশ্রম্ভালাপের সুরে তিনি গল্প বলেন, এ সেই সুর, সেই ভাষা।

গল্পটি আজগুবী, তা বলে দিতে হয় না। সবশেষে অতগুলি প্রাণীর জায়গা কুমীরের পেটে কি করে হ'ল, এ প্রশ্ন যে বিজ্ঞ, বয়স্ক বিচক্ষণ ব্যক্তিটির মনে আসবে, তাঁকে ফিতে হাতে করে কুমীরের পেটে ঢুকে মাপ নিয়ে আসতে বলব। আর একটু স্পষ্ট করে বলতে হ'লে তাঁকে

বলব, "আপনি মশাই বসে বসে শেয়ার মার্কেটের হিসেব করুন। এ রূপকথার রাজ্য, যেখানে বলা যায়,

"কৈ গেছিলা? শিশুর পাড়া,
কি দেখিলা? কি শুনিলা?
এখানে আপনার প্রবেশ নিষেধ।"

চেষ্টা করলে অবশ্য এ গল্পের মধ্যেও নীতিকথার সন্ধান পাওয়া যায়। যথা:—অত্যাচারীর পরিণতি কখনও ভাল হয় না। আবার কুমীরের আচরণ থেকে সেই রাজনীতি বা কূটনীতি স্মরণ হ'তে পারে যেখানে শত্রুকে আমন্ত্রণ করে নিজের এলাকায় এনে কেউ হত্যা বা বন্দী করেন কিন্তু গল্পটি রচনার সময় অত নীতিকথা (moral) বা কূটনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি লেখকের মনে ছিল কিনা জানি না। তিনি শিশুদের গল্প বলেছেন, যে শিশুরা প্রশ্ন করে না, বিশ্বাস করে আর অবাক হয়ে শোনে। কুমীরের ভোজন পর্ব্ব সমাধা হলে বানর পুরোহিত মশাই মনে মনে ভাবেন, ভাগ্যে তিনি ফলার খেতে আসেন নি। তিনি ডালে ডালে লম্ফ মারতে মারতে মনে মনে বলেন,

"কুমীরের বাড়ীর নেমন্তন্ন সহজ কথা নয়,
বিনা আয়োজনে সবাই পরিতুষ্ট হয়।
যার পেটেতে যত ধরে করলে উদরসাৎ,
ঝড়তি পড়তি খেয়ে কুমীর পেটে বুলায় হাত।"

"ছবি ও গল্প"তে "রামধন" নামে যে বোকা নিরেট লোকটির গল্প পাই, সেটিও কম আজগুবী নয়। তার বুদ্ধির বহর দেখে পাড়ার ছেলেরা তার নামে ছড়া কাটে,

"বুদ্ধিমান রামধন, সাবধানে থেকো,
নাকে মুখে ছিপি এঁটে বুদ্ধি ধরে রেখো।"

রামধনের অদ্ভুত, অদ্ভুত কীর্ত্তির মধ্যে একটি হ'ল যখন সিপাই আধলা পয়সা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে ঘিয়ের হাঁড়ি তার মাথায় চড়িয়ে তাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছে, তখন রামধন মনে মনে ভাবছে,

"আজই আমি আধলা দিয়ে কিনবো জুড়ী গাড়ী;
একেবারে ছুটিয়ে দেবো রাজার সদর বাড়ী।

সাতরাজার ধন মানিক রাজা আমায় ভাবিয়ে,
ঝাঁকজমকে মেয়ের সাথে দেবেন আমার বিয়ে।"

রামধন উৎসাহে নেচে ওঠাতে ঘিয়ের হাঁড়ি মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল ও ক্রুদ্ধ চৌকীদার তাকে বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে চলল।

স্কুল বুক সোসাইটির দ্বারা ১৮৪২ সনে প্রকাশিত তারাচাঁদ দত্ত রচিত মনোরঞ্জনেতিহাসে অনুরূপ একটি গল্প পাই। সে গল্পের নায়কও একটি মুটিয়া। এক সেপাইয়ের ঘৃতের কলসী বহন করবার পুরস্কার হিসেবে চার আনা পয়সার প্রতিশ্রুতি পেয়ে সেও ভাবতে আরম্ভ করে যে সেই চার আনা দিয়ে সে একজোড়া হাঁস কিনবে, হাঁসের অনেক বাচ্চা হলে, সেগুলি বিক্রী করে সেই অর্থে একজোড়া ছাগল কিনবে, তারপর ছাগলের বাচ্চা বিক্রী করে গাভী কিনবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ধন সঞ্চয় হলে সে এক সুন্দরী কন্যা বিবাহ করবে এবং তারপর সে আর কোন কাজ করবে না। পরে অন্তঃপুর থেকে তার পুত্র এসে ভোজনের জন্য তাকে আহ্বান করলে, সে মাথা নেড়ে বলবে, "এখন ভোজন করিব না।" কেমন করে মাথা নাড়বে, ভাবতে ভাবতে মুটিয়াটি সত্য সত্য মাথা নাড়ে এবং তার ফলে ঘৃতের কলস মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যায়। সিপাহী তখন তাকে বেত্রাঘাত করল।

শ্রীমতী আশা গঙ্গোপাধ্যায় এই গল্পটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন,

"উদ্ধৃত গল্পটি নানারূপে 'পঞ্চ-তন্ত্র' হইতে আরম্ভ করিয়া আরব্যোপন্যাস পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এক্ষেত্রে ইহাই বিশেষ লক্ষণীয় যে 'মনোরঞ্জনেতিহাস'কার কাহাকেও অবলম্বন না করিয়া সর্ব্বজন পরিচিত কাহিনীকে সম্পূর্ণ নূতনরূপে রচনা করিয়াছেন এবং ঘৃতবাহক শ্রমিকটির দিবাস্বপ্ন প্রদর্শনের বর্ণনায় তাঁহার মৌলিকতা এবং কল্পনা কুশলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।" (বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ—পৃঃ ৩২)

এই মৌলিকতা যোগীন্দ্রনাথের রচনায় আরও অধিক পরিস্ফুট। রামধনের দিবাস্বপ্ন ইংরেজী ছড়ার Johnny, Head in Airকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। তবু রামধনের স্বপ্নের বিশেষত্ব আছে। যোগীন্দ্রনাথ-সঙ্কলিত "খুকুমণির ছড়া"র প্রথম সংস্করণে ১৩০৬ সনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন, "এই পুস্তকের সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যাও আড়াইশতেরও

কম। পাঠককে অনুরোধ করি, তন্মধ্যে কয়টির মধ্যে 'বৌ' নামক অবগুণ্ঠনান্তরালস্থিত ক্ষুদ্র পদার্থের প্রসঙ্গ আছে, একবার গণিয়া দেখিবেন।"

রবীন্দ্রনাথও সকৌতুকে নিজের শৈশবস্মৃতি থেকে একটি গল্প স্মরণ করেছেন। কৈলাস মুখুজ্জে নামে ঠাকুর পরিবারের এক বহুকালের খাজাঞ্চি ছিলেন। লোকটি ছিলেন ভারী রসিক। তিনি রবীন্দ্রনাথের শৈশবে একটা মস্ত ছড়া অতি দ্রুত উচ্চারণে বলে শিশুর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন। সেই ছড়ার প্রধান নায়ক ছিলেন কবি স্বয়ং এবং তার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার আবির্ভাবের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত থাকত। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টির উল্লেখ করে বলেছেন যে, ভবিতব্যতার কোল আলো করে এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি বিরাজ করছিল, ছড়া শুনতে শুনতে তার চিত্রটিতে তাঁর মন ভারি উৎসুক হয়ে উঠত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শৈশবে যার মোহিনীমায়ায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সেই 'বধূ' নামক কাল্পনিক প্রাণীটিকে অবহেলা করে কার সাধ্য?

সুতরাং বোকা রামধনের দিবাস্বপ্নে রাজকুমারী বধূর কল্পনা একেবারে আকস্মিক নয়। বাংলা দেশের হৃদয় থেকে ধ্বনিত হচ্ছে ঐ নাম। বেচারা বোকা রামধন তারই স্বপ্ন দেখতে দেখতে একটা লম্ফ দেবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? যোগীন্দ্রনাথের গল্পের রামধন কিন্তু ঐ একটি মাত্র হাস্যকর কাজ করে না। ঘিয়ের হাঁড়ি ভাঙ্গার অপরাধেই সিপাই তাকে বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে চলল বটে কিন্তু সে আরও অনেক অপরাধ করেছে। ইতিপূর্ব্বে নিমু মোড়লের ছোট মেয়ে তাকে দেখে ছড়া কাটাতে রামধন মেয়েটিকে ধাক্কা মেরে কুয়োয় ফেলে দিয়েছে, যার ফলে সে মেয়ে ডুবে মারা গেছে। পরে সিপাই যখন কোমড়ে দড়ি বেঁধে তাকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন সে একটি বরযাত্রীদলকে দেখল। বর বিয়ে করে ফিরছে। বরের ছোট হাতী নগরের সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে গেছে। কনের হাতী উঁচু হওয়াতে কনে ঢুকতে পারছে না দেখে রামধন কনের মুণ্ড কেটে তার নগর প্রবেশ সহজ করে দিয়ে বলল, "এই সামান্য ফিকিরটাও তোমাদের মাথায় যোগাল না—আশ্চর্য্য! এখন দেখ দেখি হাতী পার হয় কিনা!" বর রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে রামধনের নামে রাজার কাছে নালিশ করবার জন্য সিপাহীর সঙ্গে চলল।

এরপর এক বুড়ী (যে রামধনকে চিনত আর তার বুদ্ধির বহর জানত) তাকে জিজ্ঞাসা করল, "বল ত বাপ্ রামধন, রাবণের কথা কি জান? কিরূপে তার মুণ্ডপাত হ'ল! আর কেমন করেই বা লঙ্কা পুড়ল?" তার এই বিপদের সময় বুড়ীকে তামাসা করতে দেখে ক্রুদ্ধ রামধন কুড়ালের এক কোপে বুড়োর মুণ্ড কেটে বলল, "এমনি করে রাবণের মুণ্ডপাত হয়েছিল।" আর এক আঁটি খড় জ্বালিয়ে কুঁড়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে বলল, "ঠিক এই রকমে লঙ্কা পুড়েছিল।" বুড়ীও এবার হায় হায় করতে করতে সিপাই এবং নববধূহারা বরের সঙ্গে রাজামশাইয়ের কাছে রামধনের নামে নালিশ করতে চলল।

গল্পে দেখা যাচ্ছে যে, রামধন তিনটে খুন করেছে, একটা ঘর পুড়িয়েছে অর্থাৎ সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে সে একটি 'ক্রিমিন্যাল' এবং তার ফাঁসি হওয়াই উচিত। অথচ সব কথা শুনে রাজামশাই তাকে ছেড়েই দিলেন। এমন কি রাজবাড়ীর মশা তার গালে বসাতে রামধন নিজের গালে চড় মেরেও যখন মশা মারতে পারল না, মশার নামেই সে রাজামশাইয়ের কাছে নালিশ করে বসল। তার বুদ্ধির বহর দেখে রাজামশাই তাকে অনুমতি দিলেন যে যখনই সে মশা দেখবে, তখনই সে তা মারতে পারবে। এরপর রাজামশাইয়ের নাকের উপর মশা বসেছে দেখে রাজার নাকে বিরাশী শিক্কা ওজনের এক কীল মেরে রামধন রাজাকে অজ্ঞান করে দিল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তার এ অপরাধও রাজা ক্ষমা করলেন।

ছবি ও গল্পের "ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভও" আর একটি আজগুবী গল্প। গোবরা নামে একটি ভিখারী এক ছদ্মবেশী দেবদূতের সঙ্গে দেশদেশান্তরে ভিক্ষে করতে ঘুরে বেড়িয়ে যে সব অদ্ভুত, অদ্ভুত কীর্ত্তি করে, এ তারই কাহিনী। গোবরা অত্যন্ত লোভী, ও অতি মিথ্যাবাদী। ছদ্মবেশী দেবদূত শেষ পর্য্যন্ত রাগ করে তাকে ত্যাগ করে চলে যান। তবে যাবার সময় এতদিন একসঙ্গে থাকার চিহ্নস্বরূপ একটি ঝুলি গো'বরাকে দিয়ে যান। সেই ঝুলির গুণ বর্ণনা করে দেবদূত বলেন, "তোমার যখন যা পেতে ইচ্ছে হবে, তার নাম ক'রে—আমার এই ঝুলির ভিতর আয় —এই কথা বলবামাত্র সেই জিনিষ তখনই তোমার ঝুলির মধ্যে আসবে।"

এরপর গোবরা একবার বিপদগ্রস্ত হয়ে ঝুলির মধ্যে অনেকগুলি ভূতকে বন্দী করে। গল্পের শেষে দেখি, পরলোকে যাবার ইচ্ছায় গোবরা একটা সোজা রাস্তা ধরে নরকে গিয়ে হাজির হ'ল। তার ঝুলির ভেতর থেকে পালান একটা ভূত সেখানে পাহারা দিচ্ছিল। গোবরাকে দেখবামাত্র ভয় পেয়ে সে নিজেদের রাজার কাছে তার নামে নালিশ করে দিল। ফলে গোবরার নরকে ঢোকবার আর কোনও উপায়ই রইল না। তখন সে অনেক কষ্ট করে বহু পথ অতিক্রম করে স্বর্গের দরজায় এসে উপস্থিত হ'ল এবং পূর্ব্বপরিচিত দেবদূতকে পাহারা দিতে দেখল। এরপর যা ঘটল তা লেখকের ভাষাতেই বলি,

"সে (গোবরা) হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কি হে ভাই, তুমি এখানকার মালিক? তবে ত ভালই! একবার দরজাটা খুলে দেও। আমি স্বর্গে যাই।'

দূত বলিলেন, 'আরে-ভাই ত! এতদিন তুমি কোথা ছিলে? ভাল আছ ত? তা কষ্ট করে এলে বটে, কিন্তু ভাই, দরজা খোলবার ত হুকুম নেই। যারা যারা এখানে আসবে, আমার কাছে তাদের নামের একটা তালিকা আছে। কই, তার মধ্যে তোমার নাম ত দেখছি না।" দেবদূতের কথা শুনে গোবরা এক মৎলব আঁটল। পাঠক বুঝতেই পারছেন যে দেবদূত অতি নিরীহ প্রাণী এবং নিরীহেরা তো চিরকালালই বোকা হয়ে থাকে। চতুর চূড়ামণি গোবর্দ্ধনের সঙ্গে তিনি পারবেন কেন? সে দেবদূতের কথা শুনে বলল,

"সে কি! তবে আমি যাই কোথা। স্বর্গেও স্থান নেই, নরকের দরজাও বন্ধ! আমার কি তবে কোথাও একটুও জায়গা হবে না? তোমার এই ঝুলিটাই তো যত নষ্টের মূল! এইটে দেখতে পেয়েই নরকের দরোয়ান আমায় ঢুকতে দিল না। তা তুমি যদি আমাকে স্বর্গেও ঢুকতে না দেও, তোমার ঝুলিটা তবে ফিরিয়ে নেও। আমি আবার নরকে গিয়ে চেষ্টা করে দেখি, কোন সুবিধে করতে পারি কি না!

'তা বরং দেও'—এই বলিয়া দেবদূত হাত বাড়াইয়া যেই ঝুলি লইয়া ভিতরে রাখিয়াছেন, অমনি গোবরার মহা সুযোগ উপস্থিত! সে মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমার ইচ্ছে এখনি ঐ ঝুলির মধ্যে যাই।'

মুখের কথা শেষ না হইতেই গোবরা সেই ঝুলির ভিতর গিয়া উপস্থিত! তাহাকে ফাঁকি দিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দেবদূত হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

গল্প দুটি আজগুবী তাতে সন্দেহ নাই কিন্তু তার সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন আছে। "রামধন" এবং "ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ" দুটি গল্পের মধ্যেই নীতি-বিদ্‌দের মনে শিহরণ জাগাবার মত অনেক উপকরণই আছে। প্রশ্ন এই যে এ ধরনের গল্প শিশুদের বা বালকবালিকাদের হাতে তুলে দিলে তাদের নৈতিক চরিত্রের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়বার সম্ভাবনা নাই কি? আজকের দিনের অভিভাবক যদি বা এ প্রশ্ন না করেন, যোগীন্দ্রনাথ যখন রচনা করেন, সেই পঞ্চাশ, ষাট বৎসর পূর্ব্বে যে বহু জ্ঞানীগুণীর মনেও এ ধরণের প্রশ্ন জাগবার সম্ভাবনা ছিল, তাতে সন্দেহ নাই। প্রসঙ্গতঃ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম করা যেতে পারে। তিনি স্বরচিত "শিশুশিক্ষা"র ভূমিকায় স্বয়ং লিখেছেন যে হংসীর স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব ইত্যাদি কাল্পনিক কাহিনী পাঠে শিশুর মানসিক ক্ষতি হতে পারে, এই তাঁর ধারণা।

গল্পগুচ্ছে "ভাইফোঁটা" গল্পের নায়কের পিতার যে চিত্র রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত করেছেন, তাও এস্থলে স্মরণযোগ্য। নায়ক সত্যধন তার পিতৃ পরিচয় দিতে গিয়ে বলছে,

"আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিওর ছাত্র। মদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন অদ্ভুত নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত ভায়ার গল্প বলিয়াছিলেন শুনিয়া পরদিন হইতে সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার ঘরে শুইতাম। সেখানে দেওয়াল জুড়িয়া ম্যাপগুলা সত্য কথা বলিত, তেপান্তর মাঠের খবর দিত না, এবং সাত সমুদ্র তের নদীর গল্পটাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলাইয়া রাখিত।

শিশুদের নিকট কাল্পনিক গল্প বলতেই যাঁদের আপত্তি, অসৎ লোককে নায়ক করে গল্প বলায় তাঁদের আরও কত বেশী আপত্তি হবার কথা। সেই যুগে যোগীন্দ্রনাথ লিখলেন, মজার গল্পে "ছোট চোর ও বড় চোর"এর মজার কাহিনী, লিখলেন গোবর্দ্ধন বা গোবরা নামক পরম অসাধু, অথচ

চতুর ভিক্ষুকের কাহিনী, যে দেবদূতের পারিশ্রমিক স্বরূপ পাওয়া পাঁঠার মাংস নির্জ্জনে রেঁধে একলা তার হৃৎপিণ্ডটাকে খেয়ে মুখ মুছে বলে—"এ পাঁঠার হৃৎপিণ্ডই ছিল না।"

আজকের যুগের নীতিবিদ্ হয়তো আপত্তি করে বলবেন যে এমন গল্প শিশুকে শোনালে তার নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "ভাইফোঁটা" গল্পের যে নায়ক "সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া মানুষ" তার জীবনের পরিণামে দেখতে পাই যে সে পরস্বাপহারী, ভণ্ড এবং মিথ্যাবাদীতে পরিণত হয়েছে। আর যোগীন্দ্রনাথের রচনা পড়ে যাঁদের শৈশব কেটেছে, তাঁদেরকার উত্তর জীবনে কি ক্ষতি হয়েছে জানি না কিন্তু তাঁদের মধ্যে থেকেই বেরিয়েছেন সেই সব সাহিত্যের দিকপাল যাঁরা "লৌহকপাট"এর অন্তরালে খুনী বা কয়েদীর মধ্যে মনুষ্যত্বের সন্ধান পেলেন, "অভিশপ্ত চম্বল"এর দস্যুদলের মনোবিকলন করলেন আর "নিশিকুটুম্ব" চৌর্য্যবৃত্তি পরায়ণ সাহেবের জীবনকাহিনী লিখলেন। এসব অবশ্য বয়স্কপাঠ্য সাহিত্য কিন্তু শৈশবে ঐ নীতিহীন, সরস গল্পগুলি না পড়লে এঁদের অনেকেরই হয়তো সাহিত্য প্রতিভা স্ফুরিত হ'ত না।

যোগীন্দ্রনাথ অবশ্যই চান নি যে তাঁর রচনা পড়ে শিশুদের ক্ষতি হোক। তিনি চিরদিনই শিশুদরদী ছিলেন এবং তাদের আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন,

"হোক ভাই তোমাদের সুন্দর জীবন।" তবে সত্যের দিকে এবং বাস্তবের দিকে পিছন ফিরে যে নীতিবিদ্ শিশুকে কেবল তত্ত্বকথা শোনাবার পক্ষপাতী, তাদের দলেও তিনি ছিলেন না। ভাল মন্দ, আলো আঁধারে মেশা এই জগতে শিশু যখন বড় হয়ে একাকী পথ চলতে আরম্ভ করবে, সে শুধু দেবদূতের মত নিরীহ জীবের সাক্ষাৎ পাবে না, গোবর্দ্ধন বা গোবরার মত দু একটি প্রাণীর দেখাও পাবে,—একথা যদি বাল্যকাল থেকে বোঝে, তাহলে পরে সে অনেক বিপদ সে এড়াতে পারবে। আর রামধনের মত বোকামী করে সে কখনই,

"বুদ্ধিমান রামধন সাবধানে থেকো,
নাকে মুখে ছিপি এঁটে বুদ্ধি ধরে রেখো"

ইত্যাকার ছড়া শুনতে চাইবে না। রামধন বা গোবর্দ্ধন কারুকেই আদর্শরূপে দেখাতে চান নি—এটুকু বুদ্ধি যে বালক, বা বালিকার নাই, সে এসব গল্প পড়বারই উপযুক্ত নয়।

কিন্তু এহ বাহ্য। যোগীন্দ্রনাথের পূর্ব্বের যুগের শিশুদের "রামগরুড়ের ছানা" করে রাখা হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য করেই সুকুমার রায় লিখেছিলেন,

"রামগরুড়ের ছানা,
হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে
হাসব না, না, না, না।"

যোগীন্দ্রনাথ তাদের হাসতে শেখালেন এবং সেই সঙ্গে তাদের সরল, সুন্দর ভাষাও শিক্ষা দিলেন। ভাষাশিক্ষাটা অবশ্য বালকের অজান্তে হয়ে গেল অর্থাৎ বলা যায়, অভিভাবকের পক্ষে "ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ" হয়ে গেল। তবে একটা কথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে। এসব গল্প পড়ে বালক বালিকার ভাষা শিক্ষার পথ সুগম হওয়াই যে অভিভাবকের খুসীর একমাত্র কারণ তা নয়। রামধন বা গোবর্দ্ধনের গল্প তিনি নিজেও উপভোগ করে মুচকি হাসেন আর মনে মনে ভাবেন, "আহা, ছেলেবেলাটা যদি আবার ফিরে পাওয়া যেত! ঝুলির ভেতর গোবরাকে দেখে দেবদূতের মতই একবার হো হো করে হেসে উঠতাম।"

চতুর্থ অধ্যায়

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচনায় হাস্যরস

হাস্যরসকে রঙ্গ, ব্যঙ্গ, তামাসা, ঠাট্টা, পরিহাস, বিদ্রূপ ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এগুলির প্রত্যেকটির সংজ্ঞা নির্ণয় করা অপ্রাসঙ্গিক হবে। মোটামুটি বলা যেতে পারে যে মজার কথা শুনে মজার দৃশ্য দেখে বা ঠাট্টাতামাসা শুনে আমরা সকলেই হেসে থাকি। সেই হাসির উপর ভিত্তি করে যে সাহিত্য, তার হাসি নির্দ্দোষ এবং কৌতুকপূর্ণ। আর যখন সেই হাসির মধ্যে অন্যকে নীচু করবার বা ধিক্কার দেবার প্রয়াস থাকে, তখন তা বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ। অবশ্য ব্যঙ্গের মধ্যে যে সব সময় অন্যকে হীন প্রতিপন্ন করবার অন্যায় ইচ্ছাই থাকে, তা নয়। অনেক সময় সমালোচনা করে দোষ সংশোধনের উদ্দেশ্যেও ব্যঙ্গ করা হয়ে থাকে। যোগীন্দ্রনাথের রচিত বহু ছড়াই কৌতুকপূর্ণ, আবার কোনও কোনও ছড়াতে একটু ব্যঙ্গেরও আভাস পাওয়া যায়।

"বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস" গ্রন্থে শ্রীঅজিতকুমার দত্ত যোগীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লিখেছেন,

"এঁর ছড়াগুলির মধ্যে কোথাও একটু আধটু ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন নেই, এমন কথা বলা যায় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে "আমরা যেমন বীরশিশু তেমন আর কে, ভয় ভাবনা কারে বলে কিছুই জানিনে" বলে যে ছেলেরা গর্ব্ব করেছিল, শেষ পর্য্যন্ত সারসের হাঁ দেখে তাদের ভয় পাওয়া, অথবা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত সৈন্যদলের প্যাঁক প্যাঁক শুনে পালানো যথেষ্ট কৌতুককর হলেও একেবারে ব্যঙ্গ বর্জ্জিত নয়।"

এটিকে যদি ব্যঙ্গ-কবিতা বলা যায়, তাহলে যোগীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি কবিতার মধ্যে ব্যঙ্গের আভাস পাই। তার মধ্যে একটি হ'ল "হিজিবিজি"র বর্ণের ছড়া :—

"এ ঐ এল চোর ধরতে, এইসা লাঠি ঘাড়ে,
'ঐ যে রে চোর' যেই শুনেছে লুকায় পুকুর পাড়ে।"

ছড়া ও পড়ার "পালোয়ান" কবিতাটিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পালোয়ানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ—

"ফটিকচাঁদ বাবু
শীতে খান সাবু
গরমেতে ঘোল ;
বছর ভ'রে রোজ দু'বেলা
গাঁদালের ঝোল।"

এই পালোয়ানের "ঘুঁসির চোটে ঠিকরে ওঠে ছারপোকার রক্ত"।

মনে পড়ছে পরশুরামের "কচি-সংসদ"এর পেলব রায়কে। পরশুরাম বলেছেন, বি, এ পাশ করিয়া ছোকরার কচি এবং মোলায়েম হইবার বাসনা হইল। সে গোঁফ কামাইল, চুল বাড়াইল এবং লেডি টাইপিষ্টের খোপার মত মাথার দু পাশ ফাঁপাইয়া দিল।"

রবীন্দ্রনাথের কেশ চর্চ্চার অনুকরণ করলেই কবি হওয়া যাবে, এই ভ্রান্ত ধারণায় এক সময় বাংলার কিছু যুবক ঐ পেলব রায়ের মত তারুণ্য চর্চ্চায় মেতে উঠেছিল। যোগীন্দ্রনাথের কবিতায় এই শ্রেণীর তরুণদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে বলেই মনে হয়।

আবার হিজিবিজির আজগুবী কবিতা "বিয়ে পাগলা"তে সেকালের সমাজ ব্যবস্থার প্রতি একটু অপ্রত্যক্ষ কটাক্ষ আছে। রামসুন্দর "বিয়ে পাগলা"। সে চীনদেশ থেকে "মনের মত বৌ" কিনে নিয়ে এল কিন্তু বউয়ের মুখ ঘোমটায় ঢাকা। ছবিতে দেখি শাড়ী পরে মাথায় ঘোমটা টেনে এক মূর্ত্তি বসে আছে। এখানে "কিনে"র সঙ্গে মেলাবার জন্যই "চীনে" লেখা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নাই করণ চীনদেশের মেয়েরা কোনকালেই শাড়ী পরত না। ওটি সেকালের বাংলা দেশেরই একটি জড় পুঁটুলী "বউ"। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যে বউয়ের "মুখটি কিন্তু হয়নি দেখা, ঘোমটা দিয়ে ঢাকা," সেই হল রামসুন্দরের "মনের মত" বউ। পরে যা হল, তা শোচনীয়। রামু তাকে "থোবা থোবা গোলাপ, মণির মালা" ইত্যাদি উপহার দিয়েও তার ঘোমটা খোলাতে পারল না। আবার মিষ্ট কথা শুনেও তা:ক অ:বিচলিত দেখা

গেল। তখন অসহিষ্ণু রামসুন্দর সাহসে ভর করে "বৌ"এর ঘোমটা খুলে দিল। তারপর,

"বৌ অমনি চাইলেন তাঁর চাঁদ মুখটি তুলে !"

দেখা গেল চন্দ্রবদনীটি একটি কুকুর। আমাদের দেশের চিরকালীন প্রথা অনুসারে পাত্রপাত্রী পরস্পরকে না দেখেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হত। এটি সেই প্রথাকেই শ্লেষ বলে মনে হয়। অবশ্য বালককে হাসাবার উদ্দেশ্যে বউকে একেবারে কুকুর করে দেওয়া হয়েছে এবং উদ্ভট ব্যাপারের কল্পনা আপন গতিবেগেই অগ্রসর হয়ে চলেছে। তাই শেষ পংক্তির ছবিতে দেখি একদল কুকুর রামসুন্দরকে তাড়া করেছে। এ ছবির আনুষঙ্গিক ছড়া হল :—

"লজ্জা পেয়ে তখন রামু পালায় সে দেশ ছেড়ে,
দেশের যত বৌ ছুটেছে পিছন পিছন তেড়ে !"

বালক অবশ্যই এর মধ্যে প্রচুর হাসির খোরাক পাবে। তবু তদানীন্তন দেশীয় প্রথাটির প্রতি একটি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ যে এর মধ্যে নিহিত আছে, তাতে সন্দেহ নাই।

এই রকমই সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ আছে "রাঙ্গা ছবি"র পাঠশালা"য় :—

"চ্যাপটা নাকে চশমা আঁটা
গুরু মহাশয় ;
কানে কলম হাতে ছড়ি,
দেখেই লাগে ভয় !"

এই ছড়ায় বানর গুরুমশাই এবং কুকুর শিশুদের মাধ্যমে মানুষের সমাজব্যবস্থাকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

এই গুরুমশাইদের মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার ফলেই আজগুবী ছড়ার দাশুর কানটি হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা হয়ে গিয়েছিল। বালক এই কাহিনী পড়ে যতই হাসুক, যোগীন্দ্রনাথ তখনকার সমাজ ব্যবস্থাকে এইভাবেই সমালোচনা করেছেন বলে মনে হয়।

আবার শুধু কৌতুক দেখি তাঁর বহু কবিতাতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বালকের পরিচিত জগতের ছবিটিকে একটু উলটপালট করে দিয়ে এই কৌতুকের সৃষ্টি করা হয়েছে। কোথাও বা বানর বাপের রাগ ভাঙ্গাবার

জন্য বানর-সন্তান তাকে সাধাসাধি করছে ("অনুতপ্ত সন্তান"—হাসিরাশি), কোথাও বা হস্তিনীর উপর ক্রুদ্ধ হস্তীকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে,

"নাই বা গেলে তাহার কাছে,
সারাটা বন পড়ে আছে,—
সাবাড় কর গোড়া থেকে
গাছের অগ্রভাগ" ("হাতী"—নূতন ছবি)

খোকা বা খুকুর হঠাৎ বড় হয়ে যাবার ইচ্ছা নিয়েও অনেক কৌতুক আছে। যথা, "খেলার সাথী"র "চুপ"। খোকবাবু চশমা নাকে এঁটে (চশমাটি বড় হওয়াতে নাক থেকে নেমে পড়ে যাচ্ছে—নিশ্চয়ই ঠাকুর্দ্দার চশমা দুটি বেড়ালকে শাসন করে বলছেন, "চুপ ! চুপ ! আমি এখন 'খেলার সাথী' পড়ছি।" আর একটি "হাসি ও খেলার" "গাম্ভীর্য্য"। খুকুর মুখে এখনও আধো আধো কথা। তবু সে বলছে,

"বলো ছলো হয়েছি আমি ছেলেচি পুতুল্-খেলা ;
খাবাল্ তলে কাঁদি না আল ছন্দে-ছকাল বেলা !
দিদিল্ ছাথে খেলতে গিয়ে আল্ পলি না ত'লে,
চালে দুয়ে কত হয় এক দাকে দিই ব'লে !
কাপল্-চোপল্ প'লতে পালি বিচ্না থেকে উথে
পাছেল ঘলে যেতে পালি ঘন্তা খানেক ছুতে।"

এ হেন খুকুমণিকে যদি কেউ বড় বলে স্বীকার না করে, তাহলে তাঁর রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই তিনি বলছেন,

"এত অপমান তো আমি
ছইব না কো আল ;
চুপ্তি কলে থাকব ব'ছে—
মুখ্তি ক'লে ভাল !"

সত্য কথা বলতে, এ ছড়াটি শিশুর চেয়ে শিশুর অভিভাবকেরই বেশী ভাল লাগবার কথা। এই একই ধরণের কৌতুক এই বইটির "চিঠিপত্র"তে পাই। বাবা বিদেশ যাবার সময় চুমু খেয়ে যান নি বলে রাগ করে খুকুমণি লিখছে,

সত্যি বাবা, তোমার মত,
কোথাও আমি দেখিনি ত
দুষ্ট বাবা হেন !"

বাপ তাকে জানাচ্ছেন যে সে তাঁর বিদেশ যাত্রাকালে ঘুমিয়েছিল।

"তাই চুমিতে পারি নি মা,
লক্ষ্মী মিনু, কর ক্ষমা,
সামান্য এ দোষে।"

ক্ষমা পেতে অবশ্য দেরী হয় না। তবে "জো" পেয়ে কন্যার আবদারের অন্ত থাকে না। বাপকে তিনি অসংখ্য খেলনা আনতে লেখেন। লিষ্টের মধ্যে দেখি একটি রেসমি কামিজ ও রাঙ্গা কাপড় পরা, সোনার জুতো পায় দেওয়া পুতুল, হাঁড়ি-কুঁড়ি, রেকাব গেলাস হাতা বেড়ি এবং সব শেষে একটি মোটর গাড়ী। এর সঙ্গে "আলটিমেটাম্"

"আনতে যদি পার এসব,
তবেই আবার কথা কব,
তা না হলে আড়ি।"

(ভীত বাপ উত্তর দেন,

"যা বল্লে মা, ক'রবো তাই,
রাগেতে আর কাজ নাই,
ভয়েতে আমি মরি;
খেল্‌নাগুলি নিয়ে সাথে
ঘরে গিয়ে তোমার হাতে
দিব ত্বরা করি।
তাতেও যদি দুখ্‌খু তোমার
নাহি ঘুচে, ও মা,
জরিমানা কোরো আমায়
চুমোর উপর চুমা!")

"হাসি ও খেলা"র রচনাকাল ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে (এই তারিখটি স্মরণ রাখলেই আমাদের বোধগম্য হবে যে কেন একই গ্রন্থে শিশু এবং শিশুর অভিভাবকদের কৌতুকের খোরাক জোগান হয়েছে। ১৮৯১ সন) তখন পর্য্যন্ত যে সামান্য কটি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা বা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশেই শিশু এবং স্ত্রীলোকদের একই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এইরকম একটি মাসিকপত্র ছিল ১২৭৩

সালের ফাল্গুনমাসে (ইংরেজী ১৮৬৬ সনে) প্রথম প্রকাশিত "অবোধবন্ধু"। তার "আরম্ভ"তে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে সেটি "বালকবালিকা", অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ" অথবা "অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন" ব্যক্তিদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে। সেকালের প্রচলিত রীতি অনুসারেই যোগীন্দ্রনাথের বন্ধু রেভারেণ্ড গোপাল চন্দ্র দত্তও এক পত্রে তাঁকে লিখেছিলেন,

"তোমার অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি বিতরণ করিয়া তুমি বাঙ্গালা দেশের সকলকে বিশেষভাবে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে বিশুদ্ধ স্ফূর্ত্তি দিয়াছ।" (September, 1930)

আবার সেকালে যে শুধু বয়স্ক স্ত্রীলোক ও শিশুদেরই এক শ্রেণীভুক্ত করে তাদের জন্য এ ধরণের গ্রন্থ রচনা করা হত, এমন নয়। উপরন্তু কঙ্কাবতী প্রভৃতি কতকগুলি বইয়ের গল্পাংশ পাঠে কখনও মনে হয় যে তা বালকবালিকাদের জন্য রচিত। কখনও বা তার মধ্যে বয়স্কপাঠ্য উপাদানের সন্ধান পাই। সুতরাং একই গ্রন্থে শিশু এবং শিশুর অভিভাবক বা অভিভাবিকাকে আনন্দের খোরাক জোগানের রীতি তখন ছিল। যোগীন্দ্রনাথের রচনার স্বপক্ষে বলবার আর একটি কথা আছে। "গাম্ভীর্য্য" এবং "চিঠিপত্র" শ্রেণীর রচনা শিশুর পক্ষে তো একেবারে দুর্ব্বোধ্য নয়, এর কৌতুক সেও যে একেবারে উপভোগ করে না, তা নয়। হয়তো বা এগুলি পড়ে সে নিজেকে বয়স্ক কল্পনা করে ছোট ভাইবোনেদের কথা ভেবে হাসে। সকলেই জানেন যে দু এক বৎসরের বড় দাদাদিদিরা চিরকালই ছোট ভাইবোনেদের অত্যন্ত ছোট মনে করে বেশ করুণার চক্ষে দেখে। সুতরাং তারা যখন শোনে যে অভিমানী বালিকাটি বলছে,

"দিদিল্ ছাথে খেলতে গিয়ে আল্ পলি না তলে", তখন নিজেকে সেই দিদিটির পর্য্যায়ে ফেলে খুকুর রাগ দেখে তারাও খানিকটা কৌতুক বোধ করে বই কি!

গোপাল চন্দ্র যে লিখেছিলেন, "তোমার অফুরন্ত স্ফূর্ত্তির বিতরণ করিয়া তুমি বাঙ্গলা দেশের সকলকে···বিশুদ্ধ স্ফূর্ত্তি দিয়াছ।" ইত্যাদি, যোগীন্দ্র রচনার মধ্যেকার কৌতুকের সম্বন্ধে ঐ স্ফূর্ত্তি কথাটাই প্রযোজ্য। তাঁর অফুরন্ত স্ফূর্ত্তির ভাণ্ডার ছিল চিরসবুজ বৃক্ষপত্রের মত চির নূতন সেই রসমধুধারা—তা স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং শতধারে স্ফূর্ত্তছিল।

এত বিষয় নিয়ে তাঁর রচনার মধ্যে কৌতুক পাই যে তার হিসাব দেওয়া কঠিন। বালক পড়তে চায় না। কখনও কখনও দেখি তা নিয়ে কৌতুক করেছেন। যথা, "ছড়া ও পড়া"য় প্রথম কবিতাটি। ছবিতে দেখি যে, একটি ছেলে হাই তুলছে। তার সঙ্গের ছড়া হ'ল ঃ—

"দাঁড় ফোক্‌লা, চুল ঝাঁকড়া, নামটি খোকার রবি,
এখন যে ভাব দেখছ, সেটি পড়তে বসার ছবি।"

আবার "হাসিরাশি"র "শক্তের ভক্ত" কবিতাটিতে,

"যখন গুরু দৃষ্টি রাখে,
পোড়োরা সব ঠাণ্ডা থাকে,"

আর তারপর ?

যখন গুরু ঘরের কোণে ঢোকেন,

"তার পরেতে দুড়্‌দাড়,
পাড়াশুদ্ধ তোলপাড়।"

আবার আর এক ধরণের কৌতুক যোগীন্দ্র সাহিত্যে দেখি, যেখানে ক্ষুদ্র বালকের অপটু হস্তের কর্ম্মে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ বালক ভেবেই পাচ্ছে না তার ত্রুটি কোথায় এবং ভেবে না পেয়ে অন্যের উপর তার রাগ হচ্ছে। এইরকম একটি ছড়া হ'ল, "ছড়া ও পড়া"র "তা ত বটেই।" মামার দেওয়া পূজোর কাপড় ঠিক করে পরতে না পেরে ছোট নলুর মামার উপর অভিমানের অন্ত নাই। কাপড়ের দোষ দেখিয়ে মামাকে সে বলছে,

"এই দেখ তা টেনেটুনে
যেমন করেই পরি,
কোঁচায় নাই এক রত্তি,
কাছার ভারেই মরি!
কাপড়খানায় আরো দেখ
কতরকম ভুল;
পাশের চেয়ে লম্বে ছোট
উপর দিকে ঝুল।"

লেখক নল্লুর দুঃখে সহানুভূতিশীল হয়ে বলেছেন,

"ঠিক্ বটে ত ! দুঃখে নল্লু, কাঁদবে না ত কি ?
যেমন মামা উচিত সাজা, গরম ভাতে ঘি !"

যেমন কল্পিত অপরাধ, তেমনি তার সাজা। যোগীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি যে "গরম ভাতে ঘি" জয়নগর মজিলপুরের দিকে প্রচলিত একটি গালি ছিল। বেচারা নল্লু কাপড় পরতে জানে না, আবার তার সঙ্গে সায় দিতে গিয়ে লেখক যে উল্টে মামার জন্য এক উপাদেয় খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিলেন, তাও বোঝে না। এই নিয়েই কৌতুক।

(যোগীন্দ্রনাথ যে যুগে সাহিত্য রচনা করেছিলেন, সেই উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় Reign of Terror ছিল। শিশুকে শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষক কেবল স্মরণ রাখতেন, "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি তাড়য়েৎ দশবর্ষাণি চ" অর্থাৎ প্রথম পাঁচ বৎসর শিশুকে লালন করবে ও তারপর দশবৎসর তাড়না করবে। প্রথম পাঁচ বৎসর শিশু গৃহেই থাকত। পঞ্চম বর্ষে তার হাতে খড়ির অন্তে যখন সে গুরুমশাই নামক শিক্ষকের নিকট পড়াশোনা আরম্ভ করত, তখন থেকে একনাগাড়ে দশবৎসর শিক্ষক তাকে তাড়নাই করে চলতেন। তার মনস্তত্ব বোঝবার দায় তাঁর ছিল না। কিন্তু) যোগীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন যে পরম গম্ভীর মুখে শিশুকে উপদেশ দিলে তার চরিত্রগঠনে কোন সাহায্যই হবে না। যদি তাকে কোন নীতি শিক্ষা দিতে হয়, তা অপ্রত্যক্ষভাবে দিলেই বেশী কাজ হবে। বালক দুষ্টমী করে অন্যকে জব্দ করবার চেষ্টা করে কিন্তু তার ফলে অনেক সময় সে নিজেই জব্দ হয়। এই ব্যাপারটি একটি কৌতুককর ছড়ার মধ্যে দিয়ে যোগীন্দ্রনাথ কেমন সুন্দর করে বুঝিয়েছেন, তা দেখি হাসিরাশির "পেটুক দামু"তে। পেটুক দামু তিনটে কলা খেয়ে কলাওয়ালার ঝুড়িশুদ্ধ কলা কিভাবে খাওয়া যায়, তাঁর ফন্দি অাঁটল :—

"ভাবে দামু ছোবড়া যদি
ঠিক ফেলতে পারি,
পা পিছলে প'ড়বে করীম
মজা হবে ভারি !"

তারপর তার কৌশলে ফেলা কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে করীম মিয়া গিয়ে পড়ল দামুয়ের পিঠের উপর। তখন,

"হাঁউ মাঁউ খাঁউ করে দামু
ঠোঁট দুখানি কাঁপে ;
পিঠটা বুঝি গেল ভেঙে
করীম মিয়ার চাপে।"

বালক নিশ্চয়ই এছড়া পড়ে আমোদ পায় আর সেই আমোদের সঙ্গে শোনে লেখকের সংক্ষিপ্ত উপদেশ :—

"পেটের চেয়েও পিঠের জ্বালা
দামু কেঁদে সারা ;
তার প্রতিফল পায়, যেমন
কাজটি করে যারা।"

এ উপদেশ তার মনে কোনও তিক্ততার সঞ্চার করে না। কারণ ততক্ষণে হয়তো বালকের নিজেরই মনে হয়েছে, "যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল।"

কিন্তু সর্বত্র যে এরকম উপদেশ আছে, তা নয়। অনেক সময় বালকের মনে লেখক অকারণ পুলকেই কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছেন। এই রকম একটা ছড়া হল "হাসিরাশি"র "দুষ্টু তিনু"। ফাঁকি দিয়ে গাড়ী চড়া অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ীর পিছনে চড়াই তিনুর কাজ। এক চলন্ত গাড়ীতে সে চেপেচুপে বসল।

তারপর,

"পিছু কেন ভারী ঠেকে"

ভেবে কোচম্যান যেই ছাদে চড়ল, অমনি তিনু নেমে গাড়ীর তলায় ঢুকে পড়ল। তারপর,

"হেঁট হয়ে কোচম্যান
দেখে চারিধার
কোথা গেল তিনকড়ি
খোঁজ মেলা ভার।"

কোচম্যান তখন গাড়ীর পিছন দিয়ে নামল আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর তলার থেকে সামনে দিয়ে কোচ বাক্সে উঠে,

মহাখুসী তিনকড়ি
ধরিল লাগাম।
তারপরে দিল ঘোড়া
জোরে ছুটাইয়া ;
পথে পড়ে হাহাকার
করে বুড়ো মিয়া।"

এ নিছক কৌতুক—এর মধ্যে উপদেশের নামগন্ধও নাই। Spare the rod and spoil the child নামক ইংরেজী প্রবচনটি যখন দেশের অধিকাংশ লোকই বালককে শিক্ষা দেবার সময় স্মরণ রেখে চলতেন, যোগীন্দ্রনাথের মূলমন্ত্র ছিল আর একটি ইংরেজী প্রবচন,

"All work and no play,
Makes Jack a dull boy."

শিশুকে শিক্ষা তো দিতেই হবে কিন্তু মাঝে মাঝে সে খেলবে বই কি! সে খেলার সময় দুষ্টুমীও করবে এবং মাঝে মাঝে তার মতই দুটি একটি দুষ্টু ছেলের গল্প শুনলে স্বভাবতঃই তার মনে হবে যে, পড়তে পড়তেও তাহলে আনন্দ পাওয়া যায়! সুতরাং পড়তে তার আগ্রহ হবে। এই বোধহয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তা নাহলে যিনি লিখেছিলেন, (শিশুদের উদ্দেশ করে)

"হোক্ ভাই তোমাদের সুন্দর জীবন",

তিনি কখনই চান নি যে দুষ্টুমী শিখে শিশুর জীবন নষ্ট হয়ে যাক। বালকের মন থেকে তিনি পাঠ্য পুস্তকের সম্বন্ধে বিভীষিকা দূর করতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে কত ধরণের মজার কাহিনী যে লিখলেন, তার হিসাব রাখা কঠিন। বালক মায়ের উপদেশ অনুসারে বাজার করতে চলছে আর কি কি আনতে হবে, তা মুখস্ত বলছে,

"দাদ্‌খানি চাল, মুসুরির ডাল,
চিনিপাতা দৈ,
দু'টা পাকা বেল, সরিষার তেল,
ডিম-ভরা কৈ।"

মনে রাখবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু পথে যে কত মজার মজার এবং আকর্ষণীয় ঘটনা ঘটছে! কোথাও সব ছেলেরা মিলে কপাটি খেলছে, কোথাও কেউ ঘুঁড়ি ওড়াচ্ছে। বালক এক একটি ব্যাপার দেখে আর মনে মনে মায়ের দেওয়া ফর্দ্দটি একবার করে আওড়ে নেয়। ইতিমধ্যে যে ফর্দ্দের কথাগুলি সব গোলমাল হয়ে গেছে, তা আর খেয়াল থাকে না। দোকানে এসে শেষ পর্য্যন্ত সে দোকানীকে যা যা দিতে বলে তা হ'ল এই:—

"দাদ্‌খানি বেল মুসুরির তেল
সরিষার কৈ,
চিনিপাতা চাল দু'টা পাকা ডাল,
ডিম-ভরা দৈ।"

এ ছাড়াও আছে সেই যমজ ভাইয়েদের কাহিনী যাদের চেহারা একরকম হওয়ার ফলে লোকে তাদের পৃথকভাবে চিনতে পারত না। তার ফলে নানা বিপত্তির সৃষ্টি হত। শিশুকালে রামু কাঁদলে মা শ্যামুকে দুধ খাইয়ে দিতেন, পাঠশালে গিয়ে একের অপরাধে অন্যজন বেত খেত, আবার একের অসুখে অন্যের চিকিৎসা হত। দুজনে বড় হয়ে ব্যবসা করতে লাগল। তখন একজনের দোকানে জিনিষ সস্তা হলে অপর ভাইয়ের সুনাম হত। আবার এক ভাই ভৃত্যকে প্রহার করাতে অপরের কারাদণ্ড হল কিন্তু চরম হল সব শেষে যখন,

"একদিন রামু সাপের কামড়ে
মরিল পড়িয়া মাঠে;
আত্মীয় স্বজন শ্যামুরে লইয়া
পোড়ায়ে আসিল ঘাটে।"

বলা বাহুল্য কবিতাটি আজগুবী। যোগেন্দ্রনাথের কৌতুককর ছড়াগুলির মধ্যে আজগুবী ছড়াগুলি একটি প্রধান অংশ দখল করে আছে। কিন্তু এমন অনেক ছড়াও আছে, যা শুধুই কৌতুককর কিন্তু আজগুবী নয়।

কৌতুকও নানা উপায়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। কখনও বা "দোলনা" নামক ছড়াটির মত একটি মাত্র পরিস্থিতির (situation) উপর নির্ভর করে (একটি তালগাছের মত লম্বা লোক অপর একটি লম্বা লোকের কাঁধে পা

তুলে দিয়েছে এবং সেই পায় দোলনা টাঙিয়ে একটি ছেলে দুলছে, এই বিষয়বস্তু নিয়ে ছড়াটিতে কৌতুক পাই), কখনও বা গাম্ভীর্য্য নামক ছড়াটির মত ব্যক্তি বিশেষের (বিশেষতঃ বালকবালিকার) মনোভাব নিয়ে, কোথাও বা "দাদ্‌খানি চাল, মুসুরি ডাল" এর মত বালকের চরিত্রের উপর ভিত্তি করে কৌতুক সৃষ্টি হয়েছে (বালকের স্বাভাবিক ক্রীড়াসক্তি এবং তার বিস্মরণশীল মন নিয়েই এই কৌতুককর ছড়ার জন্ম) যোগীন্দ্রনাথের কৌতুককর ছড়ার মধ্যে কিছু আবার কাহিনীপ্রধানও আছে—"হাসিরাশি"র "পেটুক দামু" ও "দুষ্টু তিনু" এই শ্রেণীভুক্ত। কোন কোন কৌতুককর কাহিনীতে আবার নায়ক মানুষ না হয়ে পশু—এই শ্রেণীভুক্ত রচনা হ'ল "অনুতপ্ত সন্তান" এবং "সাপ নয় ত—যম।" দুটিতেই নায়ক বানর।

"সাপ নয় তো যম" কবিতাটিতে যে বানরের টবের উপর বসে থাকা ছবিগুলি আছে, সেগুলি আরও অন্যান্য অনেক ছবির মত মুকুলে প্রথম প্রকাশিত হয়। "বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ" গ্রন্থে শ্রী আশা গঙ্গোপাধ্যায় এ বিষয়ে লিখেছেন,

"মুকুলে অজস্র মজার মজার ছবি বাহির হইত। এই ছবিগুলি সম্বন্ধে একটু বলিবার আছে। ইহাদের কতকগুলি বিলাতী পত্র-পত্রিকা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে এই সব ছবি ছাপিয়া তরুণ লেখকদের নিকট হইতে গল্প, কবিতা আহ্বান করা হইত। পরে এই ছবিগুলিই যোগীন্দ্রনাথ সরকারের গ্রন্থাবলীতে তাঁর নিজের কবিতার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। চতুর্থ বর্ষের আষাঢ় সংখ্যায় যে ছবির উপর কবিতা লিখিয়া বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (পরে বিখ্যাত বিপ্লবী) পুরস্কার পাইয়াছিলেন, সেইটিরই উপর হাসি-রাশিতে কবিতা আছে—"বেজায় ধূর্ত্ত"। স্বয়ং সম্পাদক শিবনাথও এইরূপ ছবির উপর কবিতা লিখিয়াছেন—আবার যোগীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের বইতে সেই ছবিতেই কবিতা যোজনা করিয়াছেন।"

শ্রীমতী আশা গঙ্গোপাধ্যায় "বেজায় ধূর্ত্ত" নামে যে কবিতাটির উল্লেখ করেছেন, তাতে এক সাহেব ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে একটি নির্জ্জন জায়গায় গিয়ে কেমন করে এক সিংহের পাল্লায় পড়লেন এবং সিংহের ছবি এঁকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে পিছন ফিরতে বলে ফাঁকি দিয়ে নৌকোয় চড়ে নদী পার হয়ে পালালেন, তারই কাহিনী দেখি।

শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায় এই সূত্রে "সাপ নয় তো—যম" এই কবিতাটিরও উল্লেখ করেছেন। ওটিরও সঙ্গের ছবিগুলি মুকুলে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেই ছবি দেখে এই কবিতা লিখেছিলেন,

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল
টব হাতে গুটি গুটি ওকে যায় গো!
দিল দিল চাপা দিল পালা সাপের পো!"

এই ছবির সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের "সাপ নয় তো যম"এর প্রথম পংক্তিগুলি হলঃ—

"সাপ নয় তো—যম
টবটা নিয়ে চাপা দিয়ে
ফাটিয়ে দেবো দম!"

দ্বিতীয় ছবিটির সঙ্গে শাস্ত্রীমশাইয়ের পংক্তিগুলি হ'ল ঃ—

"দিয়েছি দিয়েছি চাপা, জব্দ এইবার।
জারিজুরি ফোঁসফাঁস খাটিবে না আর।"

যোগীন্দ্রনাথের পংক্তিগুলি হ'ল ঃ—

"যেমন তুমি খল
কারাগারের অন্ধকারে
ভোগো প্রতিফল!"

তৃতীয় ছবির সঙ্গে শাস্ত্রীমশাইয়ের পংক্তিগুলি এইরূপ ঃ—

"পোলো চাপা সাপ ভায়া এইবার যান।
বসিলাম রাজতক্তে হয়ে গদিয়ান।"

যোগীন্দ্রনাথ লিখলেন ঃ—

বাহ বা কি মজা
সিংহাসনে বসে আছি
কিষ্কিন্ধ্যার রাজা।"

চতুর্থ ছবির সঙ্গে শাস্ত্রীমশাই লিখলেন ঃ—

"ল্যাজে কি কামড়ালো মোর বাপ্‌রে বাপ
পালা ভাই ল্যাজ নিয়ে থাক পোড়া সাপ।"

যোগীন্দ্রনাথ লিখলেন ঃ—

"উঃ জ্বলে মলুম বাপ !
লেজের গোড়ায় জুবলেছে রে
হতভাগা সাপ।"

এর পরের ছবির সঙ্গে শাস্ত্রীমশাই লিখলেন,

"ল্যাজ ফুলে কলাগাছ এ-ও বড় দায়।
ডালে বসে মক্কী ভায়া মরে ভাবনায়॥"

যোগীন্দ্রনাথ লিখলেন,

"প্রাণটা বুঝি যায় !
লেজটা ফুলে কলার গাছ
করি কি উপায় !
মুখ থুবড়ে পড়ি বুঝি
হায় হায় হায় !"

এই কবিতা দুটি উদ্ধৃত করবার সময় শ্রীআশা গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "কোন কবিতাটি ভালো, তাহার বিচার অবশ্যই নিরর্থক।" (বাংলা শিশু ক্রমবিকাশ—পৃঃ ১৭১)

সে বিচার না করেও একথা বলা চলে যে, যোগীন্দ্রনাথের কবিতাটির মধ্যে যে স্বতঃস্ফুরিত কৌতুকরস আছে, তা দুর্লভ। তাঁর অনেক কবিতার সঙ্গের ছবি বিলিতী ম্যাগাজিন থেকে প্রথমে মুকুলের পাতায় তুলে দেওয়া হয়েছিল সত্য কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের নিজের নির্দ্দেশে অঙ্কিত অনেক ছবিই তাঁর গ্রন্থে আছে। তা ছাড়া মুকুলের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের শুধু লেখক বা পাঠকের সম্বন্ধ ছিল না। যখন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মুকুলের সম্পাদক, যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন তার কার্য্যাধ্যক্ষ এবং তখনকার একমাত্র উডব্লক প্রস্তুতকারক চিৎপুরবাসী প্রিয়গোপাল দাসগুপ্তকে ছবির ব্লকের জন্য তাগাদা দিতে যাওয়ার জন্য তিনি নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে (তখন তিনি সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক ছিলেন) প্রায়ই ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে পারতেন না। ফলে তিনদিন লেট হয়ে একদিনের বেতন কাটা যেত। এ সংবাদ আমরা জানি। সুতরাং বিলিতী ম্যাগাজিন থেকে ছবিগুলি মুকুলের পাতায় রূপান্তরিত করার মধ্যেও তাঁর হাত ছিল বলেই মনে হয়।

যোগীন্দ্রনাথের কৌতুকরস শুধু কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। তাঁর রচিত অনবদ্য আজগুবী গল্প ("মজার গল্প" বইটির) "ছোট চোর ও বড় চোর", ("ছবি ও গল্প" বইটির) "ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ" এবং "রামধন" এ সব কাহিনীতে যে হাসির ফোয়ারা দেখি, সেগুলি তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেয়। শুধু তাই নয়, "ছোটদের চিড়িয়াখানা" নামক প্রাণীতত্ত্বমূলক পুস্তকটিতে (যেটি কিশোর পাঠকদের জন্য রচিত হয়েছিল) জন্তু জানোয়ারের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র মজার কাহিনী আছে। তার মধ্যে কিছু অবশ্যই বিলিতী গল্প, কিছু অন্য কোথাও শুনে বা পড়ে থাকবেন কিন্তু সুখাদ্য খেয়ে যেমন আমরা কার ক্ষেতের তরকারী বা কার পুকুরের মাছ, সে প্রশ্ন না তুলেই রন্ধনকারিণীর প্রশংসা করি, তেমনই এক্ষেত্রেও উপাদান যেখান থেকেই সংগ্রহ হোক, রচনা ভঙ্গীর জন্য প্রশংসা যোগীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য! কৌতুককর কবিতাগুলির উপাদান অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই যে কোথাও থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, তা নয়। তাঁর নিজের কল্পনাই এদের বেশীর ভাগের সৃষ্টির জন্য দায়ী। "ছোট চোর ও বড় চোর" তথা "ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ" এর বিষয়েও এই কথাই বলা যায়।

যোগীন্দ্রনাথের অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে "হাসিখুসি" সবচেয়ে বিখ্যাত। নামটি যোগীন্দ্রনাথের চরিত্র বর্ণনায় প্রয়োগ করলেও অন্যায় হয় না। হাসিখুসি তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। কৌতুকরস তাঁর পক্ষে নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত সহজ ছিল। চরিত্রের গভীরে এই রসের উৎস ছিল বলেই, তা এমন করে সকলকে নির্ম্মল হাসির খোরাক জুগিয়েছে। শিশু সাহিত্যে কৌতুকরসের পরিবেশক হিসাবে আরও কয়েকজনের নাম করা যায় কিন্তু একই সঙ্গে এত ধরণের বিষয় নিয়ে এবং এত বিচিত্র ভঙ্গীতে কৌতুক করে বাংলার এত শিশুকে আর কেউ হাসাতে পেরেছেন বলে জানি না।

পঞ্চম অধ্যায়

যোগীন্দ্র সাহিত্যে আদর্শ শিক্ষাদান

ঊনবিংশ শতক পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশেই শিশুশিক্ষার মন্ত্র ছিল Spare the rod and spoil the child. ভারতবর্ষে অবশ্য প্রথম পাঁচ বৎসর শিশুকে লালন করবার এবং তার পরের দশ বৎসর তাড়না করবার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছিল, "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, তাড়য়েৎ দশবর্ষাণি চ।" তবে প্রথম পাঁচ বৎসর তো শিশু থাকত মা ঠাকুরমার স্নেহাঞ্চলচ্ছায়ায়। তারপর একেবারে সোজা তার নির্ব্বাসন হত স্নেহমমতার ছায়া বিহীন এক নির্দ্দয় গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। সে পাঠশালা তার নিকট কেমন বিভীষিকা ছিল, তার চিত্র দেখি শরৎচন্দ্রের দেবদাসে, বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীতে ও পরে মনোজ বসুর "নবীন যাত্রা"য়। আর কাল্পনিক সাহিত্যের রাজ্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ঊনবিংশ শতকে লিখিত কোনও আত্মজীবনীর দিকে দেখলেও অনুরূপ বর্ণনাই পাই।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর এইরূপ একটি বাল্যস্মৃতি শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার থেকে একটি অংশ উদ্ধার করছি।

"যে ছেলে লেখাপড়ার দিকে চোখ না রেখে এদিক ওদিক তাকাত, তাকে কি রকম শাস্তি দেওয়া হ'ত আমার একটু একটু মনে আছে। সে যত বড় হাঁ করতে পারে সেই হাঁয়ের মাপে একটা ছোট কঞ্চি কেটে তার নীচের ও উপরের দাঁতের মাঝে বসিয়ে দেওয়া হ'ত। কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকতে হ'ত। কোন পোড়ো গরহাজির হলে তাকে ধরে আনবার জন্যে গুরুমশায় জনকতক পোড়োকে পাঠাতেন। ...হাজির হলে পরে তার শাস্তি হত। দুরকম শাস্তির কথা মনে আছে। উঁচুতে টাঙ্গান একটা আড়া বাঁশের সঙ্গে তার দু হাত বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে বেত মারা হ'ত, এই একটা, আর একটা হচ্ছে বিছুটি গাছ কেটে এনে মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হ'ত, তার উপরে তাকে খালি গায়ে গড়াতে বলা হ'ত।" (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৬৩) অবশ্য এইরূপ শাস্তিদানের উদ্দেশ্য ছিল

মহৎ—বালকের চরিত্রগঠন। আর সেই চরিত্রগঠনের মানসেই তার জন্য পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন আর পুস্তক ছিল না। আর সে পুস্তক থাকত মহৎ উপদেশে পূর্ণ। বালক সে উপদেশে কতটা উপকৃত হত বলা কঠিন কিন্তু কারাগার আর পাঠশালায় যে তার নিকট কোনও পার্থক্য ছিল না এবং পুস্তক পাঠ ও ঔষধ গলাধঃকরণ যে তার নিকট একই ব্যাপার ছিল, সে কথা বলা বাহুল্য।

তারপর সম্পূর্ণ নূতন ধাঁচে শিশু ও বালকবালিকাদের জন্য পুস্তক রচনা করে যোগীন্দ্রনাথই তাদের মন থেকে পুস্তক সম্বন্ধে বিভীষিকা দূর করলেন। শুধু বালকের মনোরঞ্জন করবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন নি। শিশুর বিমুখ মনে পাঠের তৃষ্ণা জাগানর উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি অজস্র চিত্রসহ তাঁর ছড়া গল্প গান তাদের উপহার দিয়ে চললেন। কিন্তু এহ বাহ্য। তাঁর মনে আরও গভীর উদ্দেশ্য ছিল। সে হল বালকবালিকার চরিত্রগঠন।

সুতরাং তাঁর অনেক পুস্তকেই শিশুকে আদর্শশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নানারূপে তাদের তিনি নিয়মানুবর্ত্তী হতে বলেছেন, সময় নষ্ট না করতে উপদেশ দিয়েছেন, স্বদেশ প্রেম ও ঈশ্বর প্রেমের বীজ তাদের মনে বপন করেছেন কিন্তু তাঁর বলবার ভঙ্গীটির গুণে বালক বুঝতে পারেনি যে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। "হাসি ও খেলা"র "কাকাতুয়া" কবিতাটিতে প্রায় প্রত্যক্ষ উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

"সময় চলিয়া যায়—
নদীর স্রোতের প্রায়,
যে জন না বুঝে, তারে ধিক্ শত ধিক্।"

পরে বলা হয়েছে,

"মানুষ হইয়ে যেন হয়ো না ক সঙ্।
ফিট্‌ফিটে বাবু হলে
ভেবেছ কি ল'বে কোলে ?
পলাশে কে ভালবাসে দেখে রাঙা রঙ।"

কিন্তু বালক এই উপদেশ শুনে বুঝতে পারে না যে তাকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। প্রথমতঃ সে ভোলে ছন্দের টুং টাং শুনে, দ্বিতীয়তঃ ভোলে আনুষঙ্গিক চিত্র দেখে, তৃতীয়তঃ "কাকাতুয়া" নামটি তাকে ভোলায়।

তারপর "হাসিরাশি"র "সখের সেনা" কবিতাটিতে যেন স্বাধীন ভারতের বালকবাহিনী N.C.C.র পূর্ব্বাভাষ পাই। সৈন্যের বেশে সজ্জিত কয়েকটি বালক দামামা বাজাতে বাজাতে বীরদর্পে চলেছে আর বলছে,

"আমরা সখের সেনা চল সবে ভাই
স্বদেশের তরে আজ্ রণস্থলে যাই।"

এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষায় বালককে দেশ প্রেম শিক্ষা দেওয়া সে যুগে সম্ভব ছিল না।

আবার অন্যস্থলে পাখী খাঁচার মধ্যে ধরা দিয়ে পোষমান জীবনের সুখ লাভ করতে অস্বীকার করে বলছে,

"উড়িতে বাসনা মোর নীলাকাশে ভাসি,
হলেও সোনার খাঁচা নাহি ভালবাসি।"

এইরূপ রাঙাছবির "চরণে প্রণাম" কবিতাটিতে শিশুর মনে ঈশ্বরভক্তির বীজ বপন করবার প্রয়াস দেখা যায়। কবি পাখীকে প্রশ্ন করেছেন,

"ছোট পাখী, ছোট পাখী, বলগো আমায়,
এত মিষ্ট গান তুমি শিখিলে কোথায় ?"

পাখী উত্তর দিচ্ছে,

"যাঁহার কৃপাতে ভাই লভিয়াছি প্রাণ,
ক্ষুদ্র এই কণ্ঠে তিনি দিয়াছেন গান।"

এইরূপ কবির প্রশ্নের উত্তরে রাঙাফুল বলছে,

"জল স্থল সব ভাই রচেছেন যিনি,
আমার এ মুখে হাসি দিয়াছেন তিনি।"

আর খুকুরাণী বলছে,

"না থাকি একেলা ভাই জগৎ জননী
আমার শিয়রে বসি' থাকেন আপনি।"

কোন বিশেষ দেবতা বা বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম না করে সর্ব্ব মানবের গ্রহণযোগ্যভাবে যে ঈশ্বরের দেখা সম্ভব, তাঁর প্রতি বালকের মনে ভক্তি সঞ্চার করবার এর চেয়ে সহজ পন্থা বা সহজ ভাষা কল্পনা করা যায় না।

এই সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনা ভিন্নও বালকদের আদর্শ শিক্ষা দেবার জন্য "খেলার গান" নাম দিয়ে যোগীন্দ্রনাথ একটি সম্পূর্ণ পুস্তক

রচনা করেছিলেন। বইটির প্রায় সব কবিতাই উপদেশমূলক কিন্তু উপদেশ দেওয়া হয়েছে অপ্রত্যক্ষরূপে এবং বইটির নাম থেকেও আন্দাজ করা যায় না যে কি বিষয় নিয়ে লেখা। এইটুকু যোগীন্দ্র লেখনীর জাদু।

"খেলার গান" আরম্ভ হয়েছে "জন্মদিনে" নামক একটি কবিতা দিয়ে। সুরেন নামক এক বালকের জন্মদিন। তার সমবয়সী বালকবালিকারা স্থির করল যে তারা নিজেরাই বাজার থেকে সুরেনের জন্য মনের মত জিনিষ কিনবে। দোকানে গিয়ে তারা বলল,

"ওগো দোকানদার!
তোমার কাছে কি কি আছে,
দেখাও একটিবার।"

দোকানদার কতকগুলি সদ্‌গুণের ব্যবসা করত। সে বলল,

"'সাহস' আছে আমার কাছে,
'সদাচার' আর 'বিনয়' আছে,
'নিষ্ঠা' সরলতা';
'চেষ্টা' 'শ্রম' 'অধ্যবসায়'
আছে 'সত্যকথা'।
এসব জিনিষ খাঁটি অতি
রাখব নাকো বাকি,
ফাউটাউ মিলবে না তা
আগেই বলে রাখি।"

ছন্দের ভেতর দিয়ে কৌশলে কি সুন্দর উপদেশ। দোকানদার বলে দিল খাঁটি জিনিষ বলতে কি কি বোঝায়—'সাহস' 'সদাচার' ইত্যাদিই হ'ল খাঁটি জিনিষ। কিন্তু দোকানদার বালকবালিকাদের শুধু যে খাঁটি জিনিষের সন্ধান দিল, কেবল তাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল, 'সাহস', সত্যকথা' ইত্যাদির মত খাঁটি জিনিষের দাম 'বাকি' রাখা চলবে না অর্থাৎ এর দাম হাতে হাতে চুকিয়ে দিতে হবে, ফাউ ও এর জন্য দেওয়া হবে না। আপাত-দৃষ্টিতে কথাগুলি অতি সহজ, সরল হ'লেও এর অন্তর্নিহিত অর্থ গভীর। সদ্‌গুণ অর্জনের জন্য মানুষকে মূল্য দিতে হয় হাতে হাতে—সে মূল্য কাঞ্চনমূল্য নয়, অনেক স্বেদাশ্রুজলে তার মূল্যের পরিশোধ হয়।

আর সদ্‌গুণ নিজেই নিজের পুরস্কার, তার সঙ্গে 'ফাউ' মেলে না। ক্ষুদ্র বালক বালিকাদের জন্য রচিত এই সহজ, সরল গীতির মধ্যে সেই অর্থই নিহিত আছে যা 'গান্ধারীর আবেদন'এ গান্ধারীর উক্তিতে পাই,

"ধর্ম্ম নহে সম্পদের হেতু মহারাজ,
নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,
ধর্ম্মেই ধর্ম্মের শেষ।"

বয়স্কদের থেকে বালক বালিকার অভিজ্ঞতা কম হ'তে পারে কিন্তু সহজাত সংস্কারের বশে তারা ভালমন্দের পার্থক্য বোঝে অন্তর দিয়ে। দোকানী ফাউ দিতে সম্মত নয়, তবুও তারা খাঁটী জিনিষ কিনতে আগ্রহ দেখিয়ে বলে,

"ফাউ দিতে হবে নাকো, নগদ টাকা দেব,
সুরেন যাহা ভালবাসে, বেছে বেছে নেব।"

এর পরে দ্বিতীয় দোকান। এখানে বালক বালিকারা পদার্পণ করবার পূর্ব্বেই দোকানী হাঁকডাক করে বলে,

"নূতন আমদানী জিনিষ এই দোকানে আছে,
দোকানদারের সেরা আমি, এস আমার কাছে।"

প্রতিযোগিতার বাজারে অবশ্যই দোকানী তার দ্রব্য বিক্রয় করবার জন্য আগ্রহ দেখাবে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় এই যে প্রথম দোকানদার—খাঁটি জিনিষ নিয়েই যার ব্যবসা, সে কিন্তু বিন্দুমাত্র হাঁকডাক করে নি। সুতরাং বালক বালিকারাও সহজাত বুদ্ধির বশে তাকে সন্দেহ করে প্রশ্ন করে,

"দেখাও দেখি কেমন জিনিস আছে তোমার ঘরে;
মনের মত হ'লে মোরা কিনবো তাহা পরে।"

দোকানদার এরপর নিজ পণ্যদ্রব্য দেখায়। সে দ্রব্য কেবল বিলাসিতার সামগ্রী। সেগুলি যথাক্রমে, 'সোনার চেইন', 'সোনার ঘড়ি' 'চশমা' 'পাঁচশ টাকার ছড়ি' 'কিংখাপের টুপী' 'সাড়ী' 'জ্যাকেট' ও সোনার ব্রোচে হীরার ফুল। বালক বালিকারা তালিকাপ্রাপ্তি মাত্র দ্বিতীয় দোকানীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে,

"সুরেন যাহা ভালবাসে, এখানে তা নাই,
বাবুয়ানার মুখে আগুন, কপালেতে ছাই।"

এরপর প্রথম দোকানদারের মতই তৃতীয় দোকানদার নানা সদ্‌গুণের পসরা সাজিয়ে বসে আছে দেখা যায়। তার তালিকাতে 'স্নেহ', 'প্রেম', 'ভালবাসা', 'ক্ষমা' ইত্যাদি দেখি। এ দোকানদারও বালক বালিকাকে ডাকেনি। তারাই স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে বলেছে,

"দোকানদার মশাই !
তোমার কাছে কি কি আছে,
দেখতে মোরা চাই।"

দোকানদার তাদের জানিয়ে দিল যে স্নেহ প্রেম ইত্যাদি শুধু দেখবার জিনিষ নয়। যে এ সকল দ্রব্য কিনতে পারে, সে সারাজীবন সুখে কাটাবে। বালক বালিকারাও তার সঙ্গে একমত। চতুর্থ দোকানে দ্বিতীয় দোকানের মতন দোকানী হাঁকডাক করে বলে,

"এই দোকানে এস, ওগো, এই দোকানে এস,
হরেক রকম জিনিস পাবে, একটুখানি ব'সো।"

এই হরেক রকম জিনিষের সবগুলিই মানব চরিত্রের কোনও না কোন দোষ। যথা ঃ—স্বার্থ, ঘৃণা, অহঙ্কার, আলস্য, মিথ্যাকথা, নিন্দা, হিংসা, দ্বেষ। দোকানী শিশুদের লোভ দেখিয়ে বলে,

"নগদ টাকা নাই বা দিলে
ধারেই দেওয়া যাবে।
একটি টাকায় পাবে জিনিষ
হাজার টাকা দামী ;
'রাগ' 'অভিমান' 'কপটতা'
ফাউ দিব আমি !"

তবু এ মিথ্যা প্রলোভনে বালক বালিকারা ভোলে না। তাদের গঞ্জনাবাক্য শুনে ২য় ও ৪র্থ দোকানীর চেতনা হয়। তারা সমবেত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তাদের অনুতাপ প্রকাশ করে,

"নমস্কার, করি সবে
বিদায় আজ হ'লেম তবে,
এখন থেকে আমরাও ভাই,
রাখবো জিনিস খাঁটি—
মোদের ব্যবসা হ'ল মাটি !"

"খেলার গান" এর তৃতীয় কবিতা কাজের লোক। এতে মানুষের নানা অভ্যাসের এক একটিকে এক এক নাম দেওয়া হয়েছে। যথা, অলস, আরাম-প্রিয় লোক, যে পায়ের উপর পা তুলে অর্থাৎ বিনা কাজে দিন কাটাতে চায়, তার নাম হ'ল বাঃ। সে নিজের পরিচয় দিয়ে বলছে,

"বাঃ—আমার নাম 'বাঃ'
ব'সে থাকি তোফা তুলে পায়ের উপর পা!"

পর পৃষ্ঠায় একটি ছবির সাহায্যে শিশুমনে এই আরামপ্রিয় লোকটির সম্বন্ধে একটি কৌতুহলোদ্দীপক ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে। লোকটি তাকিয়া হেলান দিয়ে হুঁকো হাতে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে। এবং নিজের সম্বন্ধে বলছে,

"লেখাপড়ার ধার ধারিনে, বছর ভ'রে ছুটি,
—হেসে খেলে আরাম করে দু'শো মজা লুটি।
কারে কবে 'কেয়ার' করি, কিসের করি ডর,
কাজের নামে কম্প দিয়ে গায়ে আসে জ্বর।"

কিন্তু এই আত্মসন্তুষ্ট লোকটি শুধু নিজের অকর্ম্মণ্যতা নিয়েই বাহাদুরী করে তৃপ্তিলাভ করেনি। দুষ্টলোকদের স্বভাব অনুযায়ী অন্যদেরও নিজ পথে টানবার চেষ্টা করে বলছে,

"গাধার মত খাটিস্ তোরা মুখটি ক'রে চূণ—
আহাম্মুকি কাণ্ড দেখে হেসেই আমি খুন!"

কিন্তু এই অলস লোকটি কারও কাছ থেকে তার কাজের সমর্থন পায় না। সকলে বলে,

"আস্ত একটি গাধা তুমি স্পষ্ট গেল দেখা,
হাসছ যত, কান্না তত কপালেতে লেখা।"

এরপর 'যদি', 'বটে', 'কিন্তু' ইত্যাদি নামধারীরা একে একে নিজেদের স্বভাব অনুযায়ী আত্মপরিচয় দেয়। 'যদি' আশ্বায় আশায় বসে থাকে হেলান দিয়ে গদি। সে যদি সব কাজে খেলার মত মজা পেত, লেখাপড়া যদি জলের মত সোজা হত, যদি তার স্যাণ্ডোর সমান জোর থাকত এবং তার প্রশংসায় যদি আকাশ পাতাল ভরে যেত, তাহলে সে বাজে তর্ক ফেলে উঠে পড়ে কাজের

জন্য লেগে যেত। দেখা যাচ্ছে যে এই সুবিধা-অন্বেষণকারী ব্যাক্তিটিকেও সকলে ভৎ'সনা করে বলছে,

"হাতের কাছে সুযোগ, তবু 'যদি'র আশায় ব'সে—
নিজের মাথা খাচ্ছ বাপু, নিজের বুদ্ধি দোষে।"

এরপর আসছে রগচটা সেই অহঙ্কারী লোকটা, যে সকলকে চোখ রাঙ্গিয়ে নিজের কর্ত্তৃত্ব জাহির করতে চায়। সে বলছে,

"আমার নাম বটে' ; আমি সদাই আছি চটে,
কট্‌মটিয়ে তাকাই যখন, সবাই পালায় ছুটে।"

এ লোকটি কেবল অন্যের ত্রুটি দেখে আর বলে,

"চশমা পরে বিচার ক'রে, চিরে দেখাই চুল,
উঠতে বস্‌তে কচ্ছে সবাই হাজার গণ্ডা ভুল!
আমার চোখে ধুলো দেবে সাধ্যি আছে কার?
ধমক শুনে ভূতের বাবা হ'চ্ছে পগার পার!"

এর সত্যাসত্য বিচার করবার জন্য কোনও মনস্তত্ত্বের বই পড়বার দরকার নেই। এ ধরণের লোক আমরা নিত্যই সংসারে দেখতে পাই। এরা পরের ত্রুটি ধরতেই যে শুধু ভালবাসে তাই নয়, জুজু সেজে পরকে ভয় পাওয়ানতেই এদের আনন্দ। তাদের চোখরাঙানিতে যে অন্যলোকে ভয় পাচ্ছে, এ কথা মনে করেই তাদের অহমিকা তৃপ্ত হয়।

কিন্তু এ পংক্তি কটির আরও একটু বিশেষত্ব আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই কবিতাটি একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য রচিত নয়। কারণ এতে উপদেশের গন্ধ আছে। আর তা ছাড়া 'অ্যাবস্‌ট্র্যাকৃট' বস্তুকে অর্থাৎ মানুষের মনোভাব প্রকাশকারী শব্দকে মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতঃই মনে হয় যে কবিতাটি কিশোর বয়স্কদের জন্য রচিত। কিন্তু অদ্ভুত কোন কিছু দেখলে বা শুনলে কিশোররাই তো তা থেকে নির্ম্মল আনন্দ পেয়ে হাস্যোচ্ছল হয়ে উঠতে পারে। 'বটে' নামধারী রাগী ব্যাক্তিটির কথা শুনে 'ভূতের বাবা'র 'পগার পার' হ'বার চিত্রটি কিশোর মনে যে নির্ম্মল হাসির তুফান তোলে, তা আমরা অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি। 'পগার' কথাটি হয়তো আজকের কিশোরের নিকট অপরিচিত মনে হতে পারে কিন্তু মনে রাখতে হবে যোগীন্দ্র সাহিত্য

রচনার কাল উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগ। তখনও সুতানুটী, গোবিন্দপুরের সঙ্গে মহানগরী কলকাতার মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটেনি। কলকাতার কিশোররা তখনও গ্রামবাংলার থেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি। 'পগার' কথাটির মানে খোঁজবার জন্য তাদের কোনও চলন্তিকার পাতা উল্টোতে হ'ত না। সুতরাং ভূতের বাবার পগার পার হবার দৃশ্যটা অনায়াসেই তাদের হাস্যোদ্রেক করত। আর ঐ যে রাগী লোকটি, যে বলছে,

"হাসছ? বটে! ভাবছ বুঝি মস্ত তুমি লোক,
একটি আমার ভেংচি খেলে উল্টে যাবে চোখ।"

তার পিছনে পিছনে দৌড়ে হাততালি দিয়ে অথবা দুটো একটা ঢিল ছুঁড়ে তাকে ক্ষেপিয়ে দেবার লোভও তাদের কিশোর মনে সেদিনও জাগত আর আজও জাগে।

এরপর 'কিন্তু' নামধারী ব্যক্তিটিও নিজের গুণ (?) বর্ণনা করে বলে যে সে দশটা কাজে লাগলে তার মধ্যে আটটা মাটি করে। তার ভাষায়,

"লম্ফঝম্ফ বহুৎ কিন্তু কাজের নাইকো ছিরি—
ফোঁস করে যাই তেড়ে—আবার লেজ গুটিয়ে ফিরি!"

কবি অবশ্য "সকলে"র মুখ দিয়ে বলান,

"উচিৎ তোমায় বেঁধে রাখা নাকে দিয়ে দড়ি,
বেগার খাটা পশুকাজের মূল্য কাণাকড়ি"

কিন্তু এখানে দেখি কিশোর মনে প্রত্যক্ষ উপদেশের বিভীষিকা সৃষ্টি না করে তিনি একটি সুন্দর ছবি তাদের সামনে ধরলেন। সকলেই জানেন শিশু ও কিশোররা সমবয়সীদের সঙ্গের পরই পছন্দ করে জন্তু জানোয়ারের সঙ্গ। অন্তুবাবু, সন্তুবাবুরা চিরকালই 'জন্তু'দের বন্ধু। সুতরাং ঐ জন্তুর উপমাটিই তাদের কাছে পরম চিত্তাকর্ষক। লেখক তা জানেন। তাই 'কিন্তু' নামধারী লোকটি ত্যক্তবিরক্ত হওয়া নিরীহ জানোয়ারের মতন "ফোঁস" করে তেড়ে যায়, আবার "ল্যাজ গুটিয়ে" ফেরে। এ চিত্রও শিশু-কিশোরদের চিরপরিচিত। তারা হাসতে আরম্ভ করে কল্পনায় এ লোকটির ব্যবহার দেখে। ইতিমধ্যে "সকলে"র কথায় "জন্তু"র উপমাটি আরও স্পষ্ট হয়ে

ওঠে। "কিন্তু" কে ঘোড়া বা মহিষের মতন নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, এ কল্পনাটিও কিশোরের নিকট মনোরঞ্জন।

এরপর এল তরুণ বয়স্ক 'তবু'। মানুষটি ছোট কিন্তু তার ধৈর্য্য, পরিশ্রম, ক্ষমতা এবং আশা অপরিসীম। সে বলছে, "এম্নি আমার জেদ, যখন অঙ্ক নিয়ে বসি,

একুশ বারে না হয় যদি, বাইশ বারে কষি।"

ওই যে ছেলেটির ছবি আছে যে দোয়াতে কলম ডুবিয়ে বসে ভুল অঙ্কের 'আঁজিবুঁজি' কেটে নতুন করে অঙ্ক কষছে, ওর কথা পড়লে আর কি রবার্ট ব্রুস্ ও মাকড়সার কাহিনীর দরকার হয়? সমবয়সীদের কার্য্যকলাপ সকল বয়সেই মানুষের মনকে আকর্ষণ করে। কিশোর বা শিশুদের তো কথাই নেই। ছবিটিও চিরপরিচিত। বাবা 'আঁক কষতে' দিয়ে স্নান করতে গেছেন। স্নান হয়ে গেলেই এসে অঙ্ক দেখবেন। কিন্তু হাবুবাবুর আর কিছুতেই অঙ্ক মেলে না। ইতিমধ্যে আবার পাশের বাড়ীর ছেলেটি ঘুঁড়ি নিয়ে ছাদে উঠেছে। অবাধ্য চোখ বার বার চলে যাচ্ছে সেইদিকে। এ সময় "তবু" নামধারী একরোখা ছেলেটির কথা মনে পড়ে হাবুবাবুর কি একটুও উৎসাহ আসবে না? অঙ্কের 'স্যার' বলেন বটে "তোমার মাথায় গোবর পোরা।" তখন আর ভুল অঙ্ককে নতুন করে কষবার উৎসাহ থাকে না। কিন্তু 'তবু' নামে ছেলেটি তো হাবুর চেয়েও অঙ্কে কাঁচা। একুশবার ভুল করেও সে আবার অঙ্ক কষতে চেষ্টা করে। আর উত্তর মিলেও যায়। তবে হাবুবাবুরই বা মিলবে না কেন?

এরপর "সকলে" "তবু"র প্রশংসা করে বলে,

"নিষ্কর্ম্মারা গেল কোথা, পালাল কোন্ দেশে?
কাজের মানুষ কারে বলে, দেখুক এখন এসে।"

গল্প শুনে বা পড়ে হাবুবাবু বেজায় খুসী। "তবু"র মতন হতে পারলে লোকে প্রশংসাও করবে তাহলে। এই কবিতা দুটি আপাতদৃষ্টিতে যত সহজ বলে মনে হয় আসলে অবশ্যই তা নয়। ইংরাজী সাহিত্যের দিকে যখন দৃক্‌পাত করি, নাটকের আদি যুগে দেখি "মির‍্যাক্‌ল" ও "মিস্ট্রি প্লে" নামক দুরকম যাত্রা ধরণের অভিনয় খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই নাটকগুলি ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে 'মর‍্যালিটি' নামধারী গুরুগম্ভীর বিষয়ক এবং 'ইন্টারল্যুড'

নাটকে পরিণত হ'ল। অর্থাৎ এতদিন এক হেঁসেলে আমিষ নিরামিষের মতন হাসি কান্না মেশান ছিল একই ধরণের নাটকে। এখন ইণ্টারল্যুডের চামচে করে আমিষ হাসি পরিবেশন করা হ'ল আর নিরামিষ গম্ভীর বিষয় পরিবেশিত হ'ল "মর‍্যালিটি"র হাতায়। . মর‍্যালিটির উদ্দেশ্যই ছিল উপদেশ দেওয়া—তাই এতে দেখি বিমূর্ত্তভাব (abstract ideas) ও রূপকের প্রাধান্য। এর চরিত্রগুলি গতিশীল নয়, তারা এক একটি "টাইপ" এবং প্রতি চরিত্রই কোন না কোন গুণ বা দোষকে রূপ দিত। যথা, কোন চরিত্র ছিল পাপ, কোনটি ঈশ্বরের করুণা (grace), কোনটি বা অনুতাপ। এই নাটকের বিষয়বস্তু মনোরম না হলেও সেদিনের ইংরাজ তাকে গ্রহণ করেছিল সাদরে—তার প্রমাণ ষোড়শ শতাব্দীতে সেক্সপীয়রের আমলেও "মর‍্যালিটি প্লে"র চল ছিল। অবশ্য সেক্সপীয়রের যুগের পরও বিমূর্ত্তভাব (abstraction) কে মূর্ত্ত (concrete) ভাবে কল্পনা এবং সেই সূত্রে উপদেশ আমরা ইংরাজী সাহিত্যে পাই। এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হ'ল বানিয়নের "পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস্"। সকলেই জানেন যে এই বইটি পূর্ব্বাপর একটি রূপক। একজন সৎ খৃষ্টান কিভাবে ধর্ম্মপথে চলে তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, এটি তারই কাহিনী। "পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস" বা "তীর্থযাত্রীর অগ্রগতি" নামেই বইটির উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এই বইটিতে দেখি "ভ্যানিটি ফেয়ার" বা অসার এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিষের বাজারের কল্পনা। যোগীন্দ্রনাথ "জন্মদিনে" কবিতাটি লেখবার সময় যে পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেসের এই অংশের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে প্রায় কোন সন্দেহ নাই। শুধু বিশেষত্বের মধ্যে ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী করা টমেটোর চারাকে বাংলার মাটিতে পুঁতে আমরা যেমন তাকে "বিলিতী বেগুণ"এ পরিণত করেছি, যোগীন্দ্রনাথও তেমনি বানিয়নের কল্পনাটিকে নিজ ছাঁচে ঢালাই করে আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের পাতে পরিবেষণ করেছেন। সুরেনের জন্মদিনে ছেলেমেয়েরা বাজারে গিয়েছিল, বানিয়নের গ্রন্থের মতন কোন বয়স্ক, ধার্ম্মিক লোক যায়নি। দ্বিতীয়তঃ, এই বাজারে "ভ্যানিটি ফেয়ারা"এর মত শুধু অসার জিনিষই ছিল না। ভালোমন্দ আলো আঁধারে মেশা এই জগৎ—"জন্মদিনে"র বাজারেও তাই। বানিয়ন বলতে চেয়েছেন পার্থিব যা কিছু সব অসার; সে সব জিনিষের লোভ জয় করে পথের শেষে পৌঁছলেই যথার্থ খৃষ্টভক্ত তার

অভীষ্ট লাভ করে। অথচ যোগীন্দ্রনাথ যা বলতে চান, তাকে কবিগুরুর ভাষায় রূপ দিয়ে বলা যায়,

> "পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
> পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।"

এই পৃথিবীতেই মন্দের সঙ্গে ভালও আছে—জন্মদিনের বাজারে তাই দেখি।

তৃতীয়তঃ, "ভ্যানিটি ফেয়ার"এর দোকানদাররা তীর্থযাত্রীদের পোষাক আষাক এবং "সত্য" ক্রয় করবার চাহিদা সব কিছু নিয়েই হাসাহাসি করে। কিন্তু "জন্মদিনে" কবিতায় অসাধু দোকানদারেরা ছেলেমেয়েদের নিকট ভৎস'না শুনে লজ্জা পায়। এইগুলিই যোগীন্দ্রনাথের নিজের হাতের বিশেষ স্পর্শ।

এবার "কাজের লোক" কবিতাটিতে আসা যাক্। লেখক এখানেও বানিয়ানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বানিয়নের দোকানের মালমশলা কিনে নিজের জমিতেই গৃহ নির্ম্মাণ করেছেন। বানিয়ন মানুষের নানা প্রবৃত্তিকে নাম দিয়ে মানুষরূপে কল্পনা করেছেন। এরা হ'ল ঈর্ষ্যাবাবু (Mr. Envy), ঘৃণাবাবু, (Mr. Hatred), অন্ধবিশ্বাসবাবু (Mr. Superstition), অপদার্থ মশাই (Mr. No Good), নিষ্ঠুরতামশাই (Mr. Cruelty) প্রভৃতি। যোগীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষরূপে এদের আমদানী করলেন না। সকলেই জানেন যে যার যা প্রিয় অভ্যাস তা সূচিত করবার জন্য সে একটি শব্দের সাহায্য গ্রহণ করে। আরামপ্রিয় লোক আরাম পেলে বলে "বাঃ বা—আঃ", রাগী লোক সকলকে চোখ রাঙ্গিয়ে বলে "বটে রে", সৎকার্য্যে উৎসাহী লোক বার বার বিফল হয়েও বলে "তবু" চেষ্টা করে যাব। এই শব্দগুলিই হ'ল যোগীন্দ্র রচনায় এক একটি ব্যক্তির নাম। "তবু"ই যে কাজের লোক এবং কবিতাটির নাম তার নাম অনুসারেই হয়েছে, তা বলে দিতে হয়না। কবিতাটিতে বার বার "সকলে"র আবির্ভাব হয়েছে। এদের বেনামীতে লেখক নিজ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। এরা স্বভাবতঃই আমাদের গ্রীক নাটকের "কোরাস" বা সমবেত সঙ্গীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নাটকের দৃশ্যাবলীর মধ্যে যদি কোনও ঘটনা বুঝতে দর্শকের অসুবিধা হয়, তার জন্য ছিল এই কোরাস। তারা সঙ্গীতের দ্বারা নাটকের ফাঁকগুলি ভরাট করে দিত। এখানেও "সকলে"র সেই ভূমিকা। অলস, সুবিধা

অন্বেষণকারী প্রভৃতি ব্যক্তিকে তারা মিলিত কণ্ঠে ভৎস'না করে, আবার অসাম উৎসাহী, অধ্যবসায়ী "তবু"কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

চতুর্থ কবিতা "কাজের ব্যস্ততা"'র সঙ্গে "কাজের লোক" কবিতাটির একটি পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য আছে বলে মনে হয়। "কাজের লোক" কবিতাটি শেষ হয়েছে "তবু" নামক ছেলেটির অঙ্ক কষার চিত্রে। "কাজের ব্যস্ততায়" লেখক আরও অনেক কাজের লোকের ছবি তুলে ধরলেন। এখানে কৃষক, দোকানী, মজুর, কামার, সেকরা, দর্জ্জি, হাকিম, মাষ্টার, ডাক্তার, নাবিক, সৈন্য, রাজা সকলে এক একটি পংক্তিতে নিজের নিজের গুণ বর্ণনা করেছে।— তারপর আসছে নারী কর্ম্মীরা। এরা ঝি, রাঁধুনী, ধাত্রী, গোয়ালিনী, মেছুনী, ধোপানী, ছোট মেয়ে, ছোট বৌ ও ছোট গিন্নী। কবিতাটির বিশেষত্বই হ'ল এর মধ্যেকার বাক্ সংযম। লেখক প্রত্যেকের মুখ দিয়ে এক একটি পংক্তি বলিয়েছেন। তিনজন করে পর পর এক এক পংক্তি বলে যাচ্ছে। কৃষক বলছে,

"ছোট একটি কৃষক আমি জমিতে দিই চাষ",

দোকানী বলছে,

"দোকান খুলে বেচা কেনা করি বারমাস"

মজুর বলছে,

"পেটের দায়ে খেটে খেটে হাড্ডি হল সার"

এরপর তিনজন একসঙ্গে বলছে,

"সবাই মোরা ব্যস্ত কাজে যে যার আপনার"।

এইটিই হ'ল কবিতার রিফ্রেন বা ধুয়া। প্রতি তিনজন আপন আপন পরিচয় দেবার পর একসঙ্গে এই পংক্তিটি বলছে। মনে হয়, বালক বালিকাদের দ্বারা অভিনয়ের উপযোগী করেই এটি রচিত হয়েছিল। বিভিন্ন পোষাক পরে পর পর এক একজন মঞ্চের এক পাশ দিয়ে প্রবেশ করে নিজ পেশার পরিচয় দিয়ে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—এ ছবিটি মনোরম। মঞ্চের উজ্জ্বল আলোকে বিভিন্ন বর্ণের পোষাকে সজ্জিত বালক বালিকারা বিলাতী ফ্যান্সি ড্রেস পার্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য এখানে যারা আত্মপরিচয় দিয়েছে, তাদের অনেকের পেশার চেহারা আজ বদলে গেছে। মাষ্টার আজ আর "পড়তে বসে ফাঁকি দিলে বিতিয়ে করি লাল" বলতে পারেন না।

অভীষ্ট লাভ করে। অথচ যোগীন্দ্রনাথ যা বলতে চান, তাকে কবিগুরুর ভাষায় রূপ দিয়ে বলা যায়.

> "পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
> পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।"

এই পৃথিবীতেই মন্দের সঙ্গে ভালও আছে—জন্মদিনের বাজারে তাই দেখি।

তৃতীয়তঃ, "ভ্যানিটি ফেয়ার"এর দোকানদাররা তীর্থযাত্রীদের পোষাক আষাক এবং "সত্য" ক্রয় করবার চাহিদা সব কিছু নিয়েই হাসাহাসি করে। কিন্তু "জন্মদিনে" কবিতায় অসাধু দোকানদারেরা ছেলেমেয়েদের নিকট ভৎসর্না শুনে লজ্জা পায়। এইগুলিই যোগীন্দ্রনাথের নিজের হাতের বিশেষ স্পর্শ।

এবার "কাজের লোক" কবিতাটিতে আসা যাক্। লেখক এখানেও বানিয়ানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বানিয়নের দোকানের মালমশলা কিনে নিজের জমিতেই গৃহ নির্ম্মাণ করেছেন। বানিয়ন মানুষের নানা প্রবৃত্তিকে নাম দিয়ে মানুষরূপে কল্পনা করেছেন। এরা হ'ল ঈর্ষ্যাবাবু (Mr. Envy), ঘৃণাবাবু, (Mr. Hatred), অন্ধবিশ্বাসবাবু (Mr. Superstition), অপদার্থ মশাই (Mr. No Good), নিষ্ঠুরতামশাই (Mr. Cruelty) প্রভৃতি। যোগীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষরূপে এদের আমদানী করলেন না। সকলেই জানেন যে যার যা প্রিয় অভ্যাস তা সূচিত করবার জন্য সে একটি শব্দের সাহায্য গ্রহণ করে। আরামপ্রিয় লোক আরাম পেলে বলে "বাঃ বা—আঃ", রাগী লোক সকলকে চোখ রাঙ্গিয়ে বলে "বটে রে", সংকার্য্যে উৎসাহী লোক বার বার বিফল হয়েও বলে "তবু" চেষ্টা করে যাব। এই শব্দগুলিই হ'ল যোগীন্দ্র রচনায় এক একটি ব্যক্তির নাম। "তবু"ই যে কাজের লোক এবং কবিতাটির নাম তার নাম অনুসারেই হয়েছে, তা বলে দিতে হয়না। কবিতাটিতে বার বার "সকলে"র আবির্ভাব হয়েছে। এদের বেনামীতে লেখক নিজ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। এরা স্বভাবত:ই আমাদের গ্রীক নাটকের "কোরাস" বা সমবেত সঙ্গীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নাটকের দৃশ্যাবলীর মধ্যে যদি কোনও ঘটনা বুঝতে দর্শকের অসুবিধা হয়, তার জন্য ছিল এই কোরাস। তারা সঙ্গীতের দ্বারা নাটকের ফাঁকগুলি ভরাট করে দিত। এখানেও "সকলে"র সেই ভূমিকা। অলস, সুবিধা

অন্বেষণকারী প্রভৃতি ব্যক্তিকে তারা মিলিত কণ্ঠে ভৎস'না করে, আবার অসীম উৎসাহী, অধ্যবসায়ী "তবু"কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

চতুর্থ কবিতা "কাজের ব্যস্ততা''র সঙ্গে "কাজের লোক" কবিতাটির একটি পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য আছে বলে মনে হয়। "কাজের লোক" কবিতাটি শেষ হয়েছে "তবু" নামক ছেলেটির অঙ্ক কষার চিত্রে। "কাজের ব্যস্ততায়" লেখক আরও অনেক কাজের লোকের ছবি তুলে ধরলেন। এখানে কৃষক, দোকানী, মজুর, কামার, সেকরা, দর্জ্জি, হাকিম, মাষ্টার, ডাক্তার, নাবিক, সৈন্য, রাজা সকলে এক একটি পংক্তিতে নিজের নিজের গুণ বর্ণনা করেছে।— তারপর আসছে নারী কর্ম্মীরা। এরা ঝি, রাঁধুনী, ধাত্রী, গোয়ালিনী, মেছুনী, ধোপানী, ছোট মেয়ে, ছোট বৌ ও ছোট গিন্নী। কবিতাটির বিশেষত্বই হ'ল এর মধ্যেকার বাক্ সংযম। লেখক প্রত্যেকের মুখ দিয়ে এক একটি পংক্তি বলিয়েছেন। তিনজন করে পর পর এক এক পংক্তি বলে যাচ্ছে। কৃষক বলছে,

"ছোট একটি কৃষক আমি জমিতে দিই চাষ",

দোকানী বলছে,

"দোকান খুলে বেচা কেনা করি বারমাস"

মজুর বলছে,

"পেটের দায়ে খেটে খেটে হাড্ডি হল সার"

এরপর তিনজন একসঙ্গে বলছে,

"সবাই মোরা ব্যস্ত কাজে যে যার আপনার"।

এইটিই হ'ল কবিতার রিফ্রেন বা ধুয়া। প্রতি তিনজন আপন আপন পরিচয় দেবার পর একসঙ্গে এই পংক্তিটি বলছে। মনে হয়, বালক বালিকাদের দ্বারা অভিনয়ের উপযোগী করেই এটি রচিত হয়েছিল। বিভিন্ন পোষাক পরে পর পর এক একজন মঞ্চের এক পাশ দিয়ে প্রবেশ করে নিজ পেশার পরিচয় দিয়ে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—এ ছবিটি মনোরম। মঞ্চের উজ্জ্বল আলোকে বিভিন্ন বর্ণের পোষাকে সজ্জিত বালক বালিকারা বিলাতী ফ্যান্সি ড্রেস পার্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য এখানে যারা আত্মপরিচয় দিয়েছে, তাদের অনেকের পেশার চেহারা আজ বদলে গেছে। মাষ্টার আজ আর "পড়তে বসে ফাঁকি দিলে বিতিয়ে করি লাল" বলতে পারেন না।

বরঞ্চ তিনি ফাঁকি দিচ্ছেন কিনা তার দিকেই তাঁর ছাত্রের সজাগ দৃষ্টি। ঝি, রাঁধুনী মেলাই ভার—তার জন্য দৈনিক সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। মেছুনী আর বাড়ী বাড়ী গিয়ে রুই কাত্‌লা বেচে না। পশ্চিমবাংলায় একজন মৎস্য মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বাজারে সাধারণের প্রাপ্য মৎস্য দুর্লভ। বাড়ী বাড়ী এসে কেউ মৎস্য বিক্রয় করে যাবে, সে তো আজব দেশের কাহিনী আজ। তবুও মোটামুটি আজকের দিনেও এই পংক্তিগুলির থেকে কিছু আন্দাজ পাওয়া যায় বিভিন্ন পেশাধারীদের কাজের। কামার বলে,

"ছোট একটি কামার আমি গড়ি কাঁচি, ছুরি",

সেকরা বলে,

"সোনা রূপোর কাজে আমি দেখাই বাহাদুরী।"

যন্ত্রশিল্পের যুগ এসেছে। ভিলাই, রাউরকেলা, দুর্গাপুর শিল্প নগরী বললে ভুল হয়, যন্ত্র নগরীতে পরিণত হয়েছে। তবুও কি "ছোট একটি কামার" কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে আপন মনে কাঁচি ছুরি গড়ে চলেছে? সেই কথাই সেকরার বিষয়ে বলা যায়। ১৪ ক্যারেট সোনার গহনার যুগে এটা লেখা হয়নি সত্য কিন্তু আজ গহনায় সোনার পরিমাণ কমিয়ে দেবার নির্দেশ এসেছে বলেই এম, বি, সরকার বা গিনি ম্যানসনের দিকে না গিয়ে আধুনিকা গৃহিণীরা ছোটখাট দোকানের চেনাশোনা কারিগরকে ডেকে চুপি চুপি বলছেন, "২২ ক্যারেট দিয়েই নতুন চূড়টা গড়িয়ে দিও বাপু। কেউ যেন জানতে না পারে।" অর্ডার পেয়ে সে কি আজও কাণাগলির ভেতর ছোট্ট দোকানটিতে বসে ঠুকঠাক করে সোনারূপোর কাজ করে চলছে না? আর যাই হোক এরা সকলেই হাতের কাজ করে আত্মতৃপ্ত। ওইটেই হল লেখকের প্রচ্ছন্ন উপদেশ। যত ক্ষুদ্র কাজই হোক নিজের হাতে ক'র—তৃপ্তি পাবে, সময়েরও সদ্ব্যবহার হবে।

বাংলায় শিশু সাহিত্য প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল নীতিশিক্ষার ছদ্মবেশে—ডেভিড হেয়ার যখন মিশনারীদের সহযোগী স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন "নীতিকথা", "মনোরঞ্জনেতিহাস" ইত্যাদি। এ সব ছিল প্রত্যক্ষ উপদেশ কিন্তু তার বহুপূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে পাই "পঞ্চতন্ত্র", যাতে তিন অমনোযোগী রাজপুত্রকে গল্পের মাধ্যমে পণ্ডিত

বিষ্ণুশর্ম্মা নানা নীতিকথা শিক্ষা দিচ্ছেন। রাজপুত্ররা তাদের ঐশ্বর্য্যের চমক এবং বিলাসের প্রাচুর্য্য নিয়ে আজ চিরতরে অন্তর্হিত, কিন্তু আমরা, যারা আজকের দিনের জনসাধারণ, তাদের সন্তানদের মধ্যেও অধিকাংশই ঐ বসুশক্তি, উগ্রশক্তি, অনেকশক্তি নামক রাজপুত্রদের মতই চঞ্চলচিত্ত, পাঠবিমুখ কিন্তু অল্পবুদ্ধি নয়। প্রত্যক্ষভাবে উপদেশ দিতে গেলেই তাদের কিশোরচিত্ত বিদ্রোহ করে। এ কথা জানতেন শিশু কিশোরচিত্তের রাজা যোগীন্দ্রনাথ, তাই তিনি লিখলেন "খেলার গান"। এর পাঁচটি কবিতার মধ্যে তিনটিতেই ছদ্মবেশে আদর্শের কথা আছে।

এই সূত্রে পথের পাঁচালীর কথা মনে পড়ে। দুর্গা কোথা থেকে আশ শ্যাওড়ার ফল কুড়িয়ে এনে টিপে টিপে বীজ বার করে অপুকে বলে "আয় দিকি—দ্যাখ দিকি খেয়ে—মিষ্টি যেন গুড়।" ......অপু "খাইয়া মুখ একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—এট্টু এট্টু তেতো যে"
দিদি—

—তা এট্টু তেতো থাকবে না? তা থাক, কেমন মিষ্টি বল দিকি—কথা শেষ করিয়া দুর্গা খুব খুশির সহিত গোটা কতক পাকা ফল মুখের মধ্যে পুরিল।"

ওই তেতো মিষ্টি ফলের মতনই আস্বাদ এই কবিতাগুলির। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রবন্ধকার জোসেফ এডিসন বলেছিলেন,

"We consider the instructions as an implicit censure and the zeal which anyone shows for our good on such an occasion as a piece of presumption or impertinence:"

"আমা মনে করি, উপদেশ দেওয়া মানে পরোক্ষ ভর্ৎসনা করা। আর অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসাহাধিক্য দেখানোর মধ্যে একটু স্পর্ধা এবং ধৃষ্টতার গন্ধ আছে।"

অবশ্য তিনি একথা সাধারণভাবে সকলের জন্যই বলেছিলেন কিন্তু কিশোরদের সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। প্রত্যক্ষ উপদেশ দিতে গেলে তারা বলে "আমাদের বুদ্ধির প্রতি এমন কটাক্ষপাত কেন? আমরা কি ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝি না?" অথচ সেই উপদেশই উপকথার মাধ্যমে দিলে কি ফল হয়, সে সম্বন্ধেও এডিসন বলেছেন—

"The moral insinuates itself imperceptibly ; we are caught by surprise, and become wiser and better unawares:"

আমাদের অজানিতে উপদেশ আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে। জানতেও পারি না কেমন এবং কিভাবে আমরা শিক্ষা পেয়ে যাই।

যোগীন্দ্রনাথ জানতেন সে কথা। তাই এই অপ্রত্যক্ষ উপদেশের ব্যবস্থা। "দুর্গা"র কুড়োন আশশ্যাওড়া ফলের মতনই একটু একটু তেতো কিন্তু তবু এগুলি কি মিষ্টি!

ষষ্ঠ অধ্যায়

যোগীন্দ্র সাহিত্যে প্রাণিতত্ত্ব ও শিকার কাহিনী

সূচনা :—১৮১৪ সনে রাজা রামমোহন কলকাতায় বাস আরম্ভ করলে মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হ'ল। সাধারণভাবে ভারতবাসীর পক্ষে এ হ'ল মণিকাঞ্চনযোগ, কারণ ভারতপথিক রামমোহন ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তক ছিলেন আর মহাপ্রাণ ডেভিড হেয়ার ছিলেন ভারতহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। সুতরাং এঁদের বন্ধুত্ব বিশেষতঃ শিক্ষাজগতে এক নূতন যুগের সূচনা করল। ১৮১৬ সনে "আত্মীয়সভা"র এক অধিবেশনে হেয়ার উপস্থিত ছিলেন। সভাটি রামমোহন ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনার জন্য স্থাপন করেছিলেন কিন্তু সেদিন সভাভঙ্গের পর কিভাবে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার করা যায়, সে বিষয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হ'ল।

পরের বৎসরই হেয়ার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তৃতির জন্য মিশনারীদের সাহায্যে স্কুল বুক সোসাইটি নামে একটি সভা স্থাপন করলেন। স্কুল পাঠ্য পুস্তক রচনা করাই এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল। তার পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮১৮ সনে মহাত্মা হেয়ারের উদ্যোগে অনুরূপ আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'ল—তার নাম হল "স্কুল সোসাইটি"। এটির উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার ১৩৬টি স্কুল বা পাঠশালা পরিচালনা করা। স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর স্কুলবুক সোসাইটি এই পাঠশালাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ক পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে লাগলেন।

স্কুল বুক সোসাইটি ১৮২২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে জীবজন্ত বিষয়ক একটি বাংলা মাসিক পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ মাসিক পত্রে শিশুদের উপযোগী করে জন্তু জানোয়ারের বিবরণ প্রকাশিত হ'ত। "বাংলা সাময়িক পত্র" গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে এই মাসিক পুস্তকের এক এক সংখ্যায় এক একটি জন্তুর বিবরণ ও প্রথম পৃষ্ঠায় সেই জন্তুর কাঠ খোদাই চিত্র থাকত। কাঠ খোদাই কার্য্যে পারদর্শী পাদরী লসন্ ঐ চিত্রগুলি খোদাই করেছিলেন। জন্তুবিবরণীকে চিত্তাকর্ষক করবার জন্যই এই চিত্রের

সৃষ্টি। এর সঙ্গে থাকত সেই জন্তুর সম্বন্ধে কাহিনী। একদিকে থাকত ইংরেজী এবং আর একদিকে তার অনুবাদ। প্রথম ছয় সংখ্যায় যথাক্রমে সিংহ, ভালুক, হস্তী, গণ্ডার ও হিপপটেমাস, ব্যাঘ্র ও বিড়ালের বিবরণ ছিল। এ পত্রিকার প্রথম পর্য্যায়ের প্রকাশ ১৮২৭ সনে বন্ধ হ'ল। ১৮২৮ সনে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্কুলের ছাত্রদের পারিতোষিক পুস্তক হিসাবে এই ছটি সংখ্যাকে একত্র করে 'পশ্বাবলী' নামে প্রকাশ করলেন।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'পশ্বাবলী'র পরিচালনা করেছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়। তিনি সর্ব্বসমেত ১৬ সংখ্যা পশ্বাবলী বাংলা ও ইংরেজীতে প্রকাশ করেছিলেন। এই Animal Biography বা জন্তুজীবনীর প্রথম খণ্ড আট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এগুলিতে যথাক্রমে কুকুর, ঘোড়া, গাধা, ষাঁড়, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ও উটের বিবরণ ছিল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ও আট সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং সেগুলিতে নেকড়ে, চিতা, বানর, বীবর (The Beaver—একপ্রকার চতুষ্পদ সন্তরণপটু জন্তু), সীল, বাদুড়, খরগোস ও ইঁদুরের বর্ণনা ছিল।

রামচন্দ্রের পশ্বাবলীতে জন্তুটির চিত্রের নীচে একটি করে কবিতা থাকত।

রামচন্দ্র ১৮৪৪ সনে পক্ষীতত্ত্ব সম্বন্ধেও কতকগুলি সংখ্যা প্রকাশ করবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু প্রথম সংখ্যার পর আর কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। এরপর ১৮৫১ সনের শেষভাগে (কার্ত্তিক, ১২৫৮) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বাংলা সাময়িক পত্র" পুস্তকে বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকরে' ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৫১ সনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করেছেন। সেই বিজ্ঞাপনে বিবিধার্থ সংগ্রহকে বলা হয়েছে, "পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্প সাহিত্যোদ্যোতক মাসিক পত্র।" বিবিধার্থ সংগ্রহের প্রথম সংখ্যাতেই সচিত্র "হোমা পক্ষির বিবরণ" আছে। বিবিধার্থ সংগ্রহের সপ্তম পর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। পশুপক্ষিগণের অজস্র সচিত্র বিবরণ বিবিধার্থ সংগ্রহে আছে।

"জীবনস্মৃতি"তে রবীন্দ্রনাথও এই বিবিধার্থ সংগ্রহের সপ্রশংস উল্লেখ করে লিখেছেন :—

"বার বার করিয়া সেই বইখানি পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।"

বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রথম প্রকাশের বহুকাল পরে ১৮৮৩ সনের জানুয়ারী মাসে প্রমদাচরণ সেন একটি শিশুমাসিক প্রকাশ করেন—তার নাম 'সখা'। এই পত্রিকায় 'মাকড়সা' 'বানর' ইত্যাদি নামে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কতকগুলি জীবজন্তু বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয়।

তারপর ১৯০১ সনে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (যাঁর লেখনী নাম ছিল 'মেজদাদামহাশয়') 'জীবজন্তু' নাম দিয়ে প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে সচিত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেন। "শতাব্দীর শিশুসাহিত্য" পুস্তকে খগেন্দ্রনাথ মিত্র এই গ্রন্থের সম্বন্ধে লিখেছেন:—

"গ্রন্থে মেরুদণ্ডী প্রাণিগণের বর্ণনা করা হয় এবং প্রাণীটির প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হয় দেশীয় গল্পের সাহায্যে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যথার্থ বৈজ্ঞানিক, কোথাও কিম্বদন্তী বা জনসমাজে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত গাল গল্পের তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন নি।"

তাঁর উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্য 'জীবজন্তু' গ্রন্থে গরিলার বিষয়ে যা বলা হয়েছে, খগেনবাবু সেই অংশ উদ্ধৃত করেছেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকারও ১৯২৯ সনে প্রকাশিত 'বনে জঙ্গলে' নামক গ্রন্থে 'জীবজন্তু' থেকে আফ্রিকার সিংহ ও এক সাহেবের ভৃত্যের কাহিনী সঙ্কলন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর ভাষা সম্বন্ধে খগেনবাবু লিখেছেন:—

"যোগীন্দ্রনাথ যে পথ প্রদর্শন করেন, তিনিও সেই পথে অগ্রসর হয়ে 'জীবজন্তু' নামে প্রাণিবিদ্যাবিষয়ক সুন্দর গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন।" এ ক্ষেত্রে 'যোগীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত পথ' মানে হ'ল সহজ, সরল ভাষা। এর পূর্ব্বের সংস্কৃত ঘেঁষা যুক্তাক্ষরের জালে জটিল ভাষার দুর্গম পর্ব্বত থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যোগীন্দ্রনাথই তাঁর 'হাসি ও খেলা', 'ছবি ও গল্প' এবং যুগান্তকারী 'হাসিখুসি' প্রথম ভাগের সাহায্যে শিশু

সাহিত্যকে নামিয়ে এনেছিলেন প্রচলিত ভাষার সমতল ভূমিতে—এ নামা নিম্নাবতরণ নয়,

"যেমন করে ঝর্ণা নামে দুর্গম পর্ব্বতে"

এ তেমনি নূতন পথের সন্ধানে পথিকৃতের অভিযান। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু অনুকরণ করলেন যোগীন্দ্রনাথের ঘরোয়া ভাষা, আবার দ্বিজেন্দ্রনাথের গ্রন্থ থেকে যোগীন্দ্রনাথ কাহিনী সঙ্কলন করলেন তাঁর 'বনে জঙ্গলে'তে। এমনি করেই এক মশাল থেকে আর এক মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে চলেছে সাহিত্য পূজারীদের অলিম্পিক ক্রীড়ার দূরযাত্রা।

'জীবজন্তুর'র পর ১৯০৩ সনে প্রকাশিত 'সেকালের কথা' নামে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত আর একটি সচিত্র গ্রন্থের সন্ধান পাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে জীব জগৎ সম্বন্ধে বালক বালিকাদের জ্ঞানদান করাই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য ছিল। উপেন্দ্রকিশোর সহজ সরল ভাষায় বালক-বালিকার বোধগম্য করে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেকালের কথা প্রথমে মুকুলে প্রকাশিত হয়। পরে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করে সেটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছিল।

(ক)

প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক ও যোগীন্দ্রনাথ

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে শিশু সাহিত্য জগতে যোগীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে প্রথমে 'হাসি ও খেলা' বইটির প্রকাশের সঙ্গে। তারপর 'ছবি ও গল্প' এবং 'হাসিখুসি,' প্রথম ভাগ অল্পদিনের ব্যবধানেই প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুকুলে (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫) মুকুলিত হয় তাঁর অজস্র রচনা। কিন্তু প্রাণিতত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করেন অনেকদিন পরে। দুর্ভাগ্যবশত: 'পশুপক্ষী' নামে তাঁর রচিত পুস্তকটির প্রথম প্রকাশের তারিখ জানতে পারি নি। প্রাণিতত্ত্বমূলক অন্য দুখানি গ্রন্থ "ছোটদের চিড়িয়াখানা" এবং "জানোয়ারের কাণ্ড" একই বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৭ সনে প্রকাশিত হয়। যোগীন্দ্রনাথ রচিত আরও একটি প্রাণিবিদ্যাবিষয়ক পুস্তক দেখি, যার নাম থেকে বিষয়বস্তু অনুমান করা একান্তই কঠিন। এটি হল "নূতন ছবি"।

নূতন ছবি শুধু ছবির বই নয়; এতে পশ্বাবলীর মতনই কবিতা, চিত্র এবং বিবরণের সাহায্যে এক একটি জন্তুর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নূতন ছবিতে প্রত্যেক বামদিকের পৃষ্ঠায় একটি করে জন্তুসংক্রান্ত কবিতা এবং ডানদিকের পৃষ্ঠায় সেই জন্তুর ছবি এবং ছবির নীচে তার একটি করে ক্ষুদ্র বিবরণ পাই। প্রথমেই আছে শিম্পাঞ্জির কথা। কবিতাটি পূর্ব্বাপর উদ্ধৃত করছি।

শিম্পাঞ্জি

এঁরা বনমানুষের জাত,
পায়ের চেয়ে খানিক আরো
লম্বা এঁদের হাত
এঁরা বনমানুষের জাত।

থাকেন কাফ্রিভায়ার দেশ,
মনের সুখে ঘরকন্না
করেন এঁরা বেশ
থাকেন কাফ্রিভায়ার দেশ।

দেখতে মানুষেরই মত,
কেবল চোয়াল দুটা উঁচু,
নাকটা বেজায় নত
দেখতে মানুষেরই মত।

ঘটে বুদ্ধিও বেশ আছে,
রোদ বৃষ্টির ভয়ে এঁরা
কুঁড়ে বাঁধেন গাছে,
ঘটে বুদ্ধিও বেশ আছে।

এর পর একে একে এসেছে সিংহ, বাঘ, বিড়াল, বুলডগ, গ্রিজলি ভালুক, চমরী, বাইসন, গণ্ডার, হাতী, তিমি, সাপ ও কুমীরের গল্প।

রামচন্দ্রও তাঁর পশ্বাবলীতে জন্তুদের বিবরণের সঙ্গে কবিতা বিন্যস্ত করতেন। তার একটি এইরূপ:—

"সুশিষ্ট সুধীর গাদা পায় বহু ক্লেশ
বড় বড় বোঝা লয়ে ভ্রমে নানা দেশ ॥
গাদা করে মানবের নানা উপকার
নিষ্ঠুর মানব তারে করয়ে প্রহার ॥"

উদ্ধৃত কবিতা দুটির তুলনা করলে সহজেই দুটির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একটির ভাষা 'সুশিষ্ট', 'ক্লেশ', 'নিষ্ঠুর' ইত্যাদি গুরুগম্ভীর শব্দযুক্ত এবং বালকদের বোধগম্য হবার পক্ষে কিছু কঠিন। ভাষাও স্বচ্ছন্দ নয় এবং ছন্দও বিলম্বিত লয়ে অগ্রসর হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথের রচনায় ভাষা সহজ, সরল। সে আমাদের প্রতিদিনের ঘরোয়া ভাষা। নৃত্যপরা দ্রুতলয়ের ছন্দে এই সাবলীল ভাষা সহজেই মনের উপর তার অপরূপ প্রভাব বিস্তার করে। ছবিগুলি সঙ্গে থাকাতে বক্তব্য সহজ হয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু তা না থাকলেও তাঁর ছন্দের জাদুতে কিশোর পাঠকের মানসপটে ঐ বিশেষ জন্তুর একটি ছবি নিশ্চয়ই ফুটে উঠত।

আবার সবগুলি ছড়াতেই যে জন্তুটির বিবরণ আছে, তাও নয়। হাতীর কথাতে গদ্যে লেখা বিবরণটি থেকেই হাতীর বিষয় বোঝা যায়। সেই বিবরণের সঙ্গে কবিতাটি বালককে কিছু কৌতূহলের খোরাক দেয় মাত্র। নীচের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে যে কবিতাটি একেবারেই বর্ণনাত্মক নয়।

হাতী

হস্তী মশাই, হস্তী মশাই
কিসের এত রাগ ?
দেয়নি বুঝি হস্তিনী আজ
খাবার সমান ভাগ ?

তাইতে কিগো এমন করে
দাঁড়িয়ে আছ মানের ভরে ?
বুক ফেটে জল আসছে চোখে
মানছে না ক' বাগ !
হস্তী মশাই, হস্তী মশাই
কিসের এত রাগ ?

নাই বা গেলে তাহার কাছে
সারাটা বন পড়ে আছে,—
সাবাড় করো গোড়া থেকে
গাছের অগ্রভাগ!
হস্তী মশাই, হস্তী মশাই
কিসের এত রাগ?

এখানে ছন্দের ঝুমঝুমির ঝুন্‌ঝুন্‌ তালে তালে শিশুর মনে কৌতুক সৃষ্টি করা হয়েছে। মা, বাবার পরস্পরের উপর রাগ করে বাক্যালাপ বন্ধ করা তার কাছে একটি পরিচিত ব্যাপার। এ কবিতার নূতনত্বের মধ্যে এই যে, মা কখনও বাবাকে অভুক্ত রাখেন না। কিন্তু গল্পটা যে হাতীর। একটু বিশেষত্ব থাকবে তো! আর রূপকথার সুয়োরাণী, দুয়োরাণীর আমল থেকে তার পরিচিত সংসারে শিশু বা বালক মাকেই গোঁসাঘরে যেতে দেখেছে, বাবাকে নয় কিন্তু এ ব্যাপারে হাতী যে মানুষ নয়, সেই কথাই তার মনে হবে। তবুও ছড়ার মধ্যে একটু তথ্যের মিশেল আছে। হস্তিনী খাবার ভাগ না দিলেও হস্তীমশাইয়ের ভাবনা নাই, সারাটা বন তার আহার্য্যরূপে পড়ে আছে। এই পদ্য পাঠ করে বালক এ কথাই বোঝে যে হাতী নিরামিষাশী এবং বৃক্ষপত্রাদিই তার খাদ্য। অনুরূপ পদ্য সব জন্তুর বিষয়ই যোগীন্দ্রনাথ লিখেছেন। তার মধ্যে "বাঘের মাসী" উল্লেখযোগ্য। পদ্যটি এইরূপ :—

বিল্লিরাণী নেহাৎ তুমি
কেউ কেটা নও;
কোন বংশে জন্ম, সেটা
ভুলে কেন রও!
দিক টলমল্ যাহার দাপে,
হুঙ্কারে যার বিশ্ব কাঁপে,
যমের দোসর সেই যে বাঘা,
তাহার মাসী হও!
বিল্লিরাণী, নেহাৎ তুমি
কেউ কেটা নও।

আহা কি রূপ মরি মরি
ঠিক যেন গো বাঘেশ্বরী!
গড়ন-পেটন ধরণ ধারণ
কিছুতে কম নও;
বিল্লিরাণী তুমি যে গো
বাঘের মাসী হও!

'নূতন ছবি' বইটি পূর্ব্বাপর জন্তুবিবরণী। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের অন্য কোনও কোনও গ্রন্থেও অন্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পশু এবং পক্ষীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এইরূপ একটি গ্রন্থ 'ছবি ও গল্প' ও আর একটি গ্রন্থ 'হাসি ও খেলা'। 'ছবি ও গল্পে' আশ্চর্য্য পরিত্রাণ, ঘোর নিষ্ঠুরতা, ইত্যাদি গম্ভীর বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ, রামধন, ইত্যাদি হাসির গল্প আছে। এগুলি সবই যোগীন্দ্রনাথের স্বরচিত। এর সঙ্গে কতকগুলি গল্প ও কবিতার সঙ্কলনও আছে। আবার এই বইয়ে যোগীন্দ্রনাথের স্বরচিত দুটি সচিত্র রচনা পাই—ইতর প্রাণীর কথা, ও সাপের গল্প। ইতর প্রাণীর কথায় লেখক সরসভাষায় পিপীলিকা ও মাকড়সার বিষয় বর্ণনা করেছেন। আর সাপের গল্পে শুধু কল্পিত গল্পই নাই, লেখক চিত্র ও বর্ণনার সাহায্যে গোখুরা, র‍্যাটেল, পাহাড়ে বোড়া ও সামুদ্রিক মহাসর্পের বিষয় বলেছেন। "হাসি ও খেলা"তে 'ভাইবোন', 'অতুলের গাড়ী' ইত্যাদি অন্যান্য কবিতার সঙ্গে 'শেয়াল', 'কেরাণী পাখী', 'পাহাড়ে-সাপ', 'ময়না', 'কেউটে সাপ', 'জেব্রা', 'গরিলা' ইত্যাদির বিষয় ছবি ও গল্পের সাহায্যে মনোরম বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এর ভেতর 'কেরাণী পাখী' প্রমদাচরণ সেনের এবং জেব্রা রামব্রহ্ম সান্যালের রচনা থেকে গৃহীত হয়েছে। অন্যান্য যে সব বিষয়গুলি যোগীন্দ্রনাথ স্বয়ং রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে 'শেয়াল'এর গল্পটি আমাদের প্রথম পর্য্যায়ের 'পশ্বাবলী'র একটি কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। পশ্বাবলীর কাহিনীটি হল :—

শৃগালের ক্রোড়পত্র

"জেলা নদিয়ার মাটিয়ারী পরগণার সাহাবাদপুর গ্রামে শ্রীপলিন বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি মুসলমান ছিল, সে প্রতিদিন রোজা করিত, তাহাতে ঐ গ্রামের উত্তর দিকে গিয়া পাক করিয়া সন্ধ্যাকালে আহার করিত,

শৃগালদিগকেও অন্ন দিত, ঐ অন্নাশাতে অনেক শৃগাল সেই স্থানে একত্র হইয়াছিল, কিন্তু যখন বিশ্বাস পাকারম্ভ করিত, তখন সকল শৃগাল নির্ভয়ে অশব্দে বসিয়া থাকিত, পাক সমাপ্ত হইলে সকলকে ডাকিয়া নিরূপিত খাপরায় তাহারদিগকে অন্ন দিত, তাহাতে শৃগালেরা আপন ২ বাচ্চার সহিত গতায়াত করিত এবং তাহারদিগকে ভাগ ২ করিয়া দিলে যাবৎ বিশ্বাসের আজ্ঞা না পায় তাবৎ ঐ অন্নের নিকটে বসিয়া থাকে, আজ্ঞা পাইলে স্ব স্ব ভাগ মাত্র খায়.

এক দিবস ঐ বিশ্বাসের ২ বৎসর বয়স্কা এক পৌত্রীর মৃত্যু হইলে বিশ্বাস শোকার্ত্ত হইয়া অনেক রোদন করিয়া সে দিবস আহার না করিয়া কোন লোক দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইয়া শৃগালেরদিগকে নিয়মানুসারে দিল, তাহাতে প্রভুর দুঃখে কোন শৃগাল সে দিন অন্ন খাইল না.

এবং সেই কন্যার গোর সেই স্থানে দিলে শৃগালেরা অতিশয় মাংসাশী হইয়াও অন্য ২ বালকের গোরের মত তাহার কোনও ব্যাঘাত করিল না, বরং ঐ গোরের রক্ষা করিল, ইহাতে "হে মনুষ্যেরা, শৃগালের প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়া তোমাদিগেরও কৃতজ্ঞ হওরা উচিত."

রচনাটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার পূর্ব্বে এর বিরাম চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত দাড়ির বদলে 'ফুলষ্টপ' দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের অন্তে একটি করে 'ফুটকী বা ফুলষ্টপ' আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে এগুলির রচয়িতা বিদেশী। পাদরী লসন এই সব কাহিনী লিখেছিলেন, বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন পিয়ার্স। "হে মনুষ্যেরা" সম্বোধন থেকে এবং রচনার বিষয় থেকেও মনে হয়, পাদরি লসন তাঁর পেশা না ভুলতে পেরে এখানে উপদেশ দিয়েছেন এবং রচনাটি ঠিক শিশুদের জন্য নয়। বরং পাঠককে বয়স্ক বলেই কল্পনা করা হয়েছে। আরও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে রচনাটির। 'পলিন বিশ্বাস' নামটি যে মুসলমান সম্প্রদায়ের না হয়ে খৃষ্টান সম্প্রদায়েরই উপযুক্ত, সে জ্ঞান এই দুটি বিদেশী পণ্ডিতের ছিল না। ভাষাও আড়ষ্ট। 'অন্নাশা' 'পাকারম্ভ' ইত্যাদি সন্ধি এবং 'তাহারদিগকে' ও 'শৃগালেরদিগকে' আমাদের কানে বড়ই অদ্ভুত শোনায়। তারপর ২ সংখ্যাটি কোথাও বা সত্য সত্যই সংখ্যা বাচক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও বা পূর্ব্বশব্দের দ্বিত্ব বোঝাবার জন্য (যথা, আপন ২=আপন আপন) ব্যবহার করা হয়েছে।

যোগীন্দ্রনাথ লিখেছেন অনেক পরে। তাঁর শৃগালের কাহিনীর নাম 'শেয়াল', রচনার ভাষাও অনুরূপ। শিশুর মতই তার সাহিত্যের ভাষাও সরল, স্বচ্ছন্দ হওয়া উচিত এই কথা স্মরণ রেখেই তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁর শেয়ালের গল্প লেখবার সময় তাঁর মনশ্চক্ষুর সামনে ছিল শিশু পাঠকরা। তাই তিনি ঠিক গল্প লেখেননি। যেন শিশুদের আসরে বসে দাদু হয়ে এইভাবে গল্প বলেছেন :—

শেয়াল

"ঐ দেখ মাচার উপর কয়েকটী মুরগী বসিয়া আছে আর তাহাদিগকে দেখিয়া শেয়ালভায়ার জিব দিয়া জল সরিতেছে ! কিন্তু উপায় কি ! শেয়ালের তো আর উড়িবার শক্তি নাই ! তাই চাহিয়া চাহিয়া যখন ঘাড় ব্যথা করিতে লাগিল, তখন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া পড়িল। যাইবার সময় শেয়াল ভাবিল, মুরগীগুলির কি অন্যায় ! একটীও নীচে এল না ! আমি না খেয়ে রইলুম ! এটা কি ভদ্রতা হ'ল ? ছি: !"

সমস্ত অনুচ্ছেদটির ভাষা সহজ, সরল এবং প্রত্যেক বাক্যের শেষে একটি করে বিস্ময়সূচক চিহ্নের ব্যবহার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে বাংলায় Punctuation এর ইতিমধ্যে অনেক উন্নতি হয়েছে।

'বিদ্যাসাগর চরিত' এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা লেখায় সর্ব্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ছেদচিহ্নগুলি প্রচলিত করেন। ......বাস্তবিক একাকার সমভূম বাঙ্গলা রচনার মধ্যে এই ছেদ আনয়ন একটা নবযুগের প্রবর্ত্তন। এতদ্বারা যাহা জড় ছিল, তাহা গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।" (সাধনা, ভাদ্র ১৩০২ থেকে সাহিত্য সাধক চরিতমালা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। যে কারণেই হোক, রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর জন্মবার্ষিক সংস্করণ থেকে এই অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে।)

(খ)

"শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ" গ্রন্থে শ্রীমতী আশা গঙ্গোপাধ্যায় পশ্বাবলীর গল্পগুলির বিষয় লিখেছেন :—

"এই সব গল্প হইতে এই মূল বক্তব্যই প্রকটিত হয় যে পশুদের মধ্যেও অনেকগুলি আশ্চর্য্য গুণের সমাবেশ রহিয়াছে এবং তাহাদের তুচ্ছ করা বা তাহাদের উপর উৎপীড়ন করা কোনও মতেই উচিত নহে। ……এই গল্পগুলিতে একাধারে শিক্ষা ও আনন্দের সমাবেশ হইয়াছে।" এই শিক্ষা ও আনন্দ এবং পশুর মধ্যে সদ্‌গুণের পরিচয় মূলক পুস্তক যোগীন্দ্রনাথের "ছোটদের চিড়িয়াখানা।"

প্রাণিবিদ্যা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে বইখানিতে প্রায় প্রত্যেক জন্তুর সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক গল্প বলা হয়েছে। বরঞ্চ বিশ্লেষণ করলে হয়তো পৃথিবীর তিন ভাগ জল ও একভাগ স্থলের মতই তিনভাগ গল্প ও একভাগ জীববিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়া যাবে। যথা বানরকে বনমানুষ, হনুমান, মর্কট বা বাঁদর এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে গরিলা নামে বনমানুষের সম্বন্ধে দুটি গল্প বলা হয়েছে। তার একটি হ'ল :— "মাঝে মাঝে গরিলার অনেক ভাল গুণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। একবার কয়েকজন শিকারী গরিলা মারতে গিয়ে এমন এক ব্যাপার দেখেছিলেন যাতে তাঁরা স্তম্ভিত না হয়ে পারেন নি ! একটা খুব বুড়ো গরিলা কোনমতে পালাতে পারছেনা দেখে আর একটি জোয়ান গরিলা ছুটে এসে তাকে কাঁধে করে নিয়ে বনের আড়ালে সরে পড়ল। তাঁরা ইচ্ছা করলেই দুটোকেই শেষ করতে পারতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁদের হাত উঠলো না।"

এরপর গরিলার প্রতিহিংসার কাহিনী আছে। একটি স্ত্রী গরিলাকে এক গ্রামের মোড়ল দুর্ম্মতিবশত: দলবল জুটিয়ে মেরে ফেলে এবং তার প্রতিশোধ হিসাবে পুরুষ গরিলাটি গ্রামে ঢুকে প্রত্যেক রাত্রে মোড়ল ও তার সঙ্গীদের এক এক করে কিভাবে হত্যা করে, এটি তারই কাহিনী। পশুজনোচিত নিষ্ঠুরতা ও প্রতিহিংসাবৃত্তির সম্বন্ধে তো সকলেই জানেন। এ কাহিনীটিতে কিন্তু শুধু গরিলার নিষ্ঠুরতার কথাই নাই। গল্পের উপসংহারে মাত্র দুটি বাক্যে লেখক ক্ষুদ্র পাঠকদের মনকে গরিলা সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল করে তুলেছেন।

"দিনের বেলা কিন্তু সে স্ত্রীর মৃতদেহ ছেড়ে এক পাও নড়ত না। সেখানে বসে যখন সে বুক চাপড়ে মনের দু:খ জানাত, তখন নিষ্ঠুর শিকারীদেরও চোখে জল আসত।"

পশুর মধ্যেও স্নেহ প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি সদ্‌গুণ আছে, এ গল্পগুলি যেন তারই প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে কিন্তু বলবার অনবদ্য ভঙ্গীতে গল্পের থেকে উপদেশের গন্ধ লোপ পেয়েছে।

এরপর বানর বংশীয় বিভিন্ন প্রাণীর সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী দেখতে পাই। এক শিম্পাঞ্জি কেমন শিক্ষার গুণে টেবিল চেয়ারে বসা থেকে আরম্ভ করে ছবি আঁকা পর্য্যন্ত সব শিখেছিল, এরপর সেই কাহিনী আছে। আবার বানরজাতীয় বিভিন্ন প্রাণীর দুষ্টবুদ্ধির গল্পও আছে। ওরাং উটানের গল্প বলতে গিয়ে যোগীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ—

"একবার একজন ডাক্তারকে তাঁর পোষা ওরাংএর হাতে খুব জব্দ হতে হ'য়েছিল। সেই ডাক্তার এক হাসপাতালে মড়া কেটে পরীক্ষা করতেন। ওরাংটা প্রায়ই তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখত। দেখতে দেখতে একদিন তার মনে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপল। সেদিন ডাক্তার যেই ঘরে ঢুকেছেন, অমনি সে তাঁকে পিছমোড়া ক'রে ধরে টেবিলের উপর ফেললে এবং অস্ত্র নিয়ে তাঁকে কাট্‌বার উপক্রম করলে। ডাক্তার ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। তখন লোকজন ছুটে এসে তাঁকে বাঁচাল।"

এখানে শুধু গল্প নয়, গল্প বলবার ভঙ্গীটিও লক্ষণীয়।

"টেবিলের উপর ফেললে," "কাটবার উপক্রম করলে" এ একেবারে খাস মজলিসী ভাষা। মনে হয় যে মাঝখান থেকে কালিকলম কাগজ ছাপাখানা দপ্তরী সবকিছু এবং সকলের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে! ইজিচেয়ারে বসে দাদু তাঁর সহজ সরল ভাষায় গল্প বলে চলেছেন। এরপর আছে সেই হনুমানের গল্প যার খাবার কাকে খেয়ে যেত এবং যে একদিন মড়ার মতন পড়ে থেকে সেই কাক ধরেছিল। তারপর আসছে একে একে একদল হনুমানের কাহিনী যারা এক কুকুরের উৎপাতে তরিতরকারী ফলপাকুড় খেতে না পেরে কুকুরটাকে চ্যাংদোলা করে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়; আর সেই ভদ্রলোকের পোষা বাঁদরের শয়তানীর গল্প যে এক পাদরির পিছন পিছন গির্জ্জায় ঢুকে অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাঁর বক্তৃতা নকল করে লোককে হাসিয়ে পাদরিকে রাগিয়ে দিয়েছিল। যোগীন্দ্রনাথের আমলে গল্পের মাধ্যমে উপদেশ দেবার রীতি ছিল কিন্তু এ সব গল্প উপদেশের দেশের নয়, বরঞ্চ রসগোল্লা সন্দেশের দেশের—সেই রকমই মিষ্টি। উপদেশ যদি বা

থাকে, তা নিতান্তই অপ্রত্যক্ষ। অনেক ভেবেচিন্তে তা বুঝতে হয়। হয়তো এসব গল্পে লেখক বলতে চেয়েছেন যে "জন্তু, জন্তু বলে কাকে অবহেলা কর ? উপস্থিত বুদ্ধি, দুষ্ট বুদ্ধি আর শয়তানীতে, ভালবাসায়, সহানুভূতিতে ওরা কারো চেয়ে কম যায় না।"

ছোটদের চিড়িয়াখানায় শুধু বানরের কথাই নাই। চিড়িয়াখানায় তো শুধু বানর থাকে না। তাই যোগীন্দ্রনাথ বইখানিতে আরও নানারকম জানোয়ারের কথা লিখে তাদের এই কয় ভাগে ভাগ করলেন:—বানর, মাংসাশী জন্তু, খুরওয়ালা জন্তু, তিমি ও ক্যাঙ্গারু। মাংসাশী জন্তুর আবার উপশ্রেণী হ'ল বিড়াল-বংশ ও কুকুর-বংশ, খুরওয়ালা জন্তুর উপশ্রেণী হিসাবে আছে গো-বংশ, উট-বংশ, ও ঘোটক-বংশের কথা। কিন্তু শুধু নীরস বর্ণনাই নয়. সঙ্গে সঙ্গে ঝরেছে গল্পের ফুলঝুরি। তাই পাতায় পাতায় দেখি নেকড়ে পালিত শিশুর গল্প থেকে আরম্ভ করে কুমীর নিয়ে মহিষে মহিষে লোফালুফির কথা। এক একটি কাহিনীর শুধু বিষয়বস্তুই নয়, নামগুলিও সমান কৌতূহলোদ্দীপক। একটি গল্পের নাম হ'ল—কলার বদলে কলাটি।

গল্পটি হল:—"একদল শূয়োর রোজ রোজ রাত্রে এসে গাছপালা নষ্ট করে দেখে, একটি ভদ্রলোকের ভয়ানক রাগ হয়। তিনি পায়ের দাগ খুঁজে খুঁজে শূয়োরের আসা-যাওয়ার পথ বার করলেন। তারপর খুব শক্ত দড়িতে কতকগুলো বড় বড় বঁড়শী ঝুলিয়ে তাতে পাকা কলা গেঁথে রাখলেন। ফল হ'ল চমৎকার। রাত্রে এক শূয়োর এসে একটা কলাতে যেই কামড় বসিয়েছে অমনি বঁড়শীতে তার ঠোঁট এফোঁড় ওফোঁড়। আর অমনি তার চেঁচানিতে পাড়াশুদ্ধ জড়। সে যে দড়ি ছিঁড়ে পালাবে, সে উপায়ও ছিল না। কেন না, টানাটানি করতে গেলেই বঁড়শী আরও বিঁধে যায় আর জ্বালাও দশগুণ বেড়ে যায়। সেদিনের শূয়োরের যা দশা হ'ল তা আর কি বলব। মুখের কলাটা আগেই পড়ে গিয়েছিল! কাজেই কলার বদলে তার ভাগে শুধু 'কলাটি'।"

এইরকমই আর একটি গল্পের নাম গাধা কি একেবারেই 'গাধা' ?

প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষাদান করবার জন্য বইখানি অপূর্ব্ব। জন্তুদের সম্বন্ধে কিশোরদের কৌতূহল স্বভাবতঃই সজাগ। ছবি ও গল্পের সাহায্যে সেই কৌতূহলকে আরও একটু উদ্দীপ্ত করে মাঝে মাঝে তথ্য

পরিবেষণ করা হ'য়েছে। বালক নিজের অজান্তে শিখে ফেলেছে অনেক কথা। যে যুগে স্কুল থেকেই প্রাণিতত্ত্বের শিক্ষা দেওয়া হ'ত না, শুধু সেই যুগেই নয়, আজকের দিনেও বিদ্যালয়ে তথ্যকণ্টকিত প্রাণিবিদ্যার যান্ত্রিক শিক্ষা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে এ বইখানি হাতে পেলে কিশোর পাঠক একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ পাবে, তাতে সন্দেহ নাই।

(গ)

অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ তার সভ্যতা গড়ে তুলল আর সেই সভ্যতার রথ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে তাকে নিয়ে এল উন্নতির চরম শিখরে অথচ পশু পড়ে রইল তার আদিম জগতে গহন অরণ্যের ঘন গাছপালার ছায়া তিমিরে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :—

"মাঝে মাঝে মানুষ অরণ্যে যায় শিকারের জন্য…বন্য পশুকে শিকার করতে তার আনন্দ, তার বিলাস…তার শক্তির পরিচয়…বন্য পশুর মাংস তার খাদ্য…তার মৃতদেহের চামড়া, হাড়, শিং চর্ব্বি তার ব্যবসার পণ্য…… মানুষের সঙ্গে অরণ্যচারী এই সব হিংস্র পশুদের একটি মাত্র সম্বন্ধ…সে হলো শত্রুতার সম্বন্ধ…অরণ্যের হিংস্র পশুদের মানুষ যমের মতন ভয় করে…পশুরাও ঠিক তেমনি ভয় করে মানুষকে…"

বন্য পশুকে দেখলে মানুষ ভয়ে পালায়, না হয় তাকে হত্যা করে… বন্যপশুও মানুষকে দেখলে হয় ভয়ে পালায়, না হয় তাকে হত্যা করে…হাজার হাজার বছর ধরে বনের পশু আর সভ্য মানুষের মধ্যে এই বিভীষিকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে…মানুষের হাতে আছে তীর, ধনুক… পশুর দেহে আছে অমিত অন্ধ শক্তি…"

পশু আর মানুষের এই বিচিত্র সম্পর্কের কাহিনী নিয়ে যোগীন্দ্রনাথ লিখলেন "বনেজঙ্গলে"।

এতে যে মানুষের পশু শিকার কাহিনীই শুধু আছে তাই নয়—বাঘে কুমীরে, ফাঁদ পাতিয়া বাঘ ধরা, নাগপাশে বাঘ ধরা, নেকড়ে পালিত শিশু প্রভৃতি নানা কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও যোগীন্দ্রনাথ শুধু নিজের রচনার উপর নির্ভর করেন নি।

কথা ও কাহিনীতে ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া বলেছিল যে দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা মেটানোর পক্ষে তার একার শক্তি যথেষ্ট না হতে পারে কিন্তু

"আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে,
তোমরা চাহিলে সবে, এ পাত্র অক্ষয় হবে
ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা,
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।"

সকলেই জানেন কিশোরদের গল্প শোনা বা পড়ার ক্ষুধা ঐ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার মতনই। বরঞ্চ পেটের ক্ষুধা "দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা" হলেও একদিন না একদিন সে ক্ষুধা মেটে। মনের ক্ষুধা কিন্তু অত সহজে মিটতে চায় না। তাই যোগীন্দ্রনাথ তাঁর ভিক্ষার ঝুলিতে নানা লেখকের লেখা থেকে মুষ্টিভিক্ষা নিলেন এবং সেই সঙ্গে নানাজনের লেখা এবং বলা শিকার কাহিনীতে নিজের ভাষায় নিজের রচনা সংযোগ করে লিখলেন এই বনেজঙ্গলে। যাঁদের লেখা তাঁর এই গ্রন্থটিতে আছে, তার মধ্যে পাই প্রমদারঞ্জন রায় এবং কুলদারঞ্জন রায় দুই শিশুসাহিত্যিক ভ্রাতার রচনা ; তাছাড়া হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির লেখা সরস কাহিনী।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু রচিত যে শিকার কাহিনীটি বনেজঙ্গলেতে পাই, সেটি তাঁর "জীবজন্তু" নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত হ'য়েছে। তবু একথা নিশ্চয় বলা যায় যে বনেজঙ্গলের মত শিকার কাহিনী পূর্ব্বে বেশী রচিত হয়নি। এ গ্রন্থের কিছু বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে 'প্রদীপ', 'সন্দেশ', 'সখা', 'মুকুল' ইত্যাদি সে যুগের বালকপাঠ্য মাসিক পত্রিকা থেকে। এমন কি "শুধু হাতে চিতা শিকার" নামক একটি কাহিনী "প্রবাসী" থেকে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড ভাবে কিশোরপাঠ্য এবং বয়স্কপাঠ্য সব শ্রেণীর পত্রিকাতে এ ধরণের কিছু কিছু কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। এর ফলে এই কথাই মনে হয় যে শিকারকাহিনী শুধু কিশোরপাঠ্য নয়। শিকার অভিযান তো বয়স্কদেরই একচেটিয়া। দুর্গম অরণ্যে যেখানে হাজার হাজার বৎসরের পুরনো জীবন তার অন্ধ সংস্কার ও প্রবৃত্তি নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে অনধিকার প্রবেশকারী আধুনিক সভ্য মানুষ কখনও শিকারীর বেশে, কখনও পর্য্যটকের কৌতূহল নিয়ে, কখনও বা উদ্ভিদতত্ত্ববিদের গুরুদায়িত্ব নিয়ে উঁকি দিয়েছে। এক ঝলক মাত্র সে জীবন দেখেছে ; দেখেছে লতাগুল্মে মহীরুহে জড়াজড়ি

করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে দিনের নীরব, নিস্পন্দ আর রাত্রের সচকিত, কোলাহলমুখরিত জীবজগতের দিকে তাকিয়ে। সেই এক ঝলক দেখেই সে কৌতূহলে উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়েছে। সেই কৌতূহল, উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের কাহিনী তাঁর অনবদ্য ভাষায় পরিবেষণ করেছেন যোগীন্দ্রনাথ। মনে পড়ছে একটি বই তাঁর কাছে দেখেছিলাম—তার নাম ছিল Man-eaters of Tsavo। সঠিক জানিনা, অনুমান হয় যে আফ্রিকার শিকারকাহিনীগুলি ঐ বইটি থেকেই গৃহীত হয়েছে। আবার বনেজঙ্গলের ৭৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে ঐ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কাহিনীটি কোন এক ইংরেজ শিকারীর "ভারতবর্ষে বাঘ শিকার" নামক বই থেকে নেওয়া হয়েছে। রমণীর বিক্রম নামে "সখা ও মুকুল" থেকে যে কাহিনীটি গৃহীত হয়েছে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত পাঠ করলে জানা যায় যে ওটি তাঁর পিতামহীর জীবনের সত্য ঘটনা। আবার শিকারী না হয়েও যোগীন্দ্রনাথ অনেক শিকারকাহিনী শুনেছেন এবং প্রবীণ সাহিত্যিকের ধর্ম্ম অনুসারে নিজ অনুভূতির রসে সেই বিষয়বস্তুকে জীর্ণ করে নূতনরূপে তাকে পরিবেষণ করেছেন। তাঁর নিজের রচিত কাহিনীগুলির মধ্যে একটি হ'ল মহেশ সর্দ্দার। প্রকৃতপক্ষে "মহেশ সর্দ্দার" শিরোনামায় তিনটি গল্প বলা হয়েছে।

সুন্দরবনের কোন এক জমিদারের মহেশ সর্দ্দার নামে এক অসীম সাহসী প্রজা কিরূপে বিভিন্ন উপায়ে বাঘ শিকার করত, ঠেঙিয়ে বাঘ মারা, জাগিয়ে বাঘ মারা এবং কুপিয়ে বাঘ মারা নামক তিনটি উপকাহিনীর মধ্যে দিয়ে লেখক তা কিশোর পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন। "জাগিয়ে বাঘ মারা" গল্পটির নাম শুনলেই বোঝা যায় যে বাঘের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে বাঘ শিকারে কৃতসঙ্কল্প হত যে সব মানুষ, তারাও বাঘশিকারের সময় কতকগুলি নৈতিক নিয়ম মেনে চলত। ধর্ম্মযুদ্ধের যে সব নিয়ম আজকের মানুষ পরস্পরকে আক্রমণ করবার সময়ও মানে না, সে সব নিয়ম সেদিনের সরল, অশিক্ষিত, তথাকথিত জংলী মানুষ বন্য পশুর সঙ্গে যুদ্ধের বেলা মেনে চলত। এ নিয়মের মধ্যে একটি হ'ল অসতর্ক শত্রুকে কখনও আক্রমণ করবে না। দ্বিতীয় আর তৃতীয় উপকাহিনী অর্থাৎ "জাগিয়ে বাঘ মারা" এবং "কুপিয়ে বাঘ মারা" এ দুটি একটি কিশোরের জবানীতে বলা হয়েছে বলে এটি কিশোরদের নিকট আরও চিত্তাকর্ষক বোধ হওয়া স্বাভাবিক। প্রথম

উপকাহিনী "ঠেঙিয়ে বাঘ মারা"তে মহেশ সর্দ্দারের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করানর ভূমিকাতে লেখক নিজেই অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রথম অনুচ্ছেদটি এইরূপ :—

"বেশীদিনের কথা নয়, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে, কেহ সুন্দরবনে চাকুরী করতে গেলে, লোকে তাঁহাকে বিস্ময় মিশ্রিত সম্মানের চক্ষে দেখিত।

অসাধারণ শারীরিক বল ও সাহস না থাকিলে, কেহই সুন্দরবনে যাইতে রাজী হইত না। চতুর্দ্দিক জঙ্গলে পূর্ণ। জমিদারের কাছারি বাড়ীও তেমন নিরাপদ স্থান নহে; কখন কাহাকে বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হয়, কে বলিতে পারে! দিবসে লোকজনের গোলযোগ এবং কাজকর্ম্মের ব্যস্ততা, কিন্তু রাত্রে প্রাণটা যেন হাতে লইয়া বসিয়া থাকিতে হইত। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আহারাদি সারিয়া যে যাহার গৃহে আশ্রয় লইত; সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর ঘরের বাহির হয় কাহার সাধ্য! অন্ধকার একটু ঘনীভূত হইলেই, অমনি ঘন ঘন ভীষণ গর্জ্জন। সেই গর্জ্জন কখন দূরে, কখন নিকটে, কখনও বা কাছারি-বাড়ীর আঙিনায়। অতি সাহসী ব্যক্তিও ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িত।"

একটু লক্ষ্য করলেই "ছোটদের চিড়িয়াখানা"র ভাষার সঙ্গে এ ভাষার পার্থক্য বোঝা যায়। পূর্ব্বেই বলেছি যে ছোটদের চিড়িয়াখানার ভাষা মজলিশি ভাষা, নাতিনাতনি পরিবৃত দাদুর সান্ধ্য আসরের ভাষা—বালক বালিকাদের বোধগম্য করে লেখা—ধার আছে, ভার কম। বনে জঙ্গলের ভাষা সাহিত্যের ভাষা, সাধু ভাষা কিন্তু সন্ধি সমাস আর কৃৎ প্রত্যয় তদ্ধিত প্রত্যয়ের জটিল জালে আবদ্ধ শ্বাসরোধকারী পণ্ডিতী ভাষা নয়—লালিত্যপূর্ণ সুমধুর ভাষা, যা পাঠ করে কিশোর পাঠকরা শুধু জঙ্গলে অভিযানের রোমাঞ্চ অনুভব করবে না, শুদ্ধ, সাধু অথচ সরল, সাবলীল ভাষায় রচনা করতেও শিখবে।

'সন্দেশ', 'প্রদীপ' ইত্যাদি শিশুমাসিক থেকে যে সব সুন্দরবনের গল্প বনে জঙ্গলেতে সন্নিবেশিত হয়েছে, তার মধ্যে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক অথচ সত্য কাহিনী আছে। মানুষ নানা প্রয়োজনে বনের গাছ কেটে এককালে যেখানে নিবিড় অরণ্য ছিল, সেখানে বসতি স্থাপন করেছে কিন্তু সুন্দরবন তার বিশাল বক্ষে অতল রহস্য নিয়ে আজও পশ্চিমবাংলার সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ব্ব পাকিস্থানে তার যে অংশ পড়ে, তা ক্রমেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে দেশের জ্বালানী কাঠের প্রয়োজনে। পাকিস্তানী সুন্দরবনের

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (রয়্যাল পাকিস্তানী টাইগার ?) বিনা পাসপোর্টে সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবাংলার সুন্দরবনে এসে প্রবেশ করছে আর জীবিকার প্রয়োজনেই যে সব দরিদ্র গ্রামবাসী ঐ বনাঞ্চলে থেকে গেছে, তাদের ঘাড় মটকাচ্ছে। ৬ই ভাদ্র, ১৩৭১ (ইংরাজী ২২শে আগষ্ট, ১৯৬৪) সালের "দেশ" পত্রিকায় শ্রী বিশ্বনাথ বসু রচিত "সুন্দরবনে বাঘ শিকার" প্রবন্ধটি পাঠ করে সুন্দরবন আজও কি বিভীষিকা ও রোমাঞ্চ নিয়ে সগৌরবে বিরাজ করছে, তার কাহিনী জানতে পারি। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকায় এখনও ১৬ শত বর্গমাইল বনাঞ্চল আছে। সরকারী হিসাব অনুসারে গত কয়েক বৎসরে (অর্থাৎ ৬০ সাল থেকে ৬৪ সনের মধ্যে) ১৩৭ জন লোক বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে। ভয়াবহ সুন্দরবন। তাই বিশ্বনাথ বাবু লিখেছেন : "এই সেই কুখ্যাত বন যার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দূরবর্ত্তী সমুদ্রের গর্জ্জন, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরধ্বনি, বিহঙ্গের কাকলী—কোন কিছুই যেন অন্তরের গভীরে কবিত্বের উচ্ছ্বাস জাগায় না। বাংলাদেশের মাটির মানুষ এখানকার মাটির স্পর্শে আনন্দ পায় না, স্বস্তি পায় না। অভিশপ্ত এই বন, তাই বুঝি এর বুকে রক্তের তৃষা। এই রহস্যময়ী বনভূমির গভীরে কারা যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিচরণ করে নরমাংসের লোভে।" এটি সত্যকার শিকার কাহিনী। সুন্দরবনের "চামটা" ব্লকের কুখ্যাত অঞ্চলে বাঘ শিঝার করতে গিয়ে মার্চ, ১৯৬৪ সনে একদল শিকারী কিভাবে মানুষখেকোর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হন, এমন কি, তার মধ্যে একজন মৃত্যুবরণ করতেও বাধ্য হন, এটি তারই কাহিনী। সুতরাং এ কাহিনীতে শুধু ভয়াবহতাই আছে ; অবশ্য সেই সঙ্গে আছে মানুষ-খেকো বাঘের দৌরাত্ম্য দূর করবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব (suggestion)। বনেজঙ্গলেতে এই সুন্দরবনের যে সব কাহিনী আছে, তা কিন্তু শুধু বিভীষিকা-তেই পূর্ণ নয়। বোধ হয় কাহিনীগুলি সন্নিবেশিত করবার সময় যোগীন্দ্রনাথ কিশোর চরিত্র গঠনের বিষয় নিজের অজ্ঞাতেই ভেবেছেন। ওদের কাছে শুধু বিভীষিকার চিত্র উপস্থিত করলে ওরা ভীরু, কাপুরুষ হয়ে বাঙ্গালী নামের কলঙ্ক হবে। ওদের মধ্যে স্বাভাবিক যে এ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা আছে, তার সঙ্গে কৌতূকপ্রিয়তাও যে আছে, তা তিনি ভোলেন নি। সেই জন্য বনে জঙ্গলেতে "সুন্দরবনের গল্প" এর মধ্যে দেখি পাল্কীচাপা বাঘের কাহিনী।" কাহিনীটি লেখকের ভাষায় এইরূপ :—

"আমি একবার পাল্কীশুদ্ধ এক বাঘের ঘাড়ে পড়িয়াছিলাম। সুন্দরবনের পশ্চিমদিকে বহুদূরে, কোন স্থানে খাজনা লইয়া কৃষকদিগের সহিত গভর্ণমেন্ট কর্ম্মচারিগণের গোলযোগ হওয়ায়, আমাকে তাহার তদারকে যাইতে হইয়াছিল। সেদিকে লোকের বসতি খুব কম ; চারিদিকেই ছোট বড় বন, এই সকল বনে বাঘও খুব বেশী। আমি পাল্কীতে যাইতেছিলাম। আমার সঙ্গে আটজন পাল্কী বেহারা ও রাত্রে মশাল ধরিবার জন্য একজন, সবশুদ্ধ নয়জন লোক ছিল।

আমরা একটি বন পার হইয়া যাইতেছিলাম। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, মশালের আলোকে পথটা যেন আরো অন্ধকার দেখাইতেছিল। আমার একটু ঘুমের ভাব আসিয়াছিল, এমন সময় হুড়মুড় শব্দে পাল্কীখানা মাটিতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি বিকট শব্দ শুনিতে পাইলাম। পর মুহূর্ত্তে পাল্কীখানা কাৎ করিয়া দিয়া কে যেন ছুটিয়া পালাইল! চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ! আমি বাহির হইবার চেষ্টা করিতে গিয়া দেখি, পাল্কীর দরজা খুব আটকাইয়া গিয়াছে ; কিছুতেই খোলা যায় না। অবশেষে পদাঘাত করিতে করিতে একখানা দরজা খুলিয়া গেল। বাহির হইয়া দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই, লোকজন সব পলায়ন করিয়াছে। তখন পাল্কীখানা সোজা করিয়া এবং উহার দরজা ঠিক করিয়া, তাহারই মধ্যে কোন প্রকারে রাত্রিটা কাটাইয়া দিলাম।

পরদিন প্রাত:কালে বাহকগণ ফিরিয়া আসিলে, প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলাম। বনের মধ্যে রাস্তা অতিক্রম করিবার সময়, হঠাৎ একটি বাঘকে পাল্কীর নীচ দিয়া ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া, তাহারা ভয়ে উহার উপরেই পাল্কী ফেলিয়া পলায়ন করে। সহসা এরূপভাবে পিঠের উপর পাল্কী পড়াতে, বাঘও খুব ভয় পাইয়াছিল এবং বিকট আওয়াজ করিয়াছিল। তারপর বেচারা সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে পলায়ন করিবার সময়, পাল্কীটা কাৎ হইয়া পড়িয়া গিয়া থাকিবে। সেই সময় বাঘের মনে যে পলায়ন করা ভিন্ন অন্য কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

আরও একটি গল্প খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। সেটির নাম "বাঘে মানুষে একগর্ত্তে।" এটি যোগীন্দ্রনাথের সংগ্রহ। রচয়িতার নাম হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। হেমেন্দ্রবাবু এই কাহিনীটি তার এক বন্ধুর নিকট শোনেন। বন্ধুর নাম অমরবাবু। কর্ম্মবশত: তিনি তখন সুন্দরবনেই বাস করতেন। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট জনৈক মি: কেনেডির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এক সন্ধ্যায় অমরবাবু

তাঁর তাঁবুতে উপস্থিত হলেন। এরপর চন্দ্রোদয় হ'ল। নিস্তব্ধ বনভূমি জ্যোৎস্নালোকে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করতে লাগল। দুঃসাহসী অমরবাবু হাঁটাপথে কাছারীতে ফিরবেন স্থির করে সহিসকে ঘোড়া নিয়ে ফিরে যেতে বললেন। আহারাদির পর চন্দ্রালোকে বসে গল্পে গল্পে অনেক সময় কাটিয়ে রাত বারোটার সময় তিনি সঙ্কীর্ণ হাঁটাপথে একাকী রওনা হলেন। গল্পের মাঝখানেই মন্তব্য করতে ইচ্ছা হয় বলিহারী সাহস! সঙ্গে একটা বন্দুক পর্য্যন্ত ছিলনা। এরপর তাঁর যে অভিজ্ঞতা তা যেমন ভয়াবহ, তেমনি কৌতুককর। একটি ছাগলছানার চীৎকার শুনে কয়েকপদ অগ্রসর হবামাত্র ঝপ্ করে তিনি এক গর্ত্তে পড়ে গেলেন। তখন হঠাৎ সুন্দরবনে বাঘ ধরার এক বিশেষ প্রণালীর কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। বনে কোথাও বাঘের অত্যাচার আরম্ভ হলে স্থানীয় অধিবাসীরা স্থানে স্থানে গর্ত্ত করে ডালপালা দিয়ে সেই গর্ত্ত ঢেকে রাখে এবং নিকটেই বেঁধে রাখে বাঘের আহার্য্যরূপে এক ছাগলশিশু। ছাগলের লোভে বাঘ নিকটে আসলেই ঐ ডালপালা তার ভারে ভেঙ্গে যায় এবং বাঘ গর্ত্তের মধ্যে পড়ে বন্দী হয়। অমরবাবু অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে বন্দী হলেন ঐ গর্ত্তে। তিনি বুঝলেন সকাল না হলে লোকজন আসবে না এবং তাঁরও মুক্তি হবেনা। বসে বসে কি করেন? চুরুট টানতে আরম্ভ করলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি ভারী জানোয়ারের পতনের আওয়াজ হল। জানোয়ারটা একটা বাঘ। এরপর সেই এক গর্ত্তে সারারাত বাঘের সঙ্গে তিনি রাত কাটান। অমরবাবু চুরুট টানছিলেন। সেই চুরুটই তাঁকে রক্ষা করে। হঠাৎ তিনি দেখলেন যে বাঘ গর্ত্তের মধ্যে পিছু হটছে। বুদ্ধিমান অমরবাবু বুঝলেন বাঘ চুরুটের আগুন দেখে ভয় পেয়েছে। তখন তিনি একসঙ্গে তিনটে করে চুরুট টানতে লাগলেন। গর্ত্ত ধোঁয়ায় ভরে গেল। বাঘের নাকের থেকে এক অদ্ভুত আওয়াজ বের হতে লাগল। অমরবাবু বুঝলেন যে চুরুটের ধোঁয়া তার সহ্য হচ্ছে না। আরও জোরে টানতে টানতে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পরদিন সকালে লোকজন এসে এই অবস্থা দেখে মি: কেনেডিকে খবর দিল। অমরবাবুকে সকলে মৃত মনে করেছিল। তাই তাঁর দেহে বন্দুকের গুলি লাগলে মারাত্মক ফল হবে এভয় কারো মনে জাগল না। কেনেডির গুলিতে গর্ত্তের বাঘ নিহত হলে অমরবাবুকেও স্থানীয় লোক গর্ত্ত থেকে তোলে এবং শুশ্রূষা করে সুস্থ করে।

গল্পটি যোগীন্দ্রনাথের রচনা নয়। এর মূলে সত্য ঘটনা কতটা আছে, তাও এতদিন পরে জানা কঠিন। কিন্তু গল্পটি যে মামুলী শিকারের গল্প নয়, তা বলাই বাহুল্য। যেমন আকস্মিক ভাবে একটি দুর্ঘটনা ঘটে অমরবাবুকে বিপদগ্রস্ত করে, তেমনি আকস্মিক ভাবেই সামান্য বস্তুর সাহায্যে তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়! চুরুট খাওয়াকে নানা কারণে দোষাবহ বলা হয়ে থাকে কিন্তু এই আপাত বদঅভ্যাসের ফলেই কেমন করে এ ভদ্রলোক সে যাত্রা রক্ষা পেলেন, তার কাহিনী সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক। তাছাড়া আর একটি ভুল ধারণা এক্ষেত্রে তাঁর জীবন রক্ষায় সহায় হয়েছিল। অমরবাবু জীবিত এ ধারণা থাকলে গর্ত্তের উপর থেকে গুলি করে বাঘ মারা সম্ভব হত কিনা বলা যায় না। কারণ বাঘের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত গুলি তাঁর গায়ে লাগবার সম্ভাবনা আছে, একথা মনে করলে হয়তো কোনও শিকারী গুলি করতেন না অথবা বন্দুকের ঘোড়া টেপবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে 'নার্ভাস্' হয়ে তাঁর হাত কেঁপে যেত—ফলে গুলিবিদ্ধ হয়ে অমরবাবুর মৃত্যু হ'ত। সুতরাং যে ভুল ধারণা সর্ব্বক্ষেত্রে বিপর্য্যয় ঘটায়, এক্ষেত্রে তাই একজনের প্রাণরক্ষা করেছে। অনেকগুলি বিশেষত্ব বা নূতনত্ব আছে এই গল্পে। সুতরাং এ গল্প নির্ব্বাচনে যে জহুরী খাঁটি মণিমুক্তোর দর জানে, আদর জানে, সেই জহুরীর সম্মান যোগীন্দ্রনাথের প্রাপ্য।

"বাঘে মানুষে এক গর্ত্তে" গল্পটির আরও একটি বিশেষত্ব এই যে সুন্দরবনের তখনকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত বাঘ ধরবার একটি পদ্ধতির সন্ধান এতে পাওয়া যায়। লেখক এইরূপ আরও কয়েকটি বাঘ ধরবার কাহিনী বনেজঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার মধ্যে শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ রচিত "ফাঁদ পাতিয়া বাঘ ধরা" ও কুলদারঞ্জন রায় রচিত "নাগপাশে বাঘধরা" উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে বাঘ বা অন্য পশু শিকার করা যত সহজ ফাঁদ পেতে হিংস্র জন্তু ধরা তত সহজ নয়। ফাঁদ পেতে বাঘ ধরার গল্পটি মালয় উপদ্বীপের গল্প। চার্লস্ মেয়র নামে এক শিকারী কিরূপে ঐ স্থানের এক জঙ্গলে ফাঁদ পেতে হাতী, বাঘ, এমন কি, অজগর সাপ পর্য্যন্ত ধরেছেন, সেই গল্প লিখেছেন শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। এই পশুধরা ফাঁদ "কতকটা বড় আকারের ইঁদুর ধরিবার বাক্স কলের মত। একটা লম্বা চারকোণ জায়গার তিনদিক, শক্ত শক্ত উঁচু খোঁটা পুঁতিয়া

ঘিরিয়া তাহার উপর মজবুত করিয়া চাল ছাইয়া দিলেই ফাঁদের কাঠামো প্রস্তুত হইল। খোলা দিকটার মাথায় এমন কৌশলে একটা ভারি দরজা ঝুলান থাকে যে, বাঘ উহার ভিতরে প্রবেশ করিলে, আপনা হইতেই দরজা পড়িয়া খোঁয়াড়ের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। চারিদিকে ডালপালা পুঁতিয়া যাহাতে খোঁয়াড়টাকে একটা ঝোপের মত মনে হয়, তাহার ব্যবস্থাও করা হয়। ভিতরে খোঁয়াড়ের অপর প্রান্তে একটি জীবন্ত পশু বাঁধা থাকে। সেটাকে ধরিতে যাইয়া ব্যাঘ্র মহাশয় আটকা পড়িয়া যান।"

এরপর মেয়র সাহেবের ফাঁদের মধ্যে বাঘ ধরা পড়ল এবং পরে সেই বাঘকে খাঁচায় ভরে নিয়ে যাত্রা করবার কিছুক্ষণ পরে কিরূপে এক গণ্ডার বন ভেঙ্গে বেরিয়ে বাঘকে আক্রমণ করে মেরে ফেলল ও চক্ষের পলকে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে পাহাড়ের মত শরীর নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল— সেই কথায় গল্পটি শেষ হয়েছে।

"নাগপাশে বাঘ ধরা"তে কুলদারঞ্জন রায় ল্যাসো বা দড়ির ফাঁসে বাঘ ধরার কাহিনী বলেছেন। "খুব লম্বা দড়ির ডগায় এই ফাঁস তৈরি করিয়া তাঁহারা (শিকারীরা) দড়িগাছি হাতের মধ্যে গুটাইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। কাছে কোন জানোয়ার দেখিলে দড়িটা এমনভাবে ছুড়িয়া মারেন যে উহার ফাঁস গিয়া তাহার গলায় আটকাইবেই আটকাইবে। তারপর টানাটানিতে ক্রমাগতই ফাঁস গলায় অাঁটিয়া যায় আর জন্তুটাও কাবু হয়।" এরপর নাগপাশে বিভিন্ন শিকারীর নেকড়ে বাঘ, চিতাবাঘ, বড় বাঘ এবং জানোয়ার ধরার বিচিত্র কাহিনী পাওয়া যায়।

'মুকুল' থেকে সংগৃহীত "নেকড়ে পালিত শিশু"র গল্পটিও চমৎকার। নেকড়ে শিকার করবার জন্য লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে এক জঙ্গলে গিয়ে তিনজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এক অদ্ভুত জীব আবিষ্কার করেন। নেকড়ের গর্তের নিকটে ডালপালা জড় করে আগুন জ্বাললেন তাঁরা। উদ্দেশ্য ধোঁয়ায় অস্থির হয়ে বাঘ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু বেরোল এক কিম্ভূত কিমাকার জন্তু। সে অসতর্ক শিকারীর বুকের উপর উঠে তাঁর হাত ক্ষতবিক্ষত করে দিল, মুখের মধ্যে লাঠির অংশ ঢুকিয়ে দিলে পিষে ছাতু করে ফেলল। তারপর লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে সে অজ্ঞান হয়ে গেলে বোঝা গেল যে সে মানুষ বই আর কিছুই নয়। অথচ দীর্ঘকাল নেকড়ের গর্তে বাস করে তার সর্ব্ব শরীর লোমে

ভরে গিয়েছিল, মাথার চুলগুলি সিংহের কেশরের মতন ছড়িয়ে গিয়েছিল আর হাত দুটি কড়ায় ভরে গিয়েছিল, হাঁটু দুটি হয়েছিল উটের পায়ের মতন, চলন চতুষ্পদের মত। এরপর তার হাতে একটি গভীর কাটার দাগের মধ্যে পাওয়া গেল একগাছি বালা। সেই বালার সূত্রে স্বর্ণকারের সন্ধান পাওয়া গেল এবং ক্রমে জানা গেল স্থানীয় বণিক মনোহর দাসের পুত্রের জন্য ঐ বালা তৈরী হয়েছিল। এরপর কি দারুণ সংগ্রাম করে সেই নরপশুকে আবার মনুষ্যে পরিণত করা গেল—এ তারই কাহিনী। যখন বন্দী তার হিংস্র স্বভাব আংশিকভাবে বিস্মৃত হয়েছে, তখন তার মা অর্থাৎ মনোহর দাসের স্ত্রী সেই খাঁচায় প্রবেশ করে কেমন করে তাকে বশে আনবার চেষ্টা করতেন, সেটি লেখকের ভাষায় বলছি :—

"সেদিন পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রি. চারিদিক নিস্তব্ধ নির্জ্জন, সেই সময় তিনি তাঁহার সুমধুর মৃদুস্বরে ঘুমপাড়ানী গান গাহিতে গাহিতে তাহার ঘরের ভিতর গেলেন। চাঁদের আলোতে তাঁহাকে অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাইতেছিল। তাঁহার গানের মাধুর্য্যে বন্দী তাহার হিংস্র স্বভাব ভুলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। তিনি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সেই ঘুমপাড়ানী-গান গাহিতে গাহিতে, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার মুখটি বুকের উপর রাখিলেন। মুখের উপর হইতে তাহার অপরিষ্কার এলোমেলো চুল সব সরাইয়া দিয়া, কত স্নেহে দুইখানি হাত দিয়া, তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন। কতদিনের পুরাতন স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। সেই অতি শিশুকালে সে কেমন সুকুমার, সুকোমল, সুন্দর ছিল। কেমন মিষ্ট করিয়া হাসিত। কেমন করিয়া তাহার কচি গলায় আধ আধ সুরে মা বলিয়া ডাকিত। হায় বিধাতা! এই তাঁহার একমাত্র সন্তান, তাহারও এমন দুর্দ্দশা! এই মনে করিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না—কাঁদিয়া উঠিলেন। গানের আওয়াজ থামিয়া গেলে যেই সে কান্নার শব্দ শুনিল, অমনি যেন তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল! সে যে শান্তশিষ্ট হইয়া বসিয়াছিল, সে সব ভুলিয়া, আবার দারুণ হিংস্র হইয়া উঠিল ; আর একটু হইলে, তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত। এমন সময়ে তিনি ভয়ে চীৎকার কবিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া বৃদ্ধ মনোহর দাস দৌড়িয়া আসিয়া, একটি জ্বলন্ত মশাল বন্দীর মুখের সম্মুখে ধরিলেন ; আগুন

দেখিয়া সে যখন কোণে গিয়া লুকাইয়া বসিল, তখন তাঁহার স্বামী স্ত্রীতে কোনওরূপে বাহিরে পলাইয়া আসিলেন।"

এর পরের কাহিনী বিচিত্র। দশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ছেলে একটি তরুণ সুন্দর বুদ্ধিমান যুবকে পরিণত হ'ল।

এমন কত কাহিনীই "বনে জঙ্গলে"তে আছে। শুধু বাঘ নয়, এতে আছে, 'ভালুকের বিক্রম,' অজগর সাপের কথা, আফ্রিকায় সিংহ শিকার, আরবদেশে সিংহ শিকার এবং বিভিন্ন দেশে ভালুক, মহিষ, হাতী, গণ্ডার, জলহস্তী ও গরিলা শিকারের বিচিত্র কাহিনী। সঙ্গে আছে ৬৪টি ছবি। এ বইয়ের সব কাহিনী যোগীন্দ্রনাথের রচনা না হলেও ছবিগুলি তাঁরই নির্দ্দেশে চিত্রকর এঁকেছেন। বইখানি এতই সুখপাঠ্য যে উপন্যাস বলে ভ্রম হয়।

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর দ্বারা স্কুল পাঠ্য পুস্তক হিসাবে অনুমোদিত হলেও এর কাহিনীগুলি যে কোন বয়স্কপাঠ্য মাসিক, সাপ্তাহিক বা বার্ষিক (অর্থাৎ শারদীয়া সংখ্যা, বা দোলসংখ্যা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সংখ্যার) পত্রিকায় প্রকাশিত হবার যোগ্য। শুধু নাতি-নাতনী পরিবৃত হয়ে দাদু-দিদিমাই নয়, তাঁদের মধ্যে সেতুস্বরূপ যে আর এক পুরুষ আছেন, তাঁরাও এ কাহিনী সমানভাবেই উপভোগ করবেন। যোগীন্দ্রনাথ তো বয়স্কপাঠ্য রচনায় অক্ষম ছিলেন বলে কিশোরদের জন্য কলম ধরেন নি। পাকা হাতের মিষ্টি এই লেখায় "পাকামি" নেই কোথাও, তাই নির্ভয়ে কিশোরদের হাতে এ কাহিনী তুলে দেওয়া যায়। তাই বলে এগুলি বয়স্করাও কম উপভোগ করেন না।

সপ্তম অধ্যায়

"বিকাশ" ও "দীপ্তি"

যোগীন্দ্রনাথ শিশু সাহিত্যিকরূপেই বাংলাদেশের নিকট পরিচিত। সেজন্য অনেকেই জানেন না যে, তাঁর সাহিত্যজীবন আরম্ভ হয়েছিল "বিকাশ" ও "দীপ্তি" নামক দুখানি বয়স্কপাঠ্য ক্ষীণকায় কাব্যগ্রন্থ দিয়ে। ১৮৯২ সনে (বাংলা ১২৫৮) বিকাশ প্রকাশিত হয়, তখন যোগীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ২৬ বৎসর। ২১১ নম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ব্রাহ্ম মিশন প্রেস থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। মূল্য মাত্র দু আনা থাকা সত্ত্বেও অমন সুন্দর কবিতা পুস্তক যে কেন লুপ্ত হয়ে গেল, সেটাই আশ্চর্য্যের বিষয়। প্রকাশক সুরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বিকাশের ভূমিকায় লিখেছেন যে, কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি "ধর্ম্মবন্ধু" এবং "তত্ত্বকৌমুদী"তে প্রকাশিত হয়েছিল। তার থেকে বোঝা যায় যে এই পুস্তকগুলির মধ্যে কিছু ঈশ্বরভক্তিমূলক কবিতাও ছিল।

এইরূপ একটি কবিতা দেখছি, "সেই আনন্দের ধাম!" তার আরম্ভে পাই ঃ—

"কোটি বিশ্বব্যাপী এক সত্ত্বা বর্ত্তমান,
আনন্দ তাহার নাম ;
একদিকে ইহলোক তার,
মাঝখানে মৃত্যু পারাবার,
আর দিকে জ্যোতির্ম্ময় আলয় মহান,
সেই আনন্দের ধাম
জীবন—উজল—রবি হেরি অস্তমান
যবে অবসন্ন প্রাণ ;
হৃদয়ের অমৃত দুয়ারে
অমৃত আহ্বান ঘুরে মরে
যে আবাস হতে আসে সে সব আহ্বান
সেই আনন্দের ধাম।

এই পংক্তি কটিতে এই শ্লোকটির ছায়া দেখি:

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥"

"বিকাশ" এর আর একটি কবিতার নাম ছিল "জীবনভেলা।" এই সুন্দর কবিতাটি পূর্ব্বাপর উল্লেখযোগ্য। কবি লিখেছেন:—

"ফুরায়ে গিয়াছে বেলা
ছুটিছে জীবন ভেলা,—
ধ্রুবতারা, পথহারা জনে ফিরে চাও,
নহিলে যে গতি নাই,
অতলে তলায়ে যাই,
আবর্ত্ত উচ্ছ্বাসে তব প্রসাদ বিলাও।
হু হু বহে সমীরণ,
তরঙ্গে তরঙ্গে রণ,
ঘাত প্রতিঘাতে ভেলা স্থির রাখা দায়;
হাল যেন নাহি টুটে,
পাষাণে না তরী ছুটে,
আশা যেন নাহি ডুবে গাঢ় নিরাশায়!
কাল-সন্ধ্যা এল ওই,
দিগ্বিদিক মসীময়ী;
আতঙ্কের ঘনশ্বাসে ভরে গেছে প্রাণ!
একেলা সে দূর দেশে,
যেতে হবে স্রোতে ভেসে,
আকুল শ্রবণে চাল আশ্বাস আহ্বান।
অকূলেতে কূল নাই,
তাতে কেন ভয় পাই?
তব পদ-বেলা-ভূমে বেঁধে শেষে তরী,
পথশ্রান্তি যাবে দূরে,

সহস্র উঠিবে স্ফুরে,
অনুপ পুলকাভাসে যাবে প্রাণ ভরি।"

মাত্র ২৬ বৎসর বয়স্ক যুবকের মনে এমন নিরাশার সুর কেন জেগেছিল বলা কঠিন। আমার মনে হয় দৈহিক এবং মানসিক বয়সের ব্যবধান চিরকাল সকল ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান। তাছাড়া যুবকের মনে ক্ষণে ক্ষণে কত ভাবের তরঙ্গ খেলে যায়, কত কল্পনার উচ্ছ্বাস জাগে, কত আশা নিরাশার দোলায় দোলে তার মন! হয়তো এ ভাবের অনেকটাই ক্ষণস্থায়ী। তবু সেই ভাবের বশে অনেক সময়ই তরুণ কবি কত মাধুর্য্যপূর্ণ, রূপে রঙে রঙীন রচনা উপহার দেন জগতকে, তার হিসাব পাওয়া কঠিন। অবশ্য যোগীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে তখন কোনও ঝড়-ঝঞ্ঝার উদয় হয়েছিল কিনা তাও সঠিক জানিনা। তবে শৈশবকাল থেকে সাংসারিক বিপত্তির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। যে আর্থিক অনটন মানুষের মনের সব মাধুর্য্য, সব সুষমাকে লুপ্ত করে দেয়, আশৈশব তিনি সেই অনটনের তীব্রতম রূপ দেখেছেন। আরও কোন দুঃখ অর্থাৎ মানসিক অশান্তি তিনি ভোগ করেছিলেন কিনা জানিনা। কিন্তু দুঃখের দিনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হয়ে, তিনি যে বিশ্বপিতার চরণেই শরণ নিতে চেয়েছেন, এ থেকে বুঝি যে অল্প বয়স থেকেই কত গভীর ছিল তাঁর ঈশ্বরভক্তি।

১৯এ নভেম্বর ১৮৯২ সনে যোগীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক "দীপ্তি" প্রকাশিত হয়। দীপ্তিতে ভক্তিমূলক কবিতা অধিকসংখ্যায় পাই। "উদ্বোধন" নামক একটি কবিতায় যোগীন্দ্রনাথ লিখলেন,

কোটি রবি চন্দ্রতারা লইয়া হৃদয়ে
নিশিদিন বন্দে যাঁরে অনন্ত গগন
শত উর্ম্মি শত রত্ন হৃদি থালে লয়ে,
বিশাল জলধি যাঁর করিছে অর্চ্চন।
"ধনে ধান্যে পূর্ণ হয়ে এ বিপুল ক্ষিতি,
করিছে চরণে যাঁর পুষ্প অর্ঘ্য দান,
স্বর্গের আনন্দ তিনি, জগতের প্রীতি,
সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের তিনি মহাপ্রাণ।" ইত্যাদি

প্রথম যৌবনেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে।

তাই যে সুরে ব্রহ্মসঙ্গীতে স্তোত্র পাই, "ভবাব্ধৌ দুস্তরে নাথ নৌরেকা ভবতু ত্বৎকৃপা" অর্থাৎ হে প্রভু, এই দুস্তর ভবসমুদ্রে তোমার কৃপাই একমাত্র তরণী", সেই সুর যোগীন্দ্রনাথের অনেক রচনাতেই বর্ত্তমান। দীপ্তির অনেক কবিতার নাম এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য! সেগুলি হ'ল যথাক্রমে "সত্যম্", "জ্ঞানম্", "অনন্তম্", "আনন্দম্", "অমৃতম্", "শান্তম্", "শিবম্", "অদ্বৈতম্" এবং "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" শেষোক্ত কবিতাটিতে তিনি লিখেছেন,

"নিষ্কলঙ্ক, নিরমল, তুমি জ্যোতির্ম্ময়,
পাপাতীত, চিরশুদ্ধ, পুণ্যের আধার,
অতুলন, তুমি শুধু তুলনা তোমার!
প্রকাশে তোমার সর্ব্ব তমো দূর হয়।
"অরূপ রূপেতে তুমি সৌন্দর্য্য মহান,
তব পুণ্য মূর্ত্তি হতে অমৃত ছটায়
ছুটিতেছে পুণ্যজ্যোতি নিখিল ধরায়;
সে পুণ্যকিরণে সারা বিশ্ব দীপ্তিমান।"

মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধেও দীপ্তিতে দুটি অপূর্ব্ব কবিতা পাই। তার মধ্যে "স্বর্গারোহণ" আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর পিতৃদেব ভগবান চন্দ্র বসুর মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছিল। এমন সুন্দর কবিতা কেন লুপ্ত হয়ে গেল জানিনা। কবিতাটি হ'ল :—

স্বর্গারোহণ

(বাবু ভগবান চন্দ্র বসুর মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত)

"ফুরায়েছে জীবনের খেলা,
আসিয়াছে পরলোক বেলা,
সাজাইয়া তুলে দাও অমর আত্মারে;
মায়া-ডোরে কেন মিছে বেঁধে রাখ তাঁরে!
আজ যে গো ব্রহ্মধামে উৎসব-আনন্দ,
তবে কেন বল নিরানন্দ?

"দেবাত্মার সনে হবে জীবাত্মা মিলন,
কেন তবে শোকের ক্রন্দন?

ঢাল ঢাল আঁখিজল রুদ্ধ যাতনার
অশ্রুসনে ঢেলে দাও ঘোর হাহাকার,
দুঃখজ্বালা বিষাদের ধারা,
আঁখি দিয়ে ঝরে যাক তারা
বহে যাক এক মহা অশ্রু পারাবার!

সে সাগরে ক্ষেপণি ফেলিয়া
জ্যোতির্ম্ময় তরণী বাহিয়া,
অবিনাশী আত্মা আজ যান স্বর্গধাম,
সেথা যে গো অনন্ত আরাম।

ভুলে যাও শোকতাপ সবে,
মেতে যাও আনন্দ-উৎসবে;
ওই দেখ তোমাদের তপ্ত আঁখিজলে
স্বরগের সুবিমল ভাতি কিবা ঝলে;
সে আলোকে দেখ মূর্ত্তিমান,
ইহলোক অন্তে পরকাল
মাঝে মৃত্যু নদী ব্যবধান;
এপারে তোমরা সবে—তোমাদের স্নেহ
মমতার কঠিন বন্ধন;
ওপারে আনন্দধাম—মহেশের গেহ
দেবতার মহা আকর্ষণ;
এপারে অশান্তি জ্বালা জরা মৃত্যু ভয়;
ওপারে জীবন প্রেম অনন্ত অক্ষয়।

প্রসারি মিলন আলিঙ্গন
বুকে লভে হৃদয়ের ধন,
আপনি দেবেশ ওই দাঁড়াইয়া তীরে,
কোটি মুক্ত আত্মা তাঁরে ঘিরে।

চারিদিকে ঝরিতেছে আনন্দের ধারা,
আজি সবে হর্ষে মাতোয়ারা;

ওই শুন উঠিতেছে আহ্বান সঙ্গীত,
খুলে দাও বন্ধন ত্বরিত।
মিলন বিজয় গাথা গাহি,
মহামিলনের পানে চাহি
জীবাত্মা উল্লাস ভরে যান স্বর্গধাম,
লভুন অনন্ত-ক্রোড়ে অনন্ত বিরাম।"

এই কবিতাটি যোগীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁর জীবনীর সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অর্থাৎ আমাদের বড়মামা ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ সরকার পাঠ করেন।

দীপ্তিতে মৃত্যু সম্বন্ধে আরও একটি কবিতা পাই। কবিতার নামই "মৃত্যু"। সেটির আরম্ভ,

"মরণ বিচ্ছেদ নহে—নহে অন্ধকার,
নহে কভু রূপান্তর রুদ্র শ্মশানের,—
এক মহা সেতু পৃথ্বী স্বর্গের মাঝার,
সুদৃঢ় আশ্রয় ইহা জীবন পথের।"

এই কবিতাটির উপলক্ষ্য কি ছিল জানিনা। পরে এই কবিতাটির ভাব নিয়েই যোগীন্দ্রনাথ একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন,

"কেন দেব মোহমুগ্ধ অন্ধ দু নয়ন
মরণে বিচ্ছেদ ভাবি কাঁদি অকারণ।
মৃত্যু সে তো নহে পর জীবনের রূপান্তর
জলদের রূপান্তর সলিল যেমন।
... ...
তোমাতে উদ্ভূত হয়, তোমাতেই পায় লয়,
মৃত্যু যে গো চিরশান্তি, অনন্ত জীবন।"

অবশ্য "বিকাশ" ও "দীপ্তি"তে শুধুই যে ঈশ্বর, মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধেই কবিতা ছিল তা নয়। তাঁর অনেক কবিতাতেই প্রকৃতি প্রেম ও সৌন্দর্য্য-পূজার আভাস পাই। "বিকাশ"এর প্রথমেই "বন্যছবি" নামে এইরকম একটি কবিতা আছে। তাতে তরুণ কবি লিখেছেন :—

"বড় বড় ঢেউতোলা মাঠখানি হেলাদোলা,
গিরি এক মাঝখানে তার,

উঁচু উঁচু মাথা তুলি, রহিয়াছে তরুগুলি,
শাখে শাখে লতা দেহ ভার ;
কল কল পাখি রব, ফুলদল নাচে সব,
আবেগে মলয় গায় গান,
পাষাণ দোফাঁক করি নির্ঝর বহিছে ধীরি,
ফুল পাতা তাহে ভাসমান…''

মনে হয়, এই কবিতাটি কৈশোরে দেওঘর বিদ্যালয়ে পাঠকালে রচনা করেছিলেন। অবশ্য এটি আমার অনুমান মাত্র।

দীপ্তিতেও "কাঞ্চন-শৃঙ্গ" "মেঘের খেলা" ইত্যাদি কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর প্রকৃতি প্রেমের আভাস পাই। "মেঘের খেলা" কবিতাটিতে তিনি লিখেছেন :—

"মেঘে মেঘে দিক ছেয়েছে
সীমানা তার নাই,
আকাশ পাতাল খণ্ড মেঘে
ঢেকেছে সব ঠাঁই !
তরুর শাখে ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়ছে মেঘের কণা
অচল শিরে জমাট মেঘের
নাহিক তুলনা !
মেঘের মালা ঝুলিয়ে গলে
মেঘের বসন পরি,
দাঁড়িয়ে আছে অযুত অচল
শিখর উঁচু করি।
রজত বরণ রবির কিরণ
সারা দেহে মাখি,
আঁধার কায়ায় রেখেছে মেঘ
তাহার দেহ ঢাকি।

মেঘের দয়া হলে তবে
রবির ফুটে রেশ,
সবাই হেথা মেঘের অধীন
এ যে মেঘের দেশ।"

কবিতাটি যে কোন পার্ব্বত্য সহরে বসে বা তার স্মৃতিতে লেখা তাতে সন্দেহ নাই। স্বভাবতঃই মনে হয় যে আমাদের মাতামহীর (অর্থাৎ যোগীন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা বা গিরিবালা দেবীর) পিত্রালয়ে সিমলার পর্ব্বতগাত্রে মেঘের খেলা দেখেই তাঁর মনে এই ভাব জেগে উঠেছিল। কবিতাটির শেষ কয়েক পংক্তি এইরূপ :—

"ঘরে দ্বারে মেঘ ঢুকেছে,
চোখে মুখে মেঘ,
হাওয়ার দোলায় ছুটছে কত,
অসীম তাহার বেগ।
তরল মেঘে জমাট মেঘে
কতই খেলে খেলা,
বনের দেবী দেখেন বসি
নীরবে একেলা!
কোথায় একটি ঝোপের মাঝে
হরিণ শুয়ে আছে;
রবির করে তাহার চোখে
আতপ লাগে পাছে,
তাই কয়েকটি মেঘের কণা
যুক্তি আঁটি সার,
ত্বরিত গিয়া যতন ভরে
ঢাকলো দেহ তার!
কোথায় একটি তরুর শাখে
ফুটে আছে ফুল,
শুখায় পাছে নিদাঘ তাপে
ভেবে মেঘ আকুল;

ছুটল সেথা স্তরে স্তরে
ছাইল কুম বাসে।
মেঘের দয়া দেখে যতেক
বনের পাখী হাসে!
কোথায় একটি পাতার ঝোপে
ইন্দ্রধনু মেখে
উজলি কানন প্রজাপতি
আছে মনের সুখে;
হাওয়ার আগে চলল সেথা
ছুটে মেঘের দয়া,
ঢাকলো তাহার রূপের জ্যোতি
বর্ষি কোমল ছায়া।
এমনি করে সদাই ঘোরে
চৌদিকে মেঘরাশি
মেঘের দেশে বসে আমরা
সুখ-সাগরে ভাসি।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত এই দুটি গ্রন্থে স্বভাবতঃই কিছু রোম্যান্টিক কবিতা পাই। বিকাশের এমনি একটি কবিতা হ'ল "অতৃপ্ত বাসনা",

"যে যারে চায় হে সখা
সে যদি পাইত তায়,
এত অশ্রু তবে বল
বহিত কি এ ধরায়?" ইত্যাদি

"বিকাশ" সম্বন্ধে সেকালের বিখ্যাত পত্রিকার মতামত দীপ্তির শেষ দুটি পৃষ্ঠায় পাই। মতামতগুলি এখানে উদ্ধৃত হ'ল।

ভারতী—(বৈশাখ, ১২৯৮)—সূর্য্যকিরণের ন্যায় ইহা সাহিত্য জগতে আলোক বিতরণ করিতে প্রকাশিত। অনেক দিন পরে আমরা সম্মুখে নব কবির অভ্যুদয় দেখিতেছি। ইহার এই কবিতাগুলিতে ভাব ও ভাষার সংমিশ্রণ অতি সুমধুর।

নব্যভারত—(ভাদ্র, ১২৯৮)—ফুলগুলির বাস্তবিক সুগন্ধ আছে। শুধু সুগন্ধ নয়, স্থানে স্থানে ভাব মাধুরীপূর্ণ উচ্ছ্বাসও আছে।

সঞ্জীবনী—(২৭এ বৈশাখ, ১২৯৮)—অনেকগুলি কবিতা বেশ প্রশংসাযোগ্য। কোন কোন কবিতা খুব উচ্চ অঙ্গের, রচনা যেমন চাতুর্য্যপূর্ণ, তেমনই গভীর ভাবময়।

বঙ্গবাসী—(২০এ অগ্রহায়ণ, ১২৯৮)—কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় যথার্থ কবিত্বের বিকাশ দেখিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। প্রথম হইতে ক্রমশঃ কবিত্বের শক্তি বাড়িয়াছে। প্রথমে কোরক, তাহার পর অর্দ্ধস্ফুট, তাহার পর স্ফুটনোন্মুখ ভাবগুলি "জগৎসঙ্গীতে" যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন জগতের শোভায় মিশিয়া গিয়া শেষে ভুবনমোহনরূপে গলিয়া গিয়াছে।

সময়—(৬ই আষাঢ়, ১২৯৮)—"বিকাশ"এ প্রকৃত কবিত্বের বিকাশ হইয়াছে। ভাষা সুললিত ও মাধুর্য্যপূর্ণ এবং ভাব সুরুচিসঙ্গত ও উন্নত চিন্তাপূর্ণ হইয়াছে। মাতৃভাষা-সেবাব্রতে ব্রত থাকিলে কালে গ্রন্থকার বঙ্গীয় প্রবীণ কবিগণের আসনে উপবিষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই।

হিতবাদী—(৫ই পৌষ, ১২৯৮)—এই পুস্তকে গ্রন্থকারের নবীন কবিত্ব বেশ বিকাশ পাইয়াছে। "বন্যছবি", "অতীত", "আমার ক্ষুদ্রত্ব" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। এগুলিতে কবিত্বের সহিত ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে।

বামাবোধিনী—(আষাঢ়, ১২৯৮)—পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কন যেমন সুন্দর, কবিতাগুলি সেইরূপ সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অনেকগুলি কবিতা পড়িতে পড়িতে গম্ভীর ও পবিত্রভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়।

ধর্ম্মবন্ধু—(জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮)—এত অল্প মূল্যে এরূপ সুন্দর পুস্তক গ্রন্থকার কিরূপে দিতে সক্ষম হইলেন বুঝিতে পারি না। পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন কবির ধর্ম্মভাব কত উচ্চ, প্রকৃতি পর্য্যালোচনা কত গভীর।

প্রতিমা—(ফাল্গুন, ১২৯৮)—গ্রন্থকার ভাবিতে জানেন, ভাবাইতে জানেন। প্রায় সকল কবিতাগুলিই স্বভাবপূর্ণ ও মনোহর।

সহচর—(বৈশাখ, ১২৯৮)—কবিতাগুলির ভাষা সুললিত ও শ্রুতিমধুর। পুস্তকখানিতে ২৮টি সুন্দর কবিতা আছে।

সহযোগী—(আষাঢ়, ১২৯৮)—বিকাশ পাঠ করিতে সুখ আছে।

ইহার "বন্যছবি"তে সৌন্দর্য্য আছে, "অতীতে" চিন্তা আছে, "অমৃতকোলে" আশা আছে, "ঝটিকায়" গাম্ভীর্য্য আছে, "বাসনায়" মহত্ত্ব আছে। ইহা দুই আনা মূল্যে আশাতীত সুলভ।

গ্রামবাসী—(শ্রাবণ, ১২৯৮)—ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যে তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন। "অতৃপ্ত বাসনা", "তন্ময়", "বাসনা" ও "আঁখি" প্রভৃতি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

উলুবেড়িয়া দর্পণ—(১৩ই কার্ত্তিক, ১২৯৮)—প্রকৃত কবির হৃদয় যে কত উচ্চ, কত কোমল, সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার কিরূপ তীক্ষ্ণ শক্তিতে পূর্ণ থাকে, "বিকাশ" পড়িলে তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, "বিকাশ" প্রকৃতই স্বর্গীয় কবিতার বিকাশ।"

যে সকল পত্রিকার মতামত এখানে উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলির সবই আজ লুপ্ত। আবার সকলগুলি যে সমান স্তরের ছিল, তাও নয়। এর মধ্যে "ভারতী"ই বোধহয় সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল। ১২৯৮ সনে এ পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী। আরও যে সব পত্রিকার মতামত দীপ্তির পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার তুলনায় ঠাকুর পরিবার থেকে প্রকাশিত ভারতীর অভিমতের মূল্য অবশ্যই স্বতন্ত্র। তথাপি অন্যান্য পত্র পত্রিকাগুলির অভিমতও স্মরণীয়। সকলেই নবীন কবির মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা দেখেছিলেন।

অনেকের ধারণা ব্যর্থ লেখকেরাই সমালোচক হ'ন এবং বয়স্কপাঠ্য কবিতা রচনায় যাঁরা অক্ষম, তাঁরাই শিশুদের জন্য লেখনী ধারণ করেন। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অন্ততঃ কথাটি সত্য নয়। "বিকাশ" ও "দীপ্তি"র কবিতাগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় যে কোন নেতিবাচক কারণে অর্থাৎ বয়স্কপাঠ্য রচনায় অক্ষম হয়ে তিনি শিশুসাহিত্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নি।

অষ্টম অধ্যায়

বন্দেমাতরম

১৯০৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যোগীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী সঙ্গীতের সঙ্কলন "বন্দে মাতরম্" প্রকাশ করেন। ইতিপূর্ব্বে উনবিংশ শতকের শেষভাগেই অংশতঃ ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে, অংশতঃ ইংরেজ শাসনের কঠোরতায় বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ উদ্দীপিত হয়েছে। তত্ত্ববোধিনীসভা, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এই ব্যাপারে প্রেরণা দিয়েছেন।

সেই সময় বাংলায় বোধ হয় এমন কোন বিখ্যাত কবি ছিলেন না যিনি স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করে এই ভাব-বন্যাকে স্ফীত করেন নি। বাঙ্গালী চিরকালই ভাবপ্রবণ জাত। তার জন্যও বটে আর ইংরেজের শাসনের লৌহমুগুরটা তার মস্তকেই বেশী করে আঘাত করেছিল বলেও বটে, নির্ঝরের মত ঝরঝর ধারে ঝরে পড়েছিল জাতীয় সঙ্গীত লহরী। সে বন্যায় বাঁধ দেবার সাধ্য ইংরেজের ছিল না। তাই এইসব কবিতা পাঠ করা বা সঙ্গীত গাওয়া ইংরেজের চক্ষে চরম অপরাধ ছিল কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ফাঁসির দড়ির বেড়াজালের মধ্যে দিয়ে যাঁরা লুকোচুরি খেলে গেছেন, তাঁদের দমন করে সে আইনের এমন সাধ্য ছিল না। সেই দুর্গম পথের পান্থরা এই স্বদেশী সঙ্গীত থেকে একদিন অপূর্ব্ব প্রেরণা পেয়েছেন। "বন্দে মাতরম্" যখন ১৩৫৫ সনে পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হ'ল, তার ভূমিকায় শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন,

"এগুলিকে ভুলিলে অতীতের ঐতিহ্য ও জীবনে পারম্পরিকতাকে হারাইয়া জাতির ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া পড়িবে। সেজন্য এগুলি যাহাতে বিস্মৃতির অতলস্পর্শে তলাইয়া না যায়, জাতির প্রাণস্পন্দনে এখনও গতিবেগ এবং শক্তির সঞ্চার করিয়া জাতীয় চিত্তের অবসাদ দূর করিতে সহায়ক হয়, তাহার জন্য এ সকল পুস্তক সংগ্রহ একান্ত আবশ্যক।"

প্রভাতবাবুর এই ভূমিকা থেকেই জানতে পারি যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এরপর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ঐ সঙ্গীতগুলির ইংরেজি অনুবাদ লাহোর থেকে প্রকাশ করেন শ্রীশচন্দ্র বসু ও হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেন শ্রীশবাবুর বন্ধু লালা লাধারাম নন্দ। তারপর ঢাকা থেকে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় "সঙ্গীত মুক্তাবলী" নামে এক বৃহৎ সংগ্রহ পুস্তক প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থেও জাতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ ছিল। পরে "স্বরলিপি গীতিমালা" নামে ঠাকুরবাড়ী থেকে একটি স্বরলিপি পুস্তক প্রকাশিত হয়, এই পুস্তকেও কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হয়। তারপর সরলা দেবী চৌধুরাণীর "শতগান" নামক একটি স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। প্রভাতবাবু লিখেছেন :—

"এ সমস্তগুলি বিদগ্ধ সমাজে আদৃত হইলেও জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় সঙ্গীতের আদর বাড়ে বিংশ শতকের প্রারম্ভে, স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। বাঙ্গলার কবিকুল এই সময়ে গানে গানে আকাশে বাতাসে জাতীয় ভাবধারার প্লাবন বহাইয়া দিলেন। এ সময়ে দলে দলে তরুণ গায়কগণ হাটে, মাঠে, ঘাটে স্বদেশী ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এ জন্য নূতন নূতন গানের চাহিদা হইতে লাগিল, পুরাতন সঙ্গীতগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া শিখিয়া লইবার আগ্রহও দেখা দিল। কিন্তু পূর্ব্বের সংগ্রহ পুস্তকগুলি তখন দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে সেই অভাব দূর করিতে যাঁহারা চেষ্টা পাইয়া ছিলেন, যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন তাঁহাদের সবার অগ্রণী। তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে "বন্দে মাতরম্" এই নামে তখনকার প্রায় সকল জনপ্রিয় গানের একটি সংগ্রহ পুস্তক বাহির করিয়া দেশের একটি মহৎ অভাব পূরণ করিলেন।"

১৯০৫ সনে প্রকাশিত এই সঙ্কলনের ভূমিকা লিখেছিলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। এই স্বদেশপ্রেমিক মহারাস্ট্রীয় ব্রাহ্মণ "দেশের কথা" নামক একটি বাংলা পুস্তক রচনা করে বাংলাসাহিত্যের আসরে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। "বন্দে মাতরম্" এর ভূমিকায় সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় ভারতের তদানীন্তন নবজাগ্রত পেট্রিয়টিজমের কথা উল্লেখ করে লিখলেন,

"মুসলমান আমলে ভারতবাসী পরতন্ত্র হইলেও এরূপ পরাধীন ছিল না। ইংরাজের আমল হইতেই ভারতে প্রকৃত পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার সূত্রপাত হইয়াছে। এই পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার বিষময় ফলে দেশের লোকের আর পূর্ব্বের ন্যায় সংকল্প দৃঢ়তা নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য নাই, সকলেই জড়পিণ্ডবৎ নিশ্চল ও নির্জীব অবস্থায় কালহরণ করিতেছে, দেশের জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ দেশের ও সমাজের এই দুরবস্থা দর্শনে হৃদয়ে ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছেন, নানা সঙ্গীত ও কবিতার আকারে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান কালের স্বদেশভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলির উৎপত্তির কারণ।

... ...

জাতীয় সঙ্গীত ভিন্ন জাতীয় চিত্তের অবসাদ দূরীভূত হয় না, জাতীয়-ভাব যথোচিত বল-বেগ লাভ করে না। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের আশায় বর্ত্তমান সঙ্গীত গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় "বন্দে মাতরম্" প্রচার করিতেছেন। এ দেশের প্রসিদ্ধ কবিগণের উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বজন প্রশংসিত জাতীয় কবিতা ও সঙ্গীতগুলির অধিকাংশ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।"

বইখানির নাম অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতটিই গ্রন্থে প্রথম স্থান লাভ করেছে। আর শেষ হয়েছে ঐ সঙ্গীতের ইংরেজী অনুবাদ দিয়ে। নাম না জানা অনুবাদকের এই অনুবাদটি স্মরণীয়। সেটি এইরূপ ঃ—

Hail, Mother;
Sweet Thy water, sweet Thy fruits,
Cool blows the scented south wind,
Green waves Thy corn
Mother!

Land of the glad white moonlit nights,
Land of trees with flowers in bloom,
Land of smiles, land of voices sweet,
Giver of joy, giver of desire,
Mother!

Seventy million voices resounding,
Twice seventy million arms in resolve
uplifting

Dare they call Thee weak?
Obeisance to Thee! O Thou, mighty
with multiple might,
Redeemer Thou, Repeller of the enemy's
host Mother!
In Thee all knowledge, Religion Thou,
Thou the heart, Thou the seat of life,
The breath of life in the flesh!
O Mother, the strength of this arm Thine,
Thou the devotion in the heart!
Thine the image consecrate
From temple to temple!
The wielder of ten arms, Durga, Thou,
Thou the goddess of wealth,
bower'd in the lotus
Thou the Muse dispensing wisdom,
Obeisance to Thee
Salutations to Thee! Holder of
wealth, Peerless
With thy limpid water and luscious fruit
Mother! Hail Mother!
Verdant, unsophisticated, sweet smiling,
Radiant, holding, nourishing Mother,
Mother, Hail!"

"বন্দে মাতরম্" এর দাম মাত্র চার আনা থাকাতে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ ছিল কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ ১৯০৫ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এর তিনটি সংস্করণ শেষ হবার সেইটিই একমাত্র কারণ ছিল না। বাংলা, তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯০৫ সন নানা কারণে স্মরণীয় বৎসর। লর্ড কার্জন তখন কূটনৈতিক কারণে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করতে উদ্যত। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধকে উদ্দীপ্ত করে রবীন্দ্রনাথ তখন নানাস্থানে তেজোগর্ভ বক্তৃতা দিচ্ছেন, প্রবন্ধ ও গান লিখছেন। ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট বাঙ্গালী ঘোষণা করল যতদিন না বঙ্গ ভঙ্গ রদ হয়,

ততদিন তারা ইংরেজের তৈরী জিনিষ বর্জ্জন করবে। এই পরিস্থিতিতেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

"আমি পরের ঘরে কিনব না আর
ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি।"

লিখলেন, "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
এমন শক্তিমান!
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান,
তোমাদের এমনি অভিমান"

স্বভাবতঃই এ সকল গীত সেদিন দেশবাসীর অন্তরে যে সাড়া জাগিয়েছিল, তা অভূতপূর্ব্ব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গানের বন্যায় দেশ প্লাবিত করলেও শুধু রবীন্দ্র সঙ্গীত গান করেই সেদিন বাঙ্গালী ক্ষান্ত হয় নি। জাতীয়তামূলক বহু পুরানো সঙ্গীত গেয়ে তারা সেদিন নিজেদের নূতন করে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত করেছে। স্বভাবতঃই যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সঙ্কলন "বন্দে মাতরম্" বাঙ্গালী পরম সমাদরে গ্রহণ করল। শুনেছি, বঙ্গ-ভঙ্গ নিরোধের জন্য যে National Fund স্থাপিত হয়েছিল, প্রথম দু একটি সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ যোগীন্দ্রনাথ সেই Fund-এ দান করেন। "বন্দে মাতরম্" এর প্রথম সংস্করণ দুটি খণ্ডে সমাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ প্রথমে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের কোনও পরিকল্পনা যোগীন্দ্রনাথের মনে ছিল না। কিন্তু সঙ্কলন-গ্রন্থটির জনপ্রিয়তায় প্রেরণা পেয়ে এই খণ্ড তিনি পরে সঙ্কলন ও প্রকাশ করেন। পুস্তকটির ষষ্ঠ সংস্করণ (প্রকাশের কাল ১৯০৮ বর্ত্তমানে বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ এই সংস্করণের পরই পুস্তকটির প্রচার বন্ধ করা হয়।

তৃতীয় সংস্করণের একখানি গ্রন্থে দেখছি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের "অয়ি ভুবনমনমোহিনী", "সোণার বাংলা", "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্", "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" ইত্যাদি পনরটি সঙ্গীত সঙ্কলিত হয়েছে। এ ছাড়া আছে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সেই বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীত "কতকাল পরে, বল ভারত রে! দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে?",

অতুলপ্রসাদ সেনের "উঠ গো ভারত-লক্ষ্মি, উঠ আদি জগৎ জন পূজ্য", সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সবে ভারত সন্তান", দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "উৎসাহ-অনল", "গৌরী মধ্যমান" (যেই দেশে আজ কর বিচরণ, পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে", কামিনী রায়ের "মা আমার" (যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন, হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন) ও "আশার স্বপন" (তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন, শুনে যা আমার আশার কথা)।

মাইকেল মধুসূদন, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সরলা দেবী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, নবীনচন্দ্র সেন, মনোমোহন বসু, রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দীনেশচন্দ্র বসু প্রভৃতি সে যুগের সব বিখ্যাত কবির স্বদেশ সঙ্গীতই গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছিল। আর স্থান পেয়েছিল অজ্ঞাতনামা কোন লেখক বা লেখিকার একটি রচনা। রচয়িতার নামের স্থলে শুধু লেখা আছে সু—। রচনাটির নাম উপনয়ন। এটি অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না। সেজন্য এস্থলে সেটি উদ্ধার করছি :—

উপনয়ন

"আজি তব ভগ্ন দেবালয়ে হোমানল
ভাল করি জ্বাল, ওগো তাপস মহান্!
বাজাও তোমার শঙ্খ, বাজাও বিষাণ,
তারস্বরে কর উচ্চারণ অনর্গল
বীজমন্ত্র তব। এসেছি আমরা আজ
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, বালবৃদ্ধ যুবা নারী
তব ভক্তদল ;—দাও দীক্ষা, দাও সাজ
বৈরাগ্যের পবিত্র গৈরিক, ব্রহ্মচারী
আজি হতে মোরা ; লভি নবজীবনের
দ্বিজত্ব নবীন! শূদ্র বিপ্রে স্ত্রীপুরুষে,
দাও কণ্ঠে যজ্ঞ উপবীত সকলের
নির্ব্বিচারে। আজি এই মঙ্গল-প্রত্যূষে
তব যজ্ঞকুণ্ড হতে যজ্ঞানল লয়ে
গৃহে ফিরি যাই সবে অগ্নিহোত্রী হয়ে!"

সখারাম গণেশ দেউস্কর "বন্দে মাতরম্"এর ভূমিকার শেষে গ্রন্থটির আরও একটি বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেছেন—সেটিও স্মরণযোগ্য। বন্দে মাতরম্ মুদ্রিত হয়েছিল স্বদেশী কাগজে। একে নাম বন্দে মাতরম্, তার উপর এক সঙ্গে সে যুগের বা তার পূর্ব্ববর্ত্তী সব বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীত সঙ্কলন, স্বভাবতঃই হু হু করে বই বিক্রী হয়ে গেল। ষষ্ঠ সংস্করণের পর আর কোনও সংস্করণ সম্ভবতঃ প্রকাশ হয় নি, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বন্দে মাতরম্ প্রকাশিত হয়েছিল তা সার্থক হয়েছিল বলেই মনে হয়। পুস্তক প্রচার বন্ধ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে যে মঙ্গলগীত ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, তা রোধ করা সেদিনকার ইংরেজের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারত মুক্তিলাভ করবার পর ১৩৫৫ সনের আষাঢ় মাসে বন্দে-মাতরমের একটি পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই নূতন সংস্করণে ৩২টি নূতন সঙ্গীত স্থান লাভ করেছে। তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ধনধান্য পুষ্পে ভরা", "যেদিন সুনীল জলধি হইতে", "বঙ্গ আমার, জননী আমার", "ভারত আমার, ভারত আমার", রবীন্দ্রনাথের "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে", "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে", "তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে", "বাঙলার মাটি, বাংলার জল", "দেশ দেশ নন্দিত করি", "হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে", "ও আমার দেশের মাটি, তোমার প'রে ঠেকাই মাথা", "জনগণ মন অধিনায়ক", অতুলপ্রসাদ সেনের "বল বল বল সবে, শত বীণাবেণু রবে", "হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর", নজরুলের "এই শিকল পরা ছল, মোদের এই শিকল পরা ছল", ও "দুর্গম গিরি কান্তার মরু" এগুলি উল্লেখযোগ্য। এর সঙ্গে পাই অভ্যুদয়ে প্রকাশিত কোন অজ্ঞাত লেখকের রচনা "জাগে নব ভারতের জনতা, একজাতি একপ্রাণ একতা" ও "বন্ধন ভয় তুচ্ছ করেছি, উচ্চে তুলেছি মাথা, আর কেহ নয়, জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা।" এছাড়া কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সুন্দর রচনাটিও পুস্তকে স্থান পেয়েছে ঃ—

"ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্,
এই বেলা তুই দিয়ে দেনা!
ওরে, মায়ের তরে প্রাণটি দেবার
এমন সুযোগ আর হবে না।

যখন দুদিন আগে, দুদিন পরে তফাৎ মাত্র এই,—
তখন অমূল্য এ মানব-জনম বৃথা দিতে নেই :—
ওরে ক্ষ্যাপা !
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন, দে রে মায়ের তরে,
অমর জীবন পাবি রে ভাই, জগৎ মায়ের ঘরে ;
কি দিয়েছিস্ লিখবে যখন পরকালের খাতা—
তখন তোরই দানে হবে উজল বইয়ের প্রথম পাতা ;
ওরে ক্ষ্যাপা !

সত্যই সেদিন একটা ক্ষ্যাপামির বান ডেকেছিল। সেই বন্যায় ভেসে যাঁরা অগ্র-পশ্চাৎ ভাবেননি, স্বজন পরিবারের কথা স্মরণ করেননি, যাঁদের মধ্যে একদিন "পড়ি গেল কাড়াকাড়ি, আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি," সেই সব মহাপ্রাণকে যে সব স্বদেশী সঙ্গীত একদিন প্রেরণা দিয়েছিল, তার একটি সার্থক সঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ। সঙ্গত কারণেই ৩৩ বৎসর পরে প্রকাশিত পরবর্তী সংস্করণের আকার পরিবর্দ্ধিত হয়েছে।

মূল গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর ৬০ বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে ৬০ বৎসর যত দীর্ঘ সময়ই হোক, একটি জাতির জীবনে ৬০ বৎসর অতি অল্প সময়, কিন্তু ভারতে এই ৬০ বৎসরের মধ্যে যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই সময়ের মধ্যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে কিন্তু তবুও এই সঙ্গীতগুলির প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটেছে কিনা বলা যায় না। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের ভূমিকায়) ঠিকই বলেছেন, "সে সময়ের প্রয়োজন এগুলি মিটাইয়াছে ও জাতীয় আন্দোলনকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে কিন্তু উহার প্রয়োজন আজও মেটে নাই। বিশেষভাবে যে সমস্ত ঘটনা বা বিষয় জাতির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খাকে জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে, সেগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা স্বাধীন ভারতে আজ বেশী প্রয়োজন।"

নবম অধ্যায়

খুকুমণির ছড়া

যোগীন্দ্রনাথের স্বরচিত ছড়া গল্প গানের সঙ্গে তাঁর ঝুলির মধ্যে একটি অপূর্ব্ব সঙ্কলন গ্রন্থ দেখি। বইখানির নাম হল "খুকুমণির ছড়া"। শিশু মনোহর ৪১০টি ছড়ার সঙ্কলন এই গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশের তারিখ ছিল ১৩০৬ সন। এর ভূমিকা লিখেছিলেন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়।

গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে সামান্য কিছু টাকা (পাঁচ কিংবা দশ) পুরস্কার ঘোষণা করে যোগীন্দ্রনাথ সর্ব্বসাধারণের নিকট হতে প্রচলিত মেয়েলি ছড়া সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ একটি সভায় "মেয়েলি ছড়া" নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তারপর স্বয়ং কবিতা সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হ'ন। তাঁর সেই সংগ্রহ কিছুকাল ধরে বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর কোনও অজ্ঞাত কারণে এই সংগ্রহ অথবা পত্রিকায় তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বা যোগীন্দ্রনাথ কে প্রথম ছড়া সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন, তা জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য গ্রন্থে তাঁর সংগৃহীত এই ছড়াগুলি "ছড়া সংগ্রহ" নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়। যোগীন্দ্রনাথ নিজের সংগৃহীত ছড়াগুলিকে সম্পাদনা করে "খুকুমণির ছড়া" নামে প্রকাশ করেন। খুকুমণির ছড়ার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের ছড়া সংগ্রহের উল্লেখ আছে! তার থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথই প্রথমে ছড়া সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হন কিন্তু কারো কারো মতে যোগীন্দ্রনাথ যখন ছড়াগুলি সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, সেই একই সময়ে রবীন্দ্রনাথও ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত ছিলেন এবং "মেয়েলি ছড়া" নাম দিয়ে কোন সভায় সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সুতরাং দুজনে একই সময়ে এই কাজে ব্রতী হন বলে মনে হয়।

লোক সাহিত্যে "ছড়া সংগ্রহ" নাম দিয়ে ৮১টি ছড়া আছে। খুকুমণির ছড়ার ৪১০টি ছড়ায় রবীন্দ্রনাথের এই ছড়া সংগ্রহের অনেকগুলি ছড়া পাই, আবার এমন বহু ছড়াই পাই যা "ছড়া সংগ্রহ"তে নাই। কোন কোন

ক্ষেত্রে দুই গ্রন্থে একই ছড়ার দুই রূপ দেখি। যথা, রবীন্দ্রনাথের ছড়া সংগ্রহের প্রথম ছড়াটি হল :—

"মাসি পিসি বনগাঁ বাসী বনের ধারে ঘর।
কখনো মাসি বলেন না যে খই মোয়াটি ধর॥
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
এতদিনে জানিলাম মা বড় ধন॥
মাকে দিলুম আমন দোলা।
বাপকে দিলুম নীলে ঘোড়া॥
আপনি যাব গৌড়।
আনব সোনার মউর॥
তাইতে দেব ভায়ের বিয়ে।
আপনি নাচব ধেয়ে॥"

এই ছড়ারই একটি রূপান্তর পাই খুকুমণির ছড়ায়। তার প্রথম চারটি পংক্তি এই ছড়ারই মতন কিন্তু পঞ্চম পংক্তি থেকে পাঠ এইরূপ হয়েছে :—

"মাকে দিলাম সরু শাঁখা, বাপকে নীলে ঘোড়া,
আপনি যাব গৌড়, আনব সোনার ময়ুর,
দেব ভায়ের বিয়ে, ফুল চন্দন দিয়ে।
কলসীতে তেল নাইক, নাচব ঘিয়ে ঘিয়ে।
একদিকে রে বেগুণ ভাজা, একদিকে রে ঝোল,
নাচত কলা বউ, বাজিছে ঢোল!"

আবার খুকুমণির ছড়াতেই এর আর একটি রূপান্তর পাই :—

"মাসী পিসী বন-কাপাসী, বনের মধ্যে টিয়ে,
মাসী গিয়েছে বৃন্দাবন, দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন—
এতদিনে জান্‌লাম, মা-বাপ বড় ধন।" ইত্যাদি

এই রকমই বহু ছড়ার দুটি বা ততোধিক রূপ দুই গ্রন্থে দেখা যায়। এই রূপান্তরের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে সর্ব্ব প্রথমে আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাংলায় তথা ভারতে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের বহু পূর্ব্বে এদের জন্ম এবং

ছড়াগুলি লেখবার, বা পড়বার জন্য নয়, গুনগুনানি সুরে শিশু শ্রোতার সামনে গাইবার জন্য রচিত হয়েছিল। এই ছড়াগুলি কবে কোন বিস্মৃত অতীতে জন্মলাভ করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, কেউ তার ইতিহাস জানে না। তবে একথা অনুমান করা কঠিন নয় যে যখন দুধে দাঁত না পড়া ছোট্ট খুকীটি নাকের নোলক দুলিয়ে আর পায়ের মল বাজিয়ে বেনারসী চেলীর ঘোমটার মধ্যে পুটুলীটি সেজে পাল্কী চড়ে শ্বশুরবাড়ী গেছে, তখনও তার কানে গুনগুন করে বেজেছে শিশুকালে মা, জ্যেঠিমা বা ঠাকুরমার কাছে শোনা ছড়াগুলি।

সেই খুকুটিই যখন কালক্রমে নবীনা জননী হয়েছে ছড়ার কথাগুলি ঠিক মনে পড়ে নি। বিস্মৃত কথায় ফাঁক পূর্ণ করতে হয়েছে নিজের সৃজনী-শক্তি দিয়ে। তাই একই ছড়া ভিন্ন গাঁয়ে গিয়ে ভিন্ন রূপ নিয়েছে। এই ছড়া গুলিকে তাই আক্ষরিক অর্থে শ্রুতি বা স্মৃতি বলা চলে। কালি কলম কাগজের সঙ্গে এদের কোনকালেই কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে এ ছাড়াও একটি কারণে একই ছড়ার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পাই। যোগীন্দ্রনাথ যে ছড়াগুলি সংগ্রহ করেছিলেন, শুনেছি তার মধ্যে অনেকগুলিতে ছন্দ মিল যথাযথ ছিল না। আবার অনেকগুলির ভাষা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট ছিল। সেগুলিকে প্রকাশ করবার পূর্বে যোগীন্দ্রনাথকে অনেক পরিশ্রমে তার ভাষা সংশোধন করতে হয়েছে। হয়ত রবীন্দ্রনাথও নিজের ছড়া সংগ্রহ প্রকাশের পূর্বে সেগুলকে সম্পাদনা করে থাকবেন। সুতরাং সঙ্গত কারণেই দুজনের সংগৃহীত ছড়ায় ভাষার তারতম্য থেকে গেছে কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ভাষান্তরের জন্য সম্পাদনা দায়ী নয়, স্থানকাল পরিবর্তনও ভাষার বৈচিত্র্যের জন্য অবশ্যই অংশতঃ দায়ী।

Geneva থেকে International Bureau of Education ১৯৩২ সনে Children's Books and International Goodwill এর যে Report and Booklist প্রকাশ করেন, তাতে "খুকুমণির ছড়া"র পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "Short poems of the nursery rhymes type.

সত্যই ইংরেজী nursery rhymes এর সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এই ছড়াগুলি ঠিক ইংরেজী nursery rhymes নয় কারণ

সেগুলিকে বাংলা ছেলে ভুলানো ছড়ার চেয়ে অনেক বেশী সুপরিকল্পিত বলে মনে হয়। সেগুলির পংক্তিগুলিতে পূর্বাপর অর্থসঙ্গতি পাওয়া যায় আর একটি ছড়ার মধ্যেও খোকা খুকুর বিয়ের নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না। বাংলা ছড়াগুলিতে অর্থ সঙ্গতি নাই বললেই চলে, আছে শুধু ছবির পর ছবি, আর প্রায় প্রত্যেকটিতেই শাশুড়ী, বউ বা খুকুর শ্বশুর বাড়ীর উল্লেখ। এর মূলে আছে আমাদের দেশের সনাতন ব্যবস্থা। বিবাহ অনুষ্ঠানটি আমাদের দেশে চিরকাল একটা পারিবারিক অনুষ্ঠান ছিল। তাই খোকা বা খুকুর জন্মমাত্র জননীর মনে তার "বিয়ে"র চিন্তা আনাগোনা করত। ইংরেজী nursery rhymesএ বিয়ের উল্লেখ একেবারেই পাই না। বিবাহ অনুষ্ঠানটা যে দেশে ব্যক্তিগত ব্যাপার, সে দেশে শিশুকে ভোলাতে গিয়ে ঐ প্রসঙ্গের অবতারণা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের দেশে nursery বলে পৃথক কোন ঘর কোনদিন ছিল না। জন্মের পর থেকেই শিশু বহু পরিজনের মাঝে মানুষ হ'ত। তাই তাকে আদর করবার জন্য যাঁরা ছড়া বেঁধেছিলেন বহু পারিবারিক কথাও তাঁদের ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়।

আবার শিশু মনস্তত্ত্বও যে তাঁরা একেবারে বুঝতেন না, তা নয়। নিয়মের রাজ্যে বিপর্যয় শিশুর প্রিয়। তাই অনেক ছড়াতেই এমন ভাব পাওয়া যায়, চলতি কথায় বলতে গেলে, যার মাথামুণ্ডু নাই। এমনি একটি ছড়া :—

"আদুড় বাদুড় চাল্‌তা বাদুড়
কলা বাদুড়ের বে ;
বাদুড় ঝুমকো নাড়া দে!
চামচিকিতে বাজনা বাজায়,
খ্যাংরা কাটি দে।"

শিশুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুম পাড়ান ছড়াগুলির অন্যতম কাজ ছিল। কিন্তু শিশুও তো সব সময় শান্তশিষ্ট হয়ে ঘুমোতে রাজী নয়। তাই অনেক সময় জননী তাকে ভীতি প্রদর্শন করে ছড়া গাইতেন :—

"যাদু, ঘুমো রে ঘুমো,
শান্তিপুরে বাঘ এসেছে
দারুণ হুমো।"

এসব ছড়া যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরা সকলেই যে শিশু মনস্তত্ত্বের পণ্ডিত ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। ভয় দেখালে যে শিশুর মানসিক গঠন বিকৃত হয়ে যেতে পারে, সে জ্ঞান এই পল্লীবাসিনী অর্দ্ধশিক্ষিতা এবং অনেক সময় অশিক্ষিতা রমণীদের অনেকেরই ছিল না। শিশু ঘুমের আগে বায়না ধরলে তাকে থামাবার সহজতম পদ্ধতি ছিল তাকে ভয় দেখিয়ে ছড়া বলা। তাই সেরকম ছড়াও "খুকুমণির ছড়া"য় পাই :—

"এক যে আছে একানোড়ে,
সে থাকে তালগাছে চড়ে,
দাঁত দুটো তার মূলোর মত,
পিঠখানা তার কুলোর মত,
কান দুটো নোটা নোটা,
চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা।
কোমরে বিচুলির দড়ি,
বেড়ায় লোকের বাড়ী বাড়ী।
যে ছেলেটা কাঁদে,
তারে ঝুলির ভিতর বাঁধে,
গাছের উপর চড়ে
আর, তুলে আছাড় মারে!"

আবার শিশু কান্না বন্ধ করবার জন্য কিছু কৌতুককর ছড়াও পাই। যথা :—

"আঁটুল বাঁটুল শ্যাম্‌লা সাঁটুল
শ্যাম্‌লা গেল হাটে ;
শ্যামলাদের মেয়ে দুটি
পথে বসে কাঁদে।
আর কেঁদ না, আর কেঁদ না,
ছোলা ভাজা দেবো ;
আর যদি কাঁদো, তবে
তুলে আছাড় দেবো!"

অবশ্য কান্না থামাবার জন্য শুধু যে শিশুকে ভয় দেখিয়ে ছড়া রচিত হত তাই নয়। যে ভয়ঙ্কর বিভীষিকার ছবি শিশুকে ঘুম পাড়ানর বদলে তার

ঘুম তাড়িয়ে দিতে পারে, সেই ভয়ঙ্করকেও অনেক সময় ভয় দেখান হয়েছে। যথা ঃ—

"কাঁদুনে রে কাঁদুনে, কুলতলাতে বাসা ;
পরের ছেলে কাঁদবে বলে, মনে ক'রেছ আশা।
হাত ভাঙ্গবো পা ভাঙ্গবো, ক'রবো নদীর পার,
সারা রাত কেঁদ না যাদু, ঘুমাও একটিবার।"

আবার ভাল কথা বলে ঘুম পাড়ানরও কত ছড়া আছে। "ঘুমপাড়ানী মাসিপিসী ঘুম দিয়ে যা"তো আছেই। তাছাড়াও আছে ;—

"ঘুম আয় রে, ঘুম আয় রে,
দেবো ছানা ননী ;
ঘুম যায় রে, ঘুম যায় রে
সোণার যাদুমণি !
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় রে,
দেবো মিঠাই খেতে ;
খুকুর চোখে ঘুম আয় রে,
সোণার পিঁড়ি পেতে।"

এরই একটু রকমফের দেখি,

"ঘুম আয় রে, ঘুম আয় রে,
সোণার যাদুমণি,
দেব ছানা ননী ;
আসবি রে মণির চোখে,
কত ভালবাসবো তোকে,
হীরের বালা মুক্তোর মালা
ক'রবো কত দান ;
বাটী ভ'রে দুধ খাওয়াবো
বাটা ভ'রে পান !"

অর্থাৎ খোকা বা খুকু যদি না ঘুমোয়, দোষটা তার নয়, দোষ ঘুমের। তাই তাকে নানা প্রলোভন দেখান হয়। দুধ খাওয়ান হয়, পান খাওয়ান হয়, তার সঙ্গে হীরে মুক্তোর বালা দান করা হয়। উৎকোচদানের

ইতিহাস সম্বন্ধে যদি কেউ গবেষণা করেন, তাঁকে এই ছড়াটির বিষয় মনে রাখতে অনুরোধ করব।

"ঘুমপাড়ানী মাসিপিসীর" আবার বিভিন্নরূপ আছে। এর সঙ্গে আছে সর্ব্বজন পরিচিত সেই পুরানো ঘুমের ছড়া:—

"খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল
বর্গী এল দেশে;
বুলবুলীতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেবো কিসে?"

খুকুমণির ছড়ার ৪:০টি ছড়ার মধ্যে মাত্র কয়েকটি ছড়ায় "খুকুমণির" কথা আছে। তার মধ্যে অধিকাংশই খুকুর বিবাহ সংক্রান্ত ছড়া। যথা:—

আমার মনুরাণীর বে
খাওয়ান দাওয়ান যেমন তেমন
বাজনা শোন সে।"

আরও আছে:— "খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ী,
সঙ্গে যাবে কে?
বাড়ীতে আছে হুলো বেড়াল,
কোমর বেঁধেছে।
আম কাঁঠালের বাগান দেবো,
ছায়ায় ছায়ায় যেতে;
শান বাঁধান ঘাট দেবো
পথে জল খেতে।
ঝাড়-লণ্ঠন জ্বেলে দেবো,
আলোয় আলোয় যেতে;
উড়কি ধানের মুড়কি দেবো
শাশুড়ি ভুলাতে!
শাশুড়ি ননদ ব'লবে দেখে,
"বৌ হয়েছে কালো!"
শ্বশুর ভাশুর বলবে দেখে,
ঘর করেছে আলো!"

বাংলা ছেলে ভুলানো ছড়ায় অর্থসঙ্গতি নাই বলেছি। তবে এই ছড়াটির দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে কথা ভুল মনে হবে। যে কচি শিশুটির ভাবী শ্বশুরগৃহযাত্রার চিত্র তার জননী এতে অঙ্কিত করেছেন, তার নিকট শ্বাশুড়ী ননদের অপেক্ষা গৃহপালিত হুলো বেড়ালটি অনেক বেশী পরিচিত এবং প্রিয়। হয়তো সেইজন্যই জননী তাকে প্রথমেই আশ্বাস দেন যে হুলো বেড়ালটি অবশ্যই তার সঙ্গে যাবে। এই মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য সে এখন থেকেই কোমর বেঁধেছে। কিন্তু শিশুকে ভোলাতে গিয়ে জননী কন্যার অবশ্যম্ভাবী বিদায়ের কথা বিস্মৃত হন না এবং নিজের বেদনা লঘু করবার জন্য, তাঁর খুকুকে তিনি যত আয়োজন, উপকরণের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবেন, তারই ফিরিস্তি দিতে বসেন। তালিকার প্রথমেই অবশ্য তিনি তাঁর স্নেহের পসরা উজাড় করে তাকে একটি আস্ত আম কাঁঠালের বন দান করে ফেলেন, যাতে সে পথে রৌদ্র তাপে কষ্ট না পায় কিন্তু শুধু আম কাঁঠালের ছায়াই তো যথেষ্ট নয়। পথে যদি কন্যার তৃষ্ণা পায় তার জন্য শান-বাঁধান দীঘির ঘাটটি পর্য্যন্ত উদারহৃদয়া জননী তাকে দিচ্ছেন, তার সঙ্গে আছে রাত্রে পথের অন্ধকার দূর করবার জন্য ঝাড়-লণ্ঠন। এত সব দান করবার পর বোধ হয় তরুণী জননীর সহসা মনে পড়ে যায় যে বধূ শ্বশুরগৃহে গেলে তার শ্বাশুড়ী ননদও কিছু উপহার আশা করতে পারেন। তাই সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু উদার-হৃদয়ার দাক্ষিণ্যে প্রসারিত হস্ত সহসা কার্পণ্যে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে অর্থাৎ শ্বাশুড়ী ননদকে ভোলাতে "উড়কি ধানের মুড়কি" ছাড়া আর কিছুই জোটে নি।

বাংলাদেশ একদিন ছিল কন্যা বিদায়ের দেশ। জন্মমাত্রেই তার বিদায়ের চিন্তা, সে জনক জননীকে পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণ করত না, বয়ঃপ্রাপ্ত হলে উপার্জ্জন করেও খাওয়াত না। তাই তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে নামত বিষাদের ছায়া। পৌত্রটি যে পিতামহীর নয়নের মণি, পৌত্রীটি হত তাঁরই দু'চক্ষের বিষ। তাই তার জন্মের আগমনীর সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জ্জনের সুর বাজত। তাকে গৌরীদান করতে পারলেই পিতামাতার পুণ্য—সে অরক্ষণীয়া হলে তাঁদের চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ।

কিন্তু তরুণী জননীর মন তো সে কথা মানে না। তাই তিনি খুকুর প্রতি সকলের অবহেলা দেখে চুপে চুপে ছড়া কাটেন ঃ—

"খুকুনবালা, টাকার ছালা
মটকী ভরা ঘি,
খুকুর ভাতে ভোজ হ'ল না
ছি! ছি! ছি!"

এ ধিক্কার খুকুকে নয়, তার বাপপিতামহীকে যাঁরা টাকার ছালা এবং মটকীভরা ঘি থাকা সত্ত্বেও খুকুকে অবহেলা করে তার ভাতে ভোজ দিলেন না। এই রকম ধিক্কার আছে অন্য একটি ছড়াতে ঃ—

"আমার মনুরাণীর বে।
খাওয়ান দাওয়ান যেমন তেমন
বাজনা শোন সে।"

অর্থাৎ খুকুর প্রতি পরিজনবর্গের ব্যবহার থেকেই জননী আন্দাজ করেছেন অদূর ভবিষ্যতে তাঁর শিশু কন্যাটির বিবাহ-উৎসবে শুধু লোক দেখানো আড়ম্বরই হবে। খাওয়ান দাওয়ান হবে না।

তাঁর খুকুর জন্মের সময় থেকেই মায়ের মনের বিচ্ছেদ-বেদনার সুর বাজে। তাই তাকে দোলাতে দোলাতে ভুলাতে ভুলাতে সেই ব্যথাই ছড়ার আকারে তাঁর মুখ থেকে বার হয় ঃ—

"দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুণি।
বর আসবে যখনি,
নিয়ে যাবে তখনি।"

কখনও আবার বলেন ঃ—

"বাপ দিলেন শাঁখা শাড়ী, মা দিলেন ঝারি,
ঝপ করে মা বিদেয় কর, রথ এসেছে ভারী।
এ রথে যাব না মাগো, ফিত্তি রথে যাব,
সিকি পয়সার পান কিনে ননদ-ভাজে খাব।"

মেয়ে যেতে চায় না, মায়ের প্রাণও যেতে দিতে চায় না কিন্তু তবু হায়, যেতে দিতে হয়। অথচ মায়ের হৃদয় প্রথম থেকেই সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব অমঙ্গলের কথা ভেবেই ছড়া কাটে :—

"মাই গো চিনতে পার?
গোটা দুই অন্ন বাড়।
অন্নপূর্ণা দুধের সর,
কাল যাব গো পরের ঘর।
পরের বেটা মারলে চড়,
কাঁদতে কাঁদতে খুড়োর ঘর।
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি,
রেখে আয় গো মায়ের বাড়ী।
মা দিলে সরু শাঁখা, বাপ দিলে শাড়ী;
ভাই দিলে হুড়কো ঠেঙ্গা, চল শ্বশুরবাড়ী।"

কন্যার দ্বার হতে দ্বারে বিতাড়িত অবস্থা কল্পনা করে জননীর অশ্রু বাধা মানে না। ছড়াটি শুনলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মেয়েটি পিতৃমাতৃহীনা নয়। সুতরাং স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে স্বামীগৃহে আগত অতিথি "খুড়ো"কে সাধাসাধি করে পিতৃগৃহে যায় কিন্তু সেখানে মা, বাপ শাঁখা শাড়ী দিয়ে অভ্যর্থনা করলে কি হবে, উপার্জ্জনশীল ভাইটি তাকে রাখতে নারাজ। সে বোনকে "ঠেঙ্গা" মেরে গৃহদ্বার বন্ধ করে দেয়। এই ধরণেরই আর একটি ছড়া হ'ল :—

অনুপমা দুধের সর,
চায় না যেতে পরের ঘর।
বাপ বলেছে "আয়, আয়",
মা বলছে "থাক্";
বৌ ব'লছে, "দূর ক'রে দাও,
শ্বশুর বাড়ী যাক্।"

সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ভাই নয় ভ্রাতৃজায়াই অনুপমা নাম্নী কচি কিশোরী কন্যার পিতৃগৃহে অবস্থানের প্রধান প্রতিবন্ধক।

মনে রাখা আবশ্যক যে এই ছেলেভুলানো মেয়েলি ছড়ায় সেদিনের সমাজেরই একটি করুণ চিত্র দেখতে পাই। আর্থিক পরাধীনতা সেদিনকার গৃহকন্যা ও বধূদের জীবনে অভিশাপের মত ছিল। তাই শিশুকে ঘুম পাড়াবার জন্য রচিত ছড়াগুলির মধ্যেও জননী অনেক সময় তাঁর দেখা বা শোনা ঘটনাগুলি বা সেগুলি শোনার ফলে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া গোপন রাখতে পারতেন না। নিজের পিতৃগৃহে এবং শ্বশুরগৃহে তিনি নিরাশ্রয়া কিশোরী কন্যাদের যে দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা তাঁর মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গেছে। নিজের কন্যাটি যদিও নিতান্তই শিশু, তবু তার বিয়ের সময় আসতে তো বেশীদিন দেরী নাই। কন্যাকে আদর করতে করতে জননী তাই আপন অজ্ঞাতেই এই সব কল্পিত বিপদের কথা গুন্‌গুন্‌ করে গেয়ে চলেন।

কন্যার নিরাশ্রয় অবস্থার কল্পনা করে কন্যার নিজের জবানীতেও ছড়া কেটে জননী বলেন,

"মশার জ্বালায় বাঁচি না লো মশা ভন্‌ ভন্‌ করে,
মশার জ্বালায় গেলাম বনে, বাঘে দাঁত ঝাড়ে।
বাঘের ভয়ে গেলাম জলে, কুমীর এল ছুটে,
কুমীরের ভয়ে গেলাম বাড়ী, দাসীর মুখ ফুটে।
দাসীর ভয়ে গেলাম ঘরে, ননদে মন্দ বলে,
ননদের ভয়ে রাঁধতে গেলাম, শ্বাশুড়ী উঠে জ্বলে।"

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে মেয়েটির এতই নিরাশ্রয় অবস্থা যে শ্বশুরবাড়ীটির দাসীটিরও সে গৃহে বধূর অপেক্ষা অধিক প্রতিপত্তি। তাই শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটি "সুপ্রিম কোর্টেই" আপিল করে :—

"রাগ করো না শ্বাশুড়ী গো, আমি তোমার মেয়ে,
তুমি যদি তাড়াও, বলো, দাঁড়াই কোথা যেয়ে।"

কখনও বা অপাত্রে সমর্পিতা কন্যার ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় শিহরিতা জননী এই রকম ছড়াও রচনা করেন :—

"ঢাকায়েরা ঢাক বাজায়,
খালে আর বিলে,
সুন্দরীরে বিয়ে দিলাম,
ডাকাতের মেলে।

আগে যদি জানিতাম,
ভুলি ধরে কাঁদিতাম।"

আবার সর্ব্বরকমে দেখে শুনে কন্যাদান করেও তাকে বৈধব্য থেকে সব সময় বাঁচান যেত না। তারই সম্বন্ধে একটি ছড়া দেখি ঃ—

অলকমণি রাজার রাণী কি বলিব আর
অলকমণির কপাল পুড়ে হল ছারখার।
দুটো দুটো দাসী দিলুম পায়ে তেল দিতে,
দুটো দুটো চাকর দিলুম, কাঁধে ক'রে নিতে,
আম কাঁঠালের বাগান দিলুম, ছায়ায় ছায়ার যেতে,
উড়কি ধানের মুড়কি দিলুম, পথে জল খেতে,"

কিন্তু হায়, এত করেও অলকমণির বৈধব্য রোধ করা গেল না। তাই ছড়ার শেষ দুটি পংক্তি হ'ল ঃ—

রাজা গেল, রাজ্য গেল, গেল সমুদায় ;
বাতি দিতে রাজপুরীতে, নাই ক কেহ হায় !"

খুকুর সম্বন্ধে সব ছড়াতেই যে খুকুর বিয়ের কথা পাওয়া যায়, তা নয়। কোনও কোনও স্থলে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির প্রতাপে কন্যাকে যথা ইচ্ছা আদর করতে না পারার শোধ তোলবার জন্য জননী ছড়া গাঁথেন ঃ—

"এই মেয়েটা হ'ত বেটা,
দিতাম সোণার কোমর পাটা,
থাকতো লোকে চেয়ে ;
আমার বড় সাধের মেয়ে !"

আবার এরই রূপান্তর দেখি ঃ—

"মেয়ে নয় আমার সাত বেটা
গড়িয়ে দেবো কোমর পাটা,
দেখ্‌ শত্তুর চেয়ে,
আমার কত সাধের মেয়ে"

এ ছড়ার মধ্যে এমন একটি challenge এর ভাব আছে, যা প্রথম ছড়াটিতে পাই না। বেচারী বধূ নিরুপায় হয়ে দেখে তার "জা" এর

শিশু পুত্রটির কত আদর হচ্ছে, অথচ তার সন্তান কন্যা বলে তার কোনও কদর নাই। তাই সে সকলের অনভিমতে কন্যাকে গহনা গড়িয়ে দেবার সামর্থ্য থাক আর নাই থাক, সদম্ভে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে, "আমি আমার মেয়েকে কোমর পাটা গড়িয়ে দেবই।" সঙ্গে সঙ্গে একটু খোঁচা দেবার লোভ সংবরণ করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তাই সে বলে,

"দেখ শত্তুর চেয়ে"

এই ছড়ার আর এক রূপান্তর হল ঃ—

"মেয়ে নয় আমার সাত বেটা !
মেয়ের ভাতে ক'রব ঘটা ;
নথ ভেঙ্গে গড়িয়ে দেব
মেয়ের কোমর পাটা।',

অর্থাৎ আর কেউ মানে, তার স্বামী বা শ্বাশুড়ী যদি কন্যা নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ নাও করেন, তবু বধূ তা গ্রাহ্য করে না। তার যৌতুকের গহনাগুলি তো এখনও আছে। সে নিজের নথ ভেঙ্গে কন্যার জন্য কোমরপাটা গড়িয়ে দেবে।

খুকুকে শুধু আদরও যে একেবারে নাই, এমন নয় এবং অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে কন্যাকে আদরের বন্যায় ভাসাবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই দেখি জননী "পুঁটু" নামটি ব্যবহার করেছেন। যথা ঃ—

"পুঁটু যদি রে কাঁদে,
আমি ঝাঁপ দিব রে বাঁধে !
পুঁটু যদি রে হাসে,
আমি উঠব হেসে হেসে !
পুঁটু নাকি রে কেঁদেছে,
ভিজে কাঠে রেঁধেছে ?
কাল যাব মা গঞ্জের হাট,
কিনে আনব শুকনো কাঠ ;
পুঁটু রাঁধবে ডাল ভাত,
আমি কাটব আঙুট পাত।"

এস্থলে অর্থ আবিষ্কার করতে গেলে একটু গবেষণা প্রয়োজন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, পুঁটু তার জননীর এতই আদরের ধন যে সে হাসলে তিনি হাতে স্বর্গ পান আর কাঁদলে তিনি আত্মহত্যা করতেও পারেন কিন্তু তার পরই প্রশ্ন আসে, পুঁটু কাঁদল কেন? নিশ্চয়ই কেউ ভিজে কাঠের আগুনে রান্না করবার চেষ্টা করছিল। সেই কাঠের ধোঁয়া লেগেই পুঁটুর চোখে জল এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্নেহশীলা জননী গঞ্জের হাটে স্বয়ং গিয়ে (যেটি সেকালের এক নবীনা জননীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ঘটনা ছিল বললেই হয়) শুকনো কাঠ কিনে আনতে বদ্ধপরিকর হ'ন। অবশ্য কাঠ কেনা হয়েছিল তারই জন্য যে ভিজে কাঠে রান্না করে পুঁটুর চোখের জলের কারণ হয়েছিল। কিন্তু ছড়া শেষ হবার পূর্ব্বেই দেখা যায় যে, পুঁটুই সেই কাঠ জ্বালিয়ে ডালভাত রান্না করবে এবং সে রন্ধনের স্বাদের বিষয়ে নিঃসন্দেহ মুগ্ধা জননী তখনই খেতে বসবার জন্য পাতা কাটতে যেতে উদ্যত হন। বিভিন্ন পংক্তিগুলির ভাবের মধ্যে ঐক্য নেই ঠিকই কিন্তু তার জন্য পুঁটুর প্রতি ভালবাসায় অন্ধ জননীর হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশে কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি।

আবার পুঁটুর নামে আর একটি ছড়া :—

"পুঁটু আমার মেয়ের বরণ;
পুঁটু আমার চাঁদের কিরণ!
চাঁদ বলে ধায় চকোরিণী,
মেঘ বলে ধায় চাতকিনী,
পাড়ার লোক, পুঁটুর রূপ
কে দেখবি দেখ্‌সে আয়,
নবঘন মিশেছে তায়।"

মনে হয় এটি কালো মেয়ের মায়ের তৈরী ছড়া। পুঁটু কালো হলে কি হবে, সেই রূপই মায়ের কাছে চন্দ্রকিরণের সমান।

খুকুর মেঘের মত চুলের রাশি হবে, এই কামনায় জননী তার ভবিষ্যতের একটি মধুর স্বপ্ন দেখতে দেখতে কল্পনা করেন :—

"আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, সূয্যি গেল পাটে;
খুকু গেছে জল আনতে পদ্মদীঘির ঘাটে।

পদ্মদীঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল,
হেঁটোর নীচে দুলছে খুকুর গোছা ভরা চুল।
বৃষ্টি এলে ভিজবে সোনা, চুল শুখানো ভার,
জল আনতে খুকুমণি যায় না যেন আর।"

এই ছড়াটিকে একটি আধুনিক চা-কোম্পানী নিজেদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেছেন। ছড়ার পংক্তিগুলিকে একটু অদলবদল করে শেষে দুটি পংক্তি তাঁরা জুড়ে দিয়েছেন,

"চুল ভিজিয়ে খুকুমণির চক্ষু ছল ছল,
তাই দেখে মা চা করতে চড়িয়ে দিলেন জল।"

খুকুমণির ছড়ায় খোকার বৌকে নিয়েও অনেক ছড়া আছে। তার মধ্যে কতকগুলি সত্যাই কৌতুকাবহ। এমনি একটি ছড়াতে দেখছি :—

"খোকনমণির বিয়ে দেবো
হট্টমালার দেশে ;
তারা গাই-বলদে চষে ;
তারা হিরেয় দাঁত ঘসে ;
রুই মাছ কাতলা মাছ
ভারে ভারে আসে,
তাই দেখে খোকার মা
পেছন ফিরে বসে!"

খোকাকে এমন সম্পন্ন গৃহস্থঘরে বিয়ে দেবার কল্পনায় উচ্ছ্বসিত হতে গিয়ে কেনই যে তার জননী হঠাৎ ঈর্ষ্যায় পিছন ফিরে বসলেন, সে হল মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। ভাবী বৈবাহিকের অতটা বাড়বাড়ন্ত কারই বা সহ্য হয়? তাই আর একটি ছড়াতে খোকার মা নিজেদের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করতে করতে হঠাৎ বলে ওঠেন,

"বত্রিশ আড়ার ঘী কলসী,
সরু চালের ভাত,
খোকা খাবে সাপুর সুপুর,
বৌ কুড়াবে পাত।"

এই ছড়াটির অন্তরালে একটু সূক্ষ্ম ব্যঙ্গও থাকতে পারে। খোকার জননী হয়তো খোকার বউয়ের নামে ছড়া কেটে নিজের শ্বাশুড়ীর নীচ ব্যবহারেরই সমালোচনা করেন। মনে রাখতে হবে যে এই ছড়াগুলির রচয়িত্রী ছিলেন সেই বঙ্গরমণীরাই যাঁরা পরের ঘরে মেয়ে পাঠিয়ে শঙ্কিত দুরু দুরু বক্ষে তার মঙ্গলকামনা করে দেবতার পদে প্রার্থনা করতেন, আবার বধূ এলে তার সহস্র দোষত্রুটি ধরে পদে পদে তার লাঞ্ছনা করতেন। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের আচরণ লক্ষ্য করে এই ব্যঙ্গের ছড়া রচনা করেছেন—সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে অন্তঃপুরের প্রাচীরের অন্তরালে থাকলেও তাঁদের সূক্ষ্ম রসবোধের অভাব ছিল না।

(৩)

ছেলেভুলানো ছড়াগুলি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে আমরা এর মধ্যে প্রাচীন পল্লীবাংলার সমাজচিত্রের একটি অস্পষ্ট রূপরেখা পাই। সেই পল্লীবাংলার মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণী বধূটি খোকাকে কোলে করে ছড়া কাটে,

“খোকা যাবে বিয়ে করতে হস্তী রাজার দেশে,
তারা রূপোর খাটে পা রেখে, সোণার খাটে বসে!
ঘন আওটা দুধের উপর পুরু সর ভাসে!
খোকামণিকে সোহাগ ক'রে যৌতুক দিবে কি?
শাল দিবে, দোশালা দিবে, রূপবতী ঝি!”

গৃহস্থ ঘরের বধূটির এই কল্পনা অনেকটা অলীক স্বপ্নবিলাস হলেও সম্পূর্ণ আকাশকুসুম নয় হয়তো, কারণ মধ্যবিত্ত ঘরেও সেদিন আজকের মত এমন অনটন ছিল না। তাই পুষিকে ডেকে বলা চলত,

“আয় মেনি পুষ পুষ
দুধ খাবি আয়!
মাছ মেখে ভাত দেবো,
হাত দেবো গায়!“

চাঁদ মামাকে ডেকে বলা হ'ত,

“মাছ কাটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব।”

নিজেরা খেয়ে উদ্বৃত্ত থাকত বলেই পোষা বেড়ালটাকে বা চাঁদামামাকে এমন করে আমন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল। আবার ষোলটা কৈ কিনে "ষোল কৈ ষল্লুয়ে" ছড়া কাটা হ'ত। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে বাংলাদেশ সত্যই সেদিন ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা ছিল। আবার তারই মধ্যে বর্গীর হাঙ্গামা ছিল। পল্লীর শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবনে এই দস্যুরা এসে তুফান তুলে যেত। তারও চিত্র আছে ঘুমপাড়ানী ছড়াতে,

"খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল
বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কিসে ?"

শুধু ধানই নয়,

"ধান ফুরোল, পান ফুরোল
এখন উপায় কি ?"

তখন বর্গীকে ডেকে বলা হচ্ছে ঃ—

"একটু খানি সবুর কর
রসুন বুনেছি।"

অর্থাৎ যে ফসলই ফলুক বর্গীর হাত থেকে তার নিস্তার ছিল না। তবুও সেদিনের বাংলাদেশের গৃহস্থ মোটামুটি সম্পন্ন ছিল। তার অনেক চিত্রই পাওয়া যায় ছড়াগুলিতে। যথা ঃ—

"এক নৌকা আলো চাল, এক নৌকা ঘি,
দাদা গেছে বিয়ে কত্তে সওদাগরের ঝি।"

আবার এত বাড়বাড়ন্ত সত্ত্বেও দেশে কৃপণ গৃহিনীর অভাব ছিল না। "একপো দুধ কিনেছি, কি হবে তা বল না" ছড়াটি তারই এক উদাহরণ। এই একপো দুধেই তিনি ক্ষীর সর ছানা, মাখন সব তৈরী করবার ফর্দ্দ করলেন। শুধু তাই না, এবেলা ওবেলা দুবেলা দুধ খাবার ব্যবস্থা হল, আর উপেন, বিপিন নামক দুই ছেলেকে দুধ খেতে দেবার কথা হল। তারপর সনাতন নামে কোন কাসরোগীকে দুধ খাওয়াবার বন্দোবস্ত হল, এমন কি যে পোষা পাখীটা শুধু ছোলা খেতে চায় না, তারও একটু

দুধের বরাদ্দ হ'ল। আর সব শেষে নিজের আর কর্ত্তার ব্যবস্থা হ'ল,

"কর্ত্তার দুধ না হলে চলে না;
এ পোড়ার মুখে দই না হ'লে রোচে না
তাও একটু রাখতে হবে!
ও "বৌমা" আর কি হবে বলো না?"

বেচারী "বৌমা"টির অবস্থা শুধু কল্পনাযোগ্য। ছড়াটিকে অবশ্য সমাজচিত্র হিসাবে না দেখে আজগুবী ছড়ার পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়।

আবার সব ছড়াতেই যে পারিবারিক চিত্রই আছে, তাও নয়। একটি ছড়াতে পাই,

"গুরুমশাই, গুরুমশাই, তোমার পোড়োর বে,
পাঠশালাতে জোড়া বেত নাচতে লেগেছে!"

"বে"টাও হয়তো এস্থলে ব্যঙ্গ করেই বলা হয়েছে। পাঠশালা পলাতক ছাত্রের অদৃষ্টে যে দণ্ড নাচছে, তাকেই তামাসা করে বিয়ে বলা হয়েছে বলে মনে হয়।

যোগীন্দ্রনাথ পুরস্কার ঘোষণা করে বহু ছড়া সংগ্রহ করেন। তার মধ্যে ছাঁটাই বাছাই করা এক দুরূহ কাজ ছিল নিশ্চয়ই। ইতিপূর্ব্বেই বলেছি যে পল্লীবাংলায় প্রচলিত এ সব ছড়ায় অনেক গ্রাম্যতা-দোষ, অনেক অশ্লীলতা ছিল—সেগুলিকে বাদ দিয়ে শুধু যা সুন্দর, যা প্রকাশের যোগ্য সেগুলিকে আলাদা করার ব্যাপারে তাঁর কবি মন নিশ্চয়ই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। —আবার কোন কোন স্থলে ছন্দমিল ইত্যাদি ঠিকমতন পাওয়া যায় নি। সেগুলি আংশিকভাবে বদল করবার জন্যেও তাঁকে লেখনী ধারণ করতে হয়েছিল। তাছাড়া ছিল "খুকুমণির ছড়া"র ছবিগুলি। "ওরে ও নটেশাক, তোর দেশে কি এই বিচার, ইঁদুর বেড়ালে ধরে খায়?"—এই ছড়ার আনুষঙ্গিক চিত্র যাতে বিরাট ইঁদুর ক্ষুদ্র বেড়ালকে ধরে খাচ্ছে—অথবা "আমি বাঁশতলার বুড়ী, নাকে মাটি খুঁড়ি", এই ছড়ার সঙ্গের সেই চিত্র যাতে ডাইনী বুড়ীকে দেখতে পাই,—এ সবই তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে অঙ্কিত হয়েছিল। বইটিতে এরকম বহু ছবি আছে। সেগুলির পরিকল্পনার গৌরব সম্পূর্ণরূপে যোগীন্দ্রনাথের প্রাপ্য।

রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়াগুলিকে স্বয়ম্ভু বলেছেন। সত্যই কে যে এদের রচয়িত্রী, তা কেউ জানে না। তবে একথা সত্য যে এই ছড়াগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে সেকালের অনেক সুখদুঃখ, অনেক ব্যথা-বেদনা, হাসিকান্নার ধ্বনি। সে কাল আজ এ কালের দ্বারে এসে নিজেকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে—সেদিনের সমাজব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়েছে, আর্থিক বিপর্য্যয়ের ফলে অন্তঃপুরচারিণীদেরও আর নিশ্চিন্ত আরামে গৃহে বসে আত্মীয় পরিজনের জন্য চর্ব্ব্যচোষ্য রন্ধনের বা অবসর সময়ে ঘুমপাড়ানী ছড়া গেয়ে সন্তানকে ঘুম পাড়াবার সুযোগ নাই। ছড়াগুলির অধিকাংশই তাই আজ লুপ্ত। যোগীন্দ্রনাথ এগুলিকে সঙ্কলন এবং সম্পাদনা করে প্রকাশ করে বাংলাদেশের প্রায় লুপ্ত এক সম্পদকে উদ্ধার করেছেন। এইজন্য সঙ্কলন হলেও "খুকুমণির ছড়া"কে তাঁর একটি বিশেষ কীর্ত্তি বলা চলে।

দশম অধ্যায়

উপসংহার

বিদ্যাসাগরোত্তর যুগকে বাংলা শিশুসাহিত্যে কবিতা ও গল্পসাহিত্যের যুগ বলা হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "হাসি ও খেলা" গ্রন্থখানির থেকেই এ যুগের সূচনা। "হাসি ও খেলার"র লেখকরূপেই শিশুসাহিত্যের আসরে যোগীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব।

তার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "বিকাশ" ও "দীপ্তি" নামে তাঁর দুখানি বয়স্কপাঠ্য কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বই দুখানি কি কারণে লুপ্ত হয়ে যায় জানি না। কিন্তু এরপর বয়স্কদের আসরে যোগীন্দ্রনাথকে আর প্রায় পাওয়াই যায় না। "প্রায়" বলছি এইজন্য যে এর পরও "বন্দে মাতরম্" নামে স্বদেশী সঙ্গীতের যে সংগ্রহ তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তা বয়ঃপ্রাপ্তদের জন্যই ছিল। আরও একটি পুস্তক তিনি রচনা করেছিলেন, যা বালকপাঠ্য, না বয়স্কপাঠ্য তা নির্ণয় করা কঠিন। সেটি হ'ল "বনে জঙ্গলে" নামক শিকার কাহিনী। তাছাড়া তাঁর সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথাও ভোলা চলে না।

১৯২৯ সনে তিনি কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ রামায়ণটিকে সম্পাদনা করে অজস্র চিত্রসহ প্রকাশ করলেন। মূল্য রাখলেন মাত্র চার টাকা। এই রামায়ণের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সপ্রশংস অভিমত জানিয়েছিলেন। ১লা কার্ত্তিক, ১৩৩৫ সনে শান্তিনিকেতন থেকে কবিগুরু লিখলেন,

"শিশুকালে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়েছি—বটতলায় ছাপা। তাই আমাদের যথেষ্ট ছিল। এখন ছেলেরা ছাপাখানা থেকে প্রচুর প্রশ্রয় পেয়েছে—যোগীন্দ্রবাবুই তাঁর প্রথম সুরু করেছেন। এখন ছেলেদের মানসিক ভোজে সাজ সজ্জার আয়োজন অনেক বেশী দরকার হয়েছে, নইলে তাদের রুচি হয় না। তাই কৃত্তিবাসকে আধুনিক সাজে সাজিয়ে বের করতে হ'ল, নইলে তাঁর নির্ব্বাসন দণ্ড সইতে হত। ভালো কাগজ, মোটা অক্ষর, তার উপরে ছবি বৃদ্ধকে বেশ নবীন দেখতে হেয়েছে। আশা করা যায় ছেলেরা প্রথমটা বাইরের চেহারা দেখে ভুলবে, তারপর ভিতরের

রসের সন্ধান পাবে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যদি বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা না পড়ে তবে তার চেয়ে শোচনীয় অশিক্ষা তাদের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। সেই পড়বার পথ যোগীন্দ্রবাবু মনোরম করে দিয়েছেন—এটা একটা সংকীর্ত্তি।"

কবিগুরু এই বইটিকে কেন "ছেলে"দের বই বললেন, সে কথা বোঝা কঠিন। বইটিতে সবশুদ্ধ ৫৮টি রঙ্গীন ছবি আছে—হয়তো সেজন্য বলে থাকবেন। তার মধ্যে অধিকাংশ চিত্রই বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত। একরঙা চিত্রগুলির মধ্যেও রঙের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কোনটি হাল্কা নীল, কোনটি গাঢ় নীল, কোনটি বা ফিকে লাল রঙে রঞ্জিত। সম্পূর্ণ পুস্তকের ৪৮টি চিত্রের মধ্যে একমাত্র আদিকাণ্ডের "গঙ্গাবতরণ" চিত্রটি কালো রঙে চিত্রিত।

এস্থলে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। যোগীন্দ্রনাথ এ সকল চিত্র স্বহস্তে অঙ্কিত না করলেও তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ীই শিল্পী এ চিত্রগুলি অঙ্কিত করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথের এ উদ্যমটিও একটি বিশেষ কীর্ত্তি। কারণ ইতিপূর্ব্বে রামায়ণ মহাভারতের সচিত্র সংস্করণ আর একটিও প্রকাশিত হয় নি।

এই রামায়ণ পড়ে "প্রচার" সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথের বন্ধু রেভারেণ্ড গোপালচন্দ্র দত্ত লিখলেন,

"তোমার 'রামায়ণ' প্রাপ্ত হইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। কি সুন্দর বাঁধান বই, কি সুন্দর সুন্দর ছবি! আমি প্রথমে সব ছবিগুলি দেখিয়া লইলাম। ছবিগুলি সময়োপযোগী হইয়াছে,—দশাননের ৯টী মুণ্ডপাত হইয়াছে,—তাহার ১৮টী হস্ত রামের ভয়ে তাহার উদরে প্রবেশ করিয়াছে। বাল্মীকির উদ্দাম কল্পনার ভিতর থেকে তুমি রক্ষোরাজের স্বাভাবিক চিত্র বাহির করিয়াছ ইহাতে তোমার বাহাদুরী যে কত তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। ছবিগুলি খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছে; প্রত্যেক ছবিটি আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখেছি, আর মনে মনে তোমার কত প্রশংসা করেছি। ...বাজারে যে সব রামায়ণ বিক্রী হয়, তার type গুলো ভারি ছোট ছোট, spelling mistake অজস্র, আর বাদ সাদ দিয়ে ছাপায়। ...তোমার রামায়ণখানির type বড় বড়, spelling mistake নাই, ছবিগুলির মনোরম, দেখলে আদর করে পড়তে ইচ্ছা হয়।"

ইতিপূর্ব্বে যোগীন্দ্রনাথ ১৯১৭ সনে ছোটদের রামায়ণ এবং ১৯১৯ সনে ছোটদের মহাভারত নাম দিয়ে রামায়ণ মহাভারতের দুটি কিশোরপাঠ্য গদ্য সংস্করণ রচনা করেছেন। তারপর রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী (episode) গুলিকেও বালকবালিকাদের উপযোগী ভাষায় লিখে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে তিনি প্রকাশ করলেন। এইভাবে প্রকাশিত হয় "অন্ধমুনি", "অভিমন্যু", "উশীনর", "একলব্য", "কুরুক্ষেত্র", "গান্ধারী", "দ্রৌপদী", "ধ্রুব", "নল-দময়ন্তী", "প্রহ্লাদ", "ভীষ্ম", "রত্নাকর", "লঙ্কাকাণ্ড", "লবকুশ", "শকুন্তলা", "শ্রীবৎস", "সাবিত্রী সত্যবান", "সীতা", "সুভদ্রা", ও "হরিশ্চন্দ্র"। অর্থাৎ এক কথায় রামায়ণ মহাভারতের পরিচিত সব কাহিনীই এইভাবে পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন যোগীন্দ্রনাথ।

তবে তিনি কয়েকটি বয়স্কপাঠ্য রচনা সম্পাদনা বা সঙ্কলন করলেও বিশেষভাবে শিশু ও কিশোরদেরই লেখক ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু মহাশয় ঠিকই লিখেছেন, "বাংলার মাটিতে এমন মানুষ একজন অন্ততঃ জন্মেছেন, যিনি একান্তভাবে ছোটদেরই লেখক—সেইসব ছোটোদের, যারা কেঁদে কেঁদে পড়তে শিখে হেসে হেসে বই পড়ে!"

বস্তুতঃ শিশুসাহিত্য রচনা আরম্ভ করে যোগীন্দ্রনাথ তাই নিয়েই এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যচর্চ্চা (অর্থাৎ বয়স্কপাঠ্য কবিতা লেখা) প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। হয়তো সেই কারণেই তিনি "বিকাশ" বা "দীপ্তি"র পুনর্মুদ্রণের কথা ভাবেন নি। অবশ্য "বিকাশ" অথবা "দীপ্তি"র কয়েকটি ভক্তিমূলক কবিতার প্রতিধ্বনি পাই যোগীন্দ্রনাথ-রচিত একটি সঙ্গীতে। সঙ্গীতটি হল :—

"কেন দেব, মোহ মুগ্ধ অন্ধ দু নয়ন,
মরণে বিচ্ছেদ ভাবি কাঁদি অকারণ।
মরণ নহে ত পর জীবনের রূপান্তর,
সলিলের রূপান্তর জলদ যেমন।
অবস্থার ভেদাভেদে জন্মমৃত্যু অবিচ্ছেদে
মানবশিশুরে লয়ে খেলিছে নিয়ত।
আঁধার হইতে এসে তাই সে যেতেছে ভেসে
আলোকে লভিতে চির আনন্দ ভবন।

সিন্ধুক্রোড়ে ফুটি ধীরে ডুবে যায় সিন্ধুনীরে
নীহার কণিকা যথা তেমনি সবাই,
তোমাতে উদ্ভূত হয় তোমাতেই হয় লয়,
মৃত্যু যে গো চিরশান্তি, নূতন জীবন।

এই ভক্তিমূলক সঙ্গীতটি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীতে এক সময় স্থানলাভ করেছিল। পরে কোনও অজ্ঞাত কারণে ব্রহ্মসঙ্গীতের নূতন সংস্করণে এটিকে পুনর্মুদ্রিত করা হয়নি। যোগীন্দ্রনাথের প্রচলিত সব পুস্তকই শিশুপাঠ্য পুস্তক হওয়াতে এই ভাবগম্ভীর সঙ্গীতটিও আজ কোন পুস্তকেই পাওয়া যায় না। তবে শিশুদের জন্য তাঁর রচিত কতকগুলি ভক্তিমূলক সঙ্গীত "ব্রহ্মসঙ্গীত" পুস্তকটিতে স্থান লাভ করেছে। তার একটি হ'ল ঃ—

"জগতের পিতা তুমি করুণা নিধান!
হীন মতি শিশু মোরা দুর্ব্বল অজ্ঞান।
ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা;
শিখাও এ ছোট কণ্ঠে তব নাম গান।
সুখে দুখে চিরদিন যেন দয়াময়,
তোমাতে সুমতি থাকে, পাপ-পথে ভয়;
এই আশীর্ব্বাদ সবে কর প্রভু দান।
অসহায় সন্তানের সাথে সাথে থাকো,
তোমার কার্য্যেতে সদা নিয়োজিত রাখো,
ধন্য হোক এই ক্ষুদ্র দেহ মন প্রাণ!"

সঙ্গীতটি "ছড়া ও পড়া" নামক শিশুপাঠ্য পুস্তক থেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত "ব্রহ্মসঙ্গীত" গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে।

যোগীন্দ্রনাথের অপর একটি ভক্তিমূলক সঙ্গীত হ'ল ঃ—

"ছোট শিশু মোরা, তোমার করুণা
হৃদয়ে মাগিয়া লব,
জগতের কাজে জগতের মাঝে
আপনা ভুলিয়া রব।

ছোট তারা হাসে আকাশের গায় ছোট ফুল ফুটে গাছে,
ছোট বটে তবু তোমার জগতে আমাদেরো কাজ আছে।
দাও তবে প্রভু হেন শুভ মতি, প্রাণে দাও নব আশা ;
জগত-মাঝারে যেন সবাকারে, দিতে পারি ভালবাসা।
সুখে দুখে শোকে অপরের লাগি যেন এ জীবন ধরি
অশ্রু মুছায়ে বেদনা ঘুচায়ে জীবন সফল করি।"

এর চেয়ে সহজ ও সুন্দর করে শিশুর মনে ঈশ্বরভক্তির বীজ বপন করা সম্ভব কিনা জানি না। তাঁর বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যেও ঈশ্বরভক্তিমূলক বহু রচনা পাই। আবার তাঁর যে কবিত্বশক্তির পরিচয় "বিকাশ" ও "দীপ্তি"তে পাওয়া যায়, তারই প্রকাশ দেখি তাঁর কয়েকটি পুস্তকের উৎসর্গে। রাঙাছবির উৎসর্গের নাম হল "উপহার"। তাতে কবি লিখলেন,

"বিমল দুটি
আঁখিতে যার
ভাসছে কোটি
শশী রবি !
দু'খানি তার
কচি হাতে
দিলাম আমি
রাঙা ছবি।"

হাসি ও খেলার উৎসর্গে কবি লিখলেন,

"ভোর না হ'তে যার কথাটি
মনে পরে সবার আগে ;
দিনে রেতে যার কথাটি
মনের মাঝে সদাই জাগে !
হাসির ছটা দেখিয়ে কভু
মুখটি কভু ভার ক'রে,
প্রেমের বলে প্রাণটি আমার
লয় কেড়ে যে জোর করে ;

ফুলের মতন, হাসির মতন
টুকটুকে মুখ, মধুর বাণী,
ভালবেসে তারই হাতে
দিলাম আমার এ বইখানি!"

প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যোগীন্দ্রনাথের রচনা সে যুগের শিশুদের মন্ত্রমুগ্ধের মতন অভিভূত করেছিল। সেই কথা উল্লেখ করে সুনির্ম্মল বসু লিখেছেন,

"সে আজ অনেক দিনের কথা। আমরা দুটি ভাইবোন গিরিডিতে গুরুতর ব্যাধিতে শয্যাশায়ী···ঠিক এমনি সময় বাবা এনে দিলেন আমাদের লাল মলাটের একখানা মোটা বই। বইখানির নাম "শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী"। বাবার কাছে শুনলাম স্যার নীলরতনের ছোট ভাই যোগীন সরকার মশাই হচ্ছেন এ বইখানির গ্রন্থকার।"

"মাথা তুলে উঠে বসতে পারতাম না। সর্ব্বাঙ্গের যন্ত্রণায় মুহ্যমান থাকতাম প্রায় সময়ই। বয়স তখন আমাদের দশ বারো বছরের বেশী নয়।"

"এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীখানা এক অতি অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করল আমাদের এই আধি-ব্যাধিযুক্ত দেহ ও মনের উপর। দিদি ও আমার মধ্যে চল্ল প্রবল পাল্লা এই বইখানি নিয়ে। যে আগে সেরে উঠবে বইখানার মালিকানা স্বত্ব পাবে সে।"

"অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের জ্বালা যন্ত্রণা যেন ফুসমন্তরের চোটে কোথায় উধাও হয়ে গেল। আমরা রোগের সমস্ত ক্লান্তি ভুলে দিনরাত সমাহিত হয়ে রইলাম এই অথৈ আনন্দ-সমুদ্রে। ওঃ কী আনন্দ, কী আনন্দ। পাতার পর পাতায় কী অমৃত রসের ছড়াছড়ি—কী স্বর্গীয় পুলকের পরিবেষণ —সে কথা আজও ভুলতে পারি নাই।

··· ··· ··· ··· ···

"এখনো ভেবে উঠতে পারছি না আমাদের এত তাড়াতাড়ি ভালো করলো কে—ঐ লাল মিকশ্চার, না, ঐ লাল মলাটের বই।"

সুনির্ম্মল বসু তাঁর শৈশবস্মৃতি থেকে এই অমূল্য অধ্যায়টি উদ্ধৃত করে শিশুর বা বালকবালিকার মনে যোগীন্দ্রনাথের রচনা যে কি অপূর্ব্ব মায়াজাল বিস্তার করত এবং করে, তার আভাস দিয়েছেন। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের রচনা শুধু বালকবালিকাদেরই আনন্দ পরিবেষণ করে নি,

অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিকেও প্রশংসামুখর করেছে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় মনীষী হাসিখুসির বিষয়ে মন্তব্য করেছেন :—

"Babu Jogindranath Sarker is to be congratulated upon the production ; for with unusual tact and skill he has made the most of the kindergarten system and combined pleasure and knowledge in his method. The get-up and execution are excellent."

আর একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বদেশ সেবক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী হাসিখুসি পড়ে মুগ্ধ হয়ে লিখলেন :—

"Babu Jogindranath Sarkar is no parasitical book-maker sponging on the brain of others. His method of acquainting our infants with the alphabets and their combinations are so original and interesting as to make the old men wish to lapse back into childhood to enjoy the pleasure of reading his books. The illustrations are splendid both in conception and execution. We only wonder how he could bring them so near perfection at the present stage of art in our country. We have known boys preferring Jogin Babu's books to actual play things."

(বাবু) যোগীন্দ্রনাথ সরকার (হাসিখুশি) বইখানা বের করেছেন— সাধু, সাধু! সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। অসাধারণ রচনাকৌশলের মাধ্যমে তিনি কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির অনেকখানি আত্মসাৎ করেছেন এবং আনন্দের মিশাল দিয়ে জ্ঞানকে সরস করেছেন। বইখানার প্রচ্ছদ, আঙ্গিক এবং সম্পাদনা সবই প্রথম শ্রেণীর।

গ্রন্থকার হিসাবে যোগীন্দ্রনাথ সরকার পরজীবী নন। অন্যের মস্তিষ্ক থেকে তিনি তাঁর উপজীব্য আহরণ করেননি। শিশুদের বর্ণপরিচায়ন এবং যুক্তাক্ষর শেখানোর পদ্ধতি এতই মৌলিক এবং এতই উপভোগ্য যে বয়স্কদেরও আবার শৈশবে ফিরে গিয়ে তাঁর লেখা বই পড়ে আনন্দ পেতে ইচ্ছা জাগে। পরিকল্পনা এবং সম্পাদনার দিক্ থেকে তাঁর ছবিগুলি সত্যিই অপূর্ব। কলাশিল্প আমাদের দেশে এখনও যে স্তরে রয়েছে তাতে কি করে তিনি ছবিগুলিকে প্রায় নিখুঁত করে তুলেছেন তা ভাবতে অবাক্ লাগে। ছেলেরা খেলনা ফেলে যোগীনবাবুর বই পড়ছে, এ রকম ঘটনা বহু দেখেছি।

যোগীন্দ্রনাথের পুস্তকগুলির মধ্য দিয়ে এমন একটি সুগভীর রসের ধারা বয়ে গেছে, যার স্বাদটি শুধু শিশু নয়, বয়স্করাও উপভোগ করতে পারেন। "ছড়া ও পড়া"র "তুমি কে?" এমনি একটি কবিতা। কবিতাটির প্রথম চারটি অনুচ্ছেদ এইরূপ প্রশ্নের আকারে পাই :—

"খোকন, ফুলের তুমি কে?
দেখছি যেন তেমনি হাসি
তোমার হাসিতে?
খোকন ফুলের তুমি কে?
খোকন, পাখীর তুমি কে?
শুনছি যেন সেই কাকলী
তোমার বুলিতে!
খোকন, পাখীর তুমি কে?
খোকন, চাঁদের তুমি কে?
মুখটি যেন তেমনি উজল
সুধার রাশিতে!
খোকন, চাঁদের তুমি কে?
খোকন, মায়ের তুমি কে?
বুক-জুড়ানো ধনটি এমন
আর ত দেখি নে!
খোকন, মায়ের তুমি কে?"

প্রশ্নের উত্তর অবশ্য পাওয়া যায় না। তবে শেষ অনুচ্ছেদটিতে খোকনকে আর একটু আদর করে কবিতা শেষ হয় :—

"ওগো এতটুকুন ছেলে
এমনতর পাগল-করা
মূর্তি কোথা পেলে?
ওগো, এতটুকুন ছেলে!"

মনে হয়; এ কবিতা শিশুদের অপেক্ষা তাদের জননীরাই বেশী উপভোগ করবেন। তবে বয়সের সীমারেখা মেনেই যে আমরা সব সময় রস উপভোগ করি; তা নয়। অর্থ না বুঝেও শিশু অনেক সময় বয়স্ক পাঠ্য

কাব্য উপভোগ করে। আবার বয়স্করাও অনেক সময় শিশুদের জন্য লেখা গল্প কবিতা উপভোগ করেন। তবুও যোগীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে শিশুদেরই কবি, শিশুদেরই লেখক।

কিশোর মাসিক পত্রিকা "জলছবি"র সম্পাদক প্রভাতকিরণ বসু যোগীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষ্যে এই কথারই উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ—

"কি করিয়া লোভ করিলে দমন পরিণতদের মাঝে খ্যাতির আসন করিতে দখল? নাম যাতে বেশী বাজে, বেশী কোলাহল, বেশী জয়গান, বেশী মোহ মাদকতা! চিরদিন ধরে শুনালে কেবলি ছোট ছেলেদের কথা! ছেলেরা হয়েছে প্রধান যখন, তোমারে দেখেনি ফিরে, তাদেরো ছেলের দল আসিয়াছে আবার তোমারে ঘিরে।" কিন্তু একথা যে সম্পূর্ণ সত্য নয় অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই যে বালকবালিকারা তাঁকে ভুলে যায় না, তার প্রমাণ দিয়ে প্রভাতকিরণ বসু নিজেই যোগীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে বারান্তরে লিখেছেন ঃ—

"কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি আজও স্মরণ আছে,
প্রথম কাব্য শিখেছিলাম কবি তোমার কাছে।"

শিশুদের এবং বালকবালিকাদের জন্য যোগীন্দ্রনাথ যা দান করে গেছেন, তা অতুলনীয়। তাঁর প্রথম গ্রন্থ "হাসি ও খেলা"তেই যোগীন্দ্রনাথ বালকপাঠ্য একটি উপকথা রচনা করেন। তার নাম "সাত ভাই চম্পা"। শিশুদের অতিপ্রিয় এই উপকথাটির মধ্যে যে ছড়া আছে, তারই উপর ভিত্তি করে একটি গীত গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনা যায়। ছবি ও গল্পে "জয় পরাজয়" নাম দিয়ে বালকবালিকাদের জন্য তিনি একটি অপূর্ব্ব উপন্যাস লেখেন। পরে এই উপন্যাসটিই স্বতন্ত্রভাবে "মোহনলাল" নামে প্রকাশিত হয়। প্রাণিতত্ত্বমূলক পুস্তকও যে রসালো হতে পারে, তার প্রমাণ দিয়ে তিনি লিখলেন "ছোটদের চিড়িয়াখানা" এবং "পশু পক্ষী"। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিবিধ পশু পক্ষীর আকার প্রকার, স্বভাব প্রকৃতি, ভাব ভঙ্গী, জীবন ধারণ ও শিশু-পালন-প্রথা এবং অন্যান্য নানা কৌতূহল-জনক কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে এমন মনোজ্ঞ ভাষায় জীব-জন্তুর কথা আর কেহ বলতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের

ন্যায় বৈজ্ঞানিকও "পশু-পক্ষী" পাঠ করে মন্তব্য করেছিলেন, "পশু-পক্ষী অতি সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহার ছবি ও ছাপা আদর্শস্থানীয়। আশা করি, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই বই স্থান পাইবে।" শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র "শতাব্দীর শিশু সাহিত্য" গ্রন্থটিতে যোগীন্দ্র রচনার আর একটি বিশেষত্ব উল্লেখ করে লিখেছেন :—

"যোগীন্দ্রনাথই প্রথম বালক-বালিকাপাঠ্য গ্রন্থে চলিত বাঙলা ব্যবহার করেন।"

যতদূর সম্ভব এদেশে "সিরিজে"র প্রবর্ত্তকও যোগীন্দ্রনাথই। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের আট আনা সিরিজের উপন্যাস প্রকাশিত হবার বহু পূর্ব্বে তিনি পাঁচ আনা মূল্যে ভারত গৌরব গ্রন্থাবলী "সিরিজে"র ১০/১২ খানি জীবনী প্রকাশিত করেন। এই সিরিজের "বঙ্কিমচন্দ্র" লিখেছেন স্বনামধন্য হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং "মহামতি রাণাড়ে" লিখেছেন সুবিখ্যাত লেখক সখারাম গণেশ দেউস্কর। এই "সিরিজে"র "বিদ্যাসাগর" নামক পুস্তকটি আজও জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

বর্ত্তমানে সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের যে রীতি দেখা যায়, সম্ভবতঃ তার প্রবর্ত্তকও যোগীন্দ্রনাথই। এক সময় প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে "গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" "টমকাকার কুটীর" ইত্যাদি নাম দিয়ে কিশোর বয়স্কদের জন্য স্বল্পমূল্যের অনুবাদগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করে যোগীন্দ্রনাথই এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন বলে মনে হয়।

সারাজীবন ধরেই যোগীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ধরণের শিশু পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি শুধু গুণী ছিলেন না, গুণগ্রাহীও ছিলেন। সেই যুগের কথা স্মরণ করে সজনীকান্ত দাস নিজ আত্ম-স্মৃতিতে বলেছেন "শিশু-সাহিত্যের একমাত্র পরিবেষক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়।" যোগীন্দ্রনাথের শিশুপ্রীতি তাঁকে শুধু শিশু-সাহিত্য রচনায় প্রেরণা দেয়নি, শিশুদের বা বালকবালিকাদের উপযুক্ত পুস্তক প্রকাশে উৎসাহিত করেছে। শিশু সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচার করে লাভের সম্ভাবনা অনিশ্চিত ছিল বলে প্রত্যেক পুস্তক প্রকাশকই যে যুগে সাহিত্যের এই বিভাগটির সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, যোগীন্দ্রনাথ তখন আর্থিক লাভালাভের কথা চিন্তামাত্র না করে শিশু ও কিশোরপাঠ্য সাহিত্য প্রকাশের জন্য স্থাপন করলেন

তাঁর পুস্তকালয় "সিটি বুক সোসাইটি"। এ হ'ল ১৮৯৬ সনের কথা। তারপর ঐ পুস্তকালয় থেকে তাঁর নিজের পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, সেকালের কথা এবং মহাভারতের গল্প ; দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর জীব-জন্তু এবং চিড়িয়াখানা ; নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের টুকটুকে রামায়ণ এবং রং চং ; চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্দনা এবং স্বদেশ রেণু ; কুলদারঞ্জন রায়ের রবিন হুড, অডিসির গল্প, ইলিয়াডের গল্প এবং ভারত লক্ষ্মী ; অমৃতলাল গুপ্তের ছেলেদের গল্প ; মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার চম্‌চম্‌ ; জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্তের উপকথা ইত্যাদি।

এই সকল পুস্তক প্রকাশ করে তাঁর আর্থিক লাভ হয়েছিল কিনা জানি না কিন্তু সেই লাভ লোকসানের হিসাব মনে রেখে তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নি। বরঞ্চ প্রকাশক যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর "জন্মদিনে" নামক action songএর প্রথম ও তৃতীয় দোকানদারের মত যারা বলেছিল,

"'সাহস' আছে আমার কাছে,
'সদাচার' আর 'বিনয়' আছে,
'নিষ্ঠা', 'সরলতা' ;
'চেষ্টা', 'শ্রম', 'অধ্যবসায়'
আছে 'সত্যকথা'।" (১ম দোকানী)

"আমার কাছে 'স্নেহ', 'প্রেম',
আছে 'ভালবাসা',
'ক্ষমা' আছে, 'দয়া' আছে,
'শ্রদ্ধা', 'ভক্তি', 'আশা'!" (৩য় দোকানী)

তাঁর পুস্তক প্রকাশের মূলে যে এই মনোভাব ছিল, তার প্রমাণ পাই তাঁর ছবি ও গল্পের 'আশীর্ব্বাদ' নামক কবিতাটিতে। গ্রন্থশেষে শিশুদের আশীর্ব্বাদ করে তিনি বলেছেন,

"হ'ক ভাই তোমাদের সুন্দর জীবন,
শতশত আশার কিরণ!

নিরাশার অন্ধকারে, ল'য়ে যেন যেতে পারে,
নবশক্তি, নবোৎসাহ, উদ্যম নূতন,
তোমাদের সুন্দর জীবন।

* * * *

ন্যায়, সত্য, সরলতা, বিকশিত হ'ক তথা,
সুধার সৌরভে মত্ত করুক ভুবন,
তোমাদের পবিত্র জীবন।"

শিশুদের মধ্যে, বালকবালিকাদের মধ্যে এই গুণগুলি যাতে সঞ্চারিত হয় তার জন্য যোগীন্দ্রনাথ "নিজের ঝুলি থেকেও কিছু দিয়েছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করেছেন।" তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টা twice blest হয়েছিল। এইভাবে কিশোর সাহিত্য প্রকাশ করে তিনি যেমন বহু পুস্তককে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনই শিশুদের সম্মুখে খুলে দিয়েছিলেন এক মায়াপুরীর জগৎ, আর দিয়েছিলেন তাদের হাতে তুলে মানুষ হবার নানা উপকরণ।

কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ শুধু অন্যান্য শিশু সাহিত্যিক-রচিত পুস্তকই প্রকাশ করেন নি। তাঁর নিজের পুস্তকে অন্যান্য অনেকের রচনা সঙ্কলন করে সেগুলিকে অমর করে রেখে গিয়েছেন। এইরূপ তাঁর "হিজিবিজি"তে সুকুমার রায়ের লেখা "হ-য-ব-র-ল" নামে একটি অংশ আছে। তার চিত্রগুলিও সুকুমার রায়েরই অঙ্কিত। বলা বাহুল্য সুকুমার রায়ের "হ-য-ব-র-ল" বা "আবোল তাবোল" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার বহু পূর্ব্বেই হিজিবিজি প্রকাশিত হয়। এবং যোগীন্দ্রনাথের পুস্তকের অন্তর্গত না হলে এ রচনা হয়তো বা বিলুপ্ত হয়ে যেত।

এইরূপ যোগীন্দ্রনাথের রাঙা ছবিতে প্রমদাচরণ সেন রচিত "ছেড়ে দেও না কুকুরচন্দ্র" নামক একটি কবিতা পাই। ছোট মেয়ে এক হাতে একটি হাঁড়ি ধরে নিয়ে যাচ্ছে, অপর হাতে সে কাপড় সামলাতে ব্যস্ত আর একটি কুকুর তার কাপড় ধরে টানাটানি করছে। এই ছবির সঙ্গে নিম্নলিখিত সুন্দর কবিতাটি পাই:—

"আঃ ছেড়ে দেও না, কুকুরচন্দ্র
মায়ের কাছে যাই!

এখন কি আর খেলা করবার
সময় আছে ভাই?
দেখছ না কি হাঁড়ি হাতে
চাল ধোয়া রয়েছে তাতে,
মা বলেছেন নিয়ে যেতে,
চাকর বাকর নাই।"
"কাজটা সেরে ফিরে এলে,
তখন তোমায় আমায় মিলে,
মনের সুখে ক'রব খেলা
যত ভেবে পাই।"
"কাজ ফেলে না করব খেলা
ছেড়ে দেও না, হ'ল বেলা,
আগে কাজ কি আগে খেলা
জানতে আমি চাই।"

"সখা" নামক কিশোরপাঠ্য মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন প্রমদাচরণ সেন। শুধু তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করবার পর মাত্র ২৫।২৬ বৎসর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু হয়! সুতরাং শিশু সাহিত্যের এই দিশারীকে অনেকেই ভুলে গেছেন কিন্তু তাঁর এই কবিতাটি যোগীন্দ্রনাথের রাঙা ছবির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আজও শিশুদের আনন্দ দিচ্ছে। ইতিপূর্ব্বে "হাসি ও খেলা"তে প্রমদাচরণের "কেরাণী পাখী" নামে আর একটি প্রাণিতত্ত্বমূলক রচনাও যোগীন্দ্রনাথ সঙ্কলন করেছেন। "হাসি ও খেলা"তে যোগীন্দ্রনাথ নিজের রচনার সঙ্গে অন্যান্য যে সকল রসিকজনের রচনা প্রকাশ করেন, তার মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর "মজন্তালী" নামক বেরালের কৌতুক কাহিনী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের "সোনামণির রাগ" এবং মাইকেল মধুসূদনের জীবনী রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসুর "রামায়ণ কথা" নামক এক পৃষ্ঠার রামায়ণ উল্লেখযোগ্য। রামায়ণের এই ক্ষুদ্রতম রূপান্তর আর কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না বলে এখানে সেটি পূর্ব্বাপর উদ্ধৃত করলাম :—

"অযোধ্যায় এক রাজা ছিলেন দশরথ তাঁর নাম।
তিনটি রাণী, চারটি ছেলে, বড়টির নাম রাম॥

রামের রূপে জগৎ আলো, ভোলে চরাচর।
রামের গুণে বন্দী হল বনেরই বানর॥

চণ্ডালেরে কোল দিলেন রাম গুণমণি।
ধনুক ভেঙ্গে কল্লেন বিয়ে জনক নন্দিনী॥

শ্রীরামেরে রাজ্য দিতে রাজার দেখে মন।
দুষ্টমতি মেজো রাণী পাঠিয়ে দিলেন বন॥

মাথায় জটা, বাকল পরা, হাতে ধনুকবাণ।
বাপের কথা রাখতে বনে চলেছেন শ্রীরাম॥

মাঝখানে যান সীতাদেবী আলো করে বনে।
সবার পাছে ধনুক হাতে চলেছেন লক্ষ্মণ॥

বনের মাঝে কুটির বেঁধে ছিলেন তিনজন।
একলা ঘরে সীতা হরে নিল দশানন॥

সাগর বেঁধে রাবণ বধে রাম গুণমণি।
উদ্ধারিলেন সাধ্বী সতী সীতা ঠাকুরাণী।
সীতায় লয়ে সুখী হয়ে শ্রীরামের দিন যায়।
হরি হরি বল সবে পালা হ'ল সায়॥"

সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মূল বক্তব্যকে একটি মাত্র পৃষ্ঠায় ছন্দের মাধ্যমে শিশু শ্রোতার উপযুক্ত করে প্রকাশ করা যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়, তা যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই তাঁর গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়ে তিনি নিজ গুরুর এই রচনাটি "হাসি ও খেলা"য় সঙ্কলন করলেন। এ ছাড়া কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের মূল পাঠকে প্রায় সম্পূর্ণ বজায় রেখে অথচ বালকবালিকাদের হাতে তুলে দেবার উপযোগী করে যোগীন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং সচিত্র কাশীরাম দাসের মহাভারত যোগীন্দ্রনাথ সরকারই প্রথম প্রকাশ করেন। রামায়ণের ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, আর মহাভারতের ভূমিকা লেখক ছিলেন আচার্য্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। (যোগীন্দ্রনাথের নিজের সম্পাদিত সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পরে প্রকাশিত হয়)।

তাঁর ছবি ও গল্পের উৎসর্গপত্রে যেন তাঁর এই সঙ্কলক এবং প্রকাশক

রূপের কথা স্মরণ করেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার আবাহন নামে এই সুন্দর কবিতাটি লিখলেন ঃ—

"কুসুমিত বন করিয়া চয়ন
ভরিয়া কুসুম-ডালা,
নবীন মুকুলে, হাসিমাখা ফুলে
গাঁথিয়া এনেছি মালা।
আদরের ধন, শিশির শোভন
এ নব কুসুম-হার,
ধীরে কাছে এসে, সুমধুর হেসে
লয়ে যাও উপহার।"

যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কলনের মধ্যে রাঙা ছবির "ভাল ছেলে ও মন্দ ছেলে" নামক একটি সুন্দর কবিতা পাই—এটি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত। সত্যই সে যুগের শুধু মন্দ ছেলে কেন, অনেক ছেলেই লেখাপড়াকে যমের মত ভয় করত। তাদের সে ভয় দূর করে যোগীন্দ্রনাথ তাদের দুহাতে উপহার দিয়ে চললেন রঙীন রঙীন ছবির বই—ছড়ায়, গল্পে, গানে যে সব বই ভরা। যাদের যুগ যুগ ধরে "রামগরুড়ের ছানা" করে রেখে "হাসতে মানা" করা হয়েছিল, যোগীন্দ্রনাথ তাদের নির্ম্মল হাসি হাসতে শিখিয়ে হাসির উপর থেকে গুরুজনের নিষেধাজ্ঞা দূর করতে সাহায্য করলেন। শ্রীবুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,

"তিনি প্ল্যান করে বই লেখেন নি, প্রাণ থেকে লিখেছিলেন ; তাঁর লেখা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁরই। তাঁর হৃদয়ের স্পন্দনটি সেখানে শুনতে পাই—শিশুর জন্য অনবরত খিল খুলে রাখা দরাজ তাঁর হৃদয়।"

(সাহিত্য চর্চ্চা—বুদ্ধদেব বসু)

বস্তুতঃ শিশুর জন্য হৃদয়ের খিল খুলে রাখা যোগীন্দ্রনাথের পক্ষে সহজ ছিল এই জন্য যে মনে প্রাণে তিনি নিজেও শিশু ছিলেন। আমরা যখন তাঁকে দেখেছি তখন আক্ষরিক অর্থে আমাদের "দাদু" হলেও, আলঙ্কারিক অর্থে তখন তিনি সারা বাংলাদেশের সব বালকবালিকার "দাদু"তে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু যখন তাঁর এই পথে যাত্রা আরম্ভ হয়, তখন তিনি ছিলেন এক অল্পবয়স্ক যুবক। সেই বয়স থেকেই তিনি যে শিশুর সঙ্গে শিশু হতে

পেরেছিলেন, তার মূল ছিল তাঁর চরিত্রের গভীরে। উপনিষদের বাণী "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ "তুমি তিনি হও" তাঁর জীবনে গভীরভাবে সত্য ছিল: তিনি শিশুর সঙ্গে শিশু হতে পেরেছিলেন। তাই শিশুকে তিনি দূর থেকে বা বাইরে থেকে দেখেন নি।

যোগীন্দ্রনাথ দু হাতে শিশুদের হাসিগল্প গান পরিবেশণ করে গেছেন, এ কথাও সত্য—আক্ষরিক অর্থেই সত্য। কারণ ১৯২৩ সনে যখন পক্ষাঘাত হয়ে তাঁর দক্ষিণ হস্তে লেখবার ক্ষমতা চলে গেল, তিনি নিরুদ্যম হয়ে বসে না থেকে বামহস্তে লেখা অভ্যাস করলেন এবং সেই বামহস্তে লেখনী ধারণ করেই তাঁর রস পরিবেষণের কাজ চলল। আমরা তাঁকে এই অবস্থায়ই দেখেছি। শারীরিক বা মানসিক কোনও ব্যথা বেদনাই তাঁর সদাস্ফূরিত হাস্যকৌতুকের উৎসের মুখে পাথর চাপা দিতে পারেনি। এই অবস্থায় তিনি আমাদের নিকট চিঠিতে যে সব মিষ্টি ছড়া লিখে পাঠাতেন, তার মধ্যে অনেকগুলিই তাঁর জীবনী অংশের অন্তর্ভুক্ত করেছি। সেগুলি ভিন্ন আরও কতকগুলি চিঠিতে লেখা ছড়া পেয়েছি। তাঁর অপ্রকাশিত রচনা হিসাবে মূল্যবান সেই ছড়াগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করছি:—

(১)

"সোনামণি সোণা!
দুইটি মুখে হাজার কিসি
দেবো আমি গোণা!"

(২)

"সোণা সোণা সোণা
বুড়ো দাদুর ধনা;
যোগীন দাদুর
ভাঙ্গা ঠ্যাং
সোণা নাচে ড্যা ড্যাং ড্যাং।"

(৩)

"দিদিমণি দুটি,
হেসে কুটি কুটি!

দিদি মণি সোণা,
ধন-ধন-ধনা !”

(৪)

“খুকু, তোমার হাতের অ আ,
যেন নতুন গুড়ের মোয়া !
খুকু, তোমার হাতের ই ঈ
মুখে ফোটায় হা হা-হিঃ হিঃ।”

(৫)

“এইটি আমার ছড়া,
এদিক ওদিক সেদিক ফিরাই
যায় না তবু পড়া।”

(৬)

“খুকুদিদি
—সোণাধন,
মাসীর বিয়ের নিমন্ত্রণ !
আয় গো তোরা ছুটে আয় !
মাসীর বিয়ে দেখ্‌সে আয় !”

(৭)

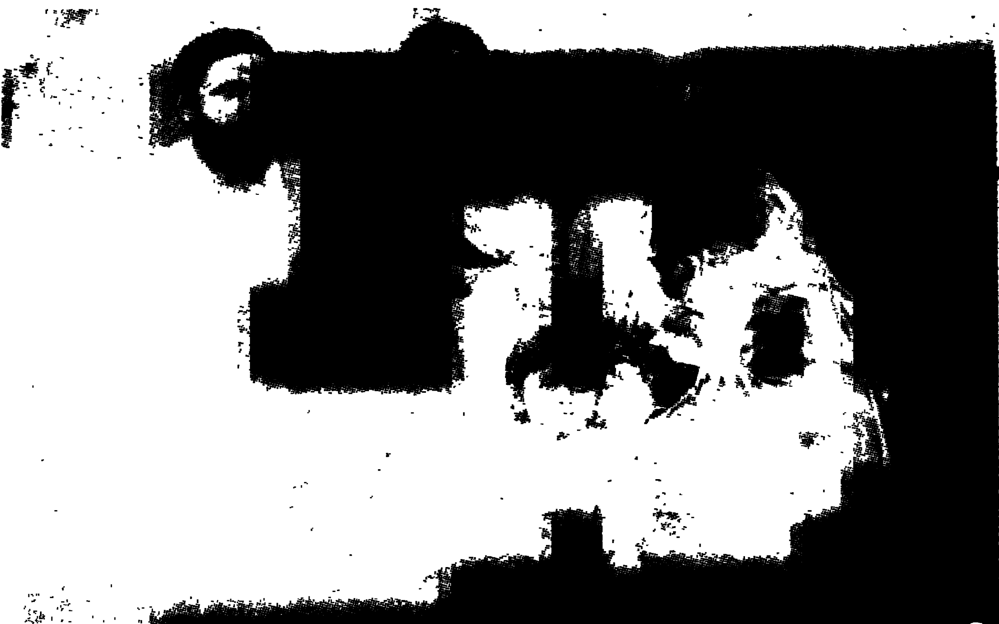
“ধন ধনিয়া
ধন মণিয়া,
সোনার মাণিক কৈ ?
ফুলবাগানে
ফুলের সনে
করছে খেলা ঐ ?”

কত বিভিন্ন খাতেই না তাঁর সৃজনীশক্তির ধারা বয়ে গেছে। শিশু ও কিশোরদের জন্য তাঁর ঝুলিতে পাই বর্ণমালার ছড়া, বারের নাম, মাসের নাম, পক্ষের নাম ও যোগবিয়োগ শেখাবার ছড়া, আজগুবী গল্প ও কবিতা, বালকবালিকাদের অভিনয়ের উপযোগী action song, ধাঁধা ও

তার উত্তর, সেকালের প্রথা অনুসারে কিছু উপদেশমূলক কাহিনী ও কবিতা, প্রাণিতত্ত্বের কাহিনী, শিকার কাহিনী (যেগুলি বয়স্করাও উপভোগ করতে পারেন), সহজ ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী, আবার কিছু স্কুল পাঠ্য পুস্তক। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পুস্তক ভিন্ন আর সবগুলিই আজও প্রচলিত। তবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত তাঁর অননুকরণীয় বর্ণ পরিচয় পুস্তক হাসিখুসি, ১ম ভাগ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হাসিখুসির একটি হিন্দি সংস্করণও আছে। এটির সম্পাদনা করেছেন বিশ্বম্ভরনাথ ক্ষত্রী। পুস্তকটির তৃতীয় সংস্করণ হয়েছে। তবে হাসিখুসির অসমীয়া সংস্করণ—যার নাম ছিল "হাঁহি ধেমালি"—আজ লুপ্ত। বাংলা হাসিখুসি, প্রথম ভাগের প্রায় একশত সংস্করণ হয়েছে।

কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় হল এই কথা যে তাঁর পুস্তকের সংস্করণের মাপকাঠিতে তাঁর রচনার জনপ্রিয়তা বিচার করা যায় না। "হারাধনের দশটি ছেলে" বা "পেটুক দামুর"র নাম জানেন না, এমন বাঙ্গালী আছেন কি? কিন্তু তাদের নামের ছড়াগুলির যে একজন রচয়িতা ছিলেন, সে কথা মনে রাখেন কজন? আবার যে শিশুটি উচ্চকণ্ঠে "কাক ডাকে কা কা", বা "ভুলো ডাকে ভৌ ভৌ" বলে তার প্রিয় ছড়া আবৃত্তি করে, সে কাকের বা ভুলো কুকুরের ডাকের মতই ছড়াগুলিকেও প্রকৃতির দান বলে মেনে নিয়েছে। যোগীন্দ্রনাথের ছড়া, গল্প, ভাষা আজ বাংলার ঘরে ঘরে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে অনেকে সেগুলিকে স্বয়ম্ভু মনে করেন। তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সভা সমিতিতে অনেক গুণিজন নিজেদের শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন। যতদিন না সে চেষ্টা সফল হয়, শত শত বাঙ্গালী শিশুর কণ্ঠই তাঁর সজীব স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে তাঁর রচনার সম্বন্ধে বলবে,

"অবাক কাণ্ড ভাই,
এমন ব্যাপার আর কখনও
জন্মে দেখি নাই।"



সপরিবারে যোগীন্দ্রনাথ (বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে)

বাম হইতে দক্ষিণে — যোগীন্দ্রনাথ, জ্যেষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্রনাথ (দণ্ডায়মান), গিরিবালা দেবী, যোগীন্দ্রনাথের ক্রোড়ে কন্যা বীণা দেবী, গিরিবালার ক্রোড়ে তৃতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ, নীচে উপবিষ্ট দ্বিতীয় পুত্র মণীন্দ্রনাথ ।



গিরিবালা দেবী

(স্বামীর জীবিতকালে)

ধন ধানিয়া,
ধন মানি...
সোনার মানিক কৈ?
... বাগানে
... নব মনে

এইটি আমার ছড়া
এদিক ওদিক মোড় ফিরাই
যায় না তবু পড়া!
দাদু

ছোট বড়
বুকে চড়
বড় ছোট
কোলে ওঠ
কিনি নেও
... দেও

দিদিমনি
হেসে কুটি কুটি!
দিদিমনি সো...
ধন-ধন ধনা
...মি

৭০. M. C.
Sufol...

দুই দৌহিত্রী কল্যাণী ও রঞ্জিতাকে লেখা যোগীন্দ্রনাথের ছড়া



গিরিবালা দেবী

(স্বামীর মৃত্যুর পর)





যোগীন্দ্রনাথের গিরিডির বাড়ী — গোলকুঠী

দ্বিতীয় খণ্ড

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

(১)

সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদি কাব্য ছিল, "জল পড়ে, পাতা নড়ে"। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগের অর্থাৎ তাঁর পরের generationএর বাঙ্গালী শিশুর জীবনের আদিকাব্য হ'ল

"অজগর আসছে তেড়ে,
আমটি আমি খাব পেড়ে।

এই ভাবটিকেই "জলছবি" নামক শিশু মাসিক পত্রিকার সম্পাদক প্রভাত কিরণ বসু সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে লিখেছেন,

"কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি আজও স্মরণ আছে,
প্রথম কাব্য শিখেছিলেম কবি তোমার কাছে।"

এ হ'ল সাধারণভাবে বাঙ্গালী সমাজের কথা। আর আমরা যাঁরা তাঁর নিকট সংস্পর্শে আসবার দুর্লভ সৌভাগ্যলাভ করেছি, আক্ষরিক অর্থে আমাদের প্রথম কাব্য তাঁর কাছে শিখেছিলাম। জন্মান্তরের কোনও পুণ্যফলে আমি যোগীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী হয়ে জন্মেছি। এবং এক দুর্লভতর সৌভাগ্যের বশে এক সময় তাঁর অতি নিকটে এসেছি, দেখেছি তাঁর হিমালয়ের মত ব্যক্তিত্ব, সমুদ্রের মত হৃদয়ের গভীরতা, ঝর্ণাধারার মত রসের ফোয়ারা আর সেই রসমধুধারায় স্নান করেছি। আমি তখন নিতান্তই বালিকা। তাই সেই তীর্থসলিলে ভরা ঘটটির অনেক পুণ্যবারিই আজ জীবনের বালুবেলায় বিলীন হয়ে গেছে। তবু আজও যা আমার স্মরণ আছে, অথবা আত্মীয়স্বজনের নিকট থেকে যা উদ্ধার করতে পেরেছি, তা লিপিবদ্ধ করে ঋষি-ঋণ আংশিকভাবে শোধ করবার চেষ্টা করছি।

১২৭৩ সনের ১২ই কার্ত্তিক, রবিবার রাত্রি ১২-৩০ মিনিটের সময় চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল নন্দলাল দেব সরকার এবং মাতার নাম ছিল থাকমণি দেবী।

দেব সরকারদের আদি পুরুষের বসতি ছিল যশোহরে। এই পরিবারের

বিভিন্ন শাখা ক্রমে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং নানা ক্ষেত্রে যশস্বী হন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব মহাশয়—সকলেই এই বংশের বিভিন্ন শাখাসম্ভূত বলে শোনা যায়। যশোহর থেকে এই বংশের একটি শাখা পঞ্চগ্রামে আসেন। তখন পর্য্যন্ত সরকারেরা "দেব" পদবীই লিখতেন এবং শোভাবাজারের রাজবাড়ীর পূর্ব্বপুরুষেরা ও ৺নন্দলাল সরকার মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষেরা একত্রেই ছিলেন। অতঃপর এই বংশের নবকৃষ্ণ দেব মহাশয় পঞ্চগ্রাম থেকে শোভাবাজারে এসে জমিদার হয়ে বসলেন এবং শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করলেন। অতঃপর এই বংশের আর একটি শাখা পঞ্চগ্রাম থেকে অন্য একটি গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই গ্রামটির নাম অজ্ঞাত রয়ে গেছে। এই গ্রাম থেকে তারা চব্বিশ পরগণার নিতাড়ায় যান। গ্রামের নিতাড়া নামটি লোকের মুখে মুখে "ন্যাতড়া"য় রূপান্তরিত হয়। এই নিতাড়া বা ন্যাতড়ায় বাসকালে এই বংশের সীতানাথ দেবের পুত্র শ্যামসুন্দরই প্রথম সরকার পদবী লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর তিন চার পুরুষ পরে যোগীন্দ্রনাথের পিতা নন্দলাল সরকারের জন্ম।

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিধান অনুসারে অধস্তন দশ পুরুষকে পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধ করতে হয়। সেইজন্য নন্দলাল শেষ পর্য্যন্ত শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের শ্রাদ্ধ করতেন কারণ তিনি রাধাকান্ত দেবের দশমপুরুষের বংশধর ছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন নন্দলালের অষ্টম সন্তান। নন্দলালের প্রথমা কন্যার পর জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশচন্দ্র, তাঁরপর চিকিৎসাজগতে সুবিখ্যাত স্যার নীলরতন, তাঁরপর উপেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথের পর যোগীন্দ্রনাথ। এই হিসাব অনুসারে যোগীন্দ্রনাথ তাঁর পিতামাতার পঞ্চম সন্তান। সুতরাং অনুমান হয় যে এঁর পূর্ব্বে আরও তিনটি ভ্রাতা ও ভগিনীর শৈশবেই মৃত্যু হয়। যতদূর জানা যায়, যোগীন্দ্রনাথেরা সবশুদ্ধ ছয় ভ্রাতা ও ভগিনী ছিলেন। তার মধ্যে তিন ভগিনী ও পাঁচ ভ্রাতা ভিন্ন আর সকলেরই শৈশবে মৃত্যু হয়। অবিনাশচন্দ্রেরও অগ্রজা, এঁদের যে জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন, তাঁর রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে বিবাহ হয়েছিল অর্থাৎ জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করলে তাঁর প্রভাবে নন্দলালের পরিবারের সকলেই যখন অপেক্ষাকৃত

অগ্রসরপন্থী হ'ন, তার পূর্ব্বেই এই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যোগীন্দ্রনাথের পরেও আর এক ভ্রাতা ছিলেন—ললিতকুমার। মধ্যে দুই ভগিনী ছিলেন। এঁদের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা ভগিনীর এবং ললিতকুমারের যৌবনেই মৃত্যু হয়। সুতরাং সরকার পরিবার অর্থে লোকে চার ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র, নীলরতন, উপেন্দ্রনাথ ও যোগীন্দ্রনাথের এবং কনিষ্ঠা দুই ভগিনী—ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র ও নীরদবাসিনী মহলানবিশের নামই জানত।

শোনা যায় ১৮৬৪ সনে আশ্বিন মাসে একবার প্রবল ঝটিকা ও বন্যায় নন্দলালের নিতাড়ার বাস্তুভিটা ভূমিসাৎ হয় এবং সাত বৎসরের বালক অবিনাশচন্দ্র, তিন বৎসরের বালক নীলরতন ও ক্ষুদ্র শিশু উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে নিয়ে সপরিবারে নন্দলাল জয়নগর গ্রামে আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ন। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে জয়নগরে নন্দলালের মাতুলালয় এবং শ্বশুরালয় উভয়ই ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে জয়নগরে তাঁর নিজেরও কিছু সম্পত্তি ছিল। সুতরাং তিনি জয়নগরেই বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। এইরূপে তাঁর পিতামাতার জয়নগরে অবস্থানকালেই মাতুলালয়ে যোগীন্দ্রনাথের জন্ম।

তারপর তাঁর অতিবাহিত হয় জয়নগরের "ধেনুচরা মাঠে" আর "সারাদিন পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটে।" মুক্ত প্রকৃতির উদার অঙ্গনে নীল আকাশের চন্দ্রাতপের নীচে অন্যান্য পল্লীবালকদের সঙ্গে নানা বালচপলতার মধ্যে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন যোগীন্দ্রনাথ। তাঁর বাল্যকালের বিষয় তিনি যে সব গল্প করতেন, তার মধ্যে তাঁর পিতামহীর কথাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যোগীন্দ্রনাথ যখন নিতান্ত শিশু বোধহয় তখনও সূতিকাগারে —তখন তিনি একবার খাট থেকে মাটিতে পড়ে যান এবং অনেক কষ্টে সেবার তাঁর জীবন রক্ষা হয়। আর একবার—সেও নিতান্ত শৈশবে—তাঁকে ঘরে শুইয়ে রেখে তাঁর পিতামহী পুকুর থেকে জল আনতে গিয়েছিলেন। তাঁর মা তখন কোথায় ছিলেন জানিনা। ইতিমধ্যে বৃষ্টি আসে এবং ঘরের চালের ভিতর দিয়ে জল শিশুর বক্ষে পড়াতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক কষ্টে সেবার তাঁর জীবন রক্ষা হয়েছিল।

এই চঞ্চল বালকগুলি অর্থাৎ যোগীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অগ্রজেরা একটু বড় হয়েই অন্যান্য বাল্যক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি পিতামহীকে উত্যক্ত

করে আমোদ উপভোগ করতে আরম্ভ করলেন। পিতামহী নিজ পুত্রের জন্য ভালো আমটি, দুধের সরটি, ক্ষীরের বাটিটি আলাদা করে রেখে দিতেন। অগ্রজদের সঙ্গে বালক কেদারনাথ (ডাকনাম "যোগী"—যে নামের রূপান্তর "যোগীন্দ্রনাথ" নামেই পরে তিনি বিখ্যাত হ'ন) পিতামহীকে জব্দ করবার জন্য খাটের নীচে থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে খেতেন। এই "চুরির" অপরাধে তাঁদের মাতৃদেবীকে নিজ শ্বশ্রূমাতার নিকট তিরস্কৃত হতে হ'ত অর্থাৎ শুনতে হত যে সরকার বংশে ইতিপূর্ব্বে এমন সন্তান কখনও জন্মায় নি। বালকগুলির এমন স্বভাব তাদের মাতুল বংশের ধারা অনুসারেই হয়েছে।

বর্ণপরিচয়ের সুবোধ বালক গোপালের সঙ্গে এই বালকগুলিকে তুলনা করবার কোনও সুযোগই তাঁদের কাহিনী থেকে আমরা পাই না। নানাপ্রকার মজার মজার ক্রীড়া উদ্ভাবন এবং অন্যকে উত্যক্ত করে দুষ্টামী করতে যোগীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় ছিলেন। আবার গ্রামের মধ্যে দুষ্ট বালকদের দলও ছিল একাধিক এবং তারা সকলেই তাঁকে নিজেদের দলভুক্ত করতে চাইত। কিন্তু সহজে "ভবী" ভুলতেন না। তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল কচুরি। গ্রামের ছেলেরা তাঁর এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিত অর্থাৎ তাঁকে নিজেদের দলভুক্ত করবার জন্য তাঁকে কচুরি খাওয়াবার লোভ দেখাত। একবার এই রকম ভাবে তাঁকে দলে টানবার আগ্রহে দুদল বালকই ক্রমাগত কচুরির সংখ্যা বাড়াতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত যে দল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কচুরি "ঘুষ" দিতে প্রস্তুত হ'ল, তাদের পয়সায় ৩২টি কচুরি খেয়ে এই "পেটুক" বালক তাদের সঙ্গে "গুণ্ডামী" করতে প্রস্তুত হলেন। — বাল্যকালের এই অকারণে চঞ্চল দিনগুলি যোগীন্দ্র সাহিত্যে নানা ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এরই ফলে হাসিরাশির "দুষ্টু তিনু" এবং "পেটুক দামু" নামে দুটি অপূর্ব্ব ছড়ার সৃষ্টি। সেই যে দুষ্টু তিনু,

"ফাঁকি দিয়া গাড়ী চড়া,
এই তার কাজ ;
মনে ভাবে ভারী মজা
করিবে সে আজ।
"চেপে চুপে বসে তিনু
হয়ে গদিয়ান ;

'পিছু কেন ভারী ঠেকে'
ভাবে কোচ্‌ম্যান্‌।"

আর সেই পেটুক চূড়ামণি যার কথা! যোগীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

"তিনটে কলা খেয়ে দামুর
মনটা কেমন করে,
গণ্ডা দশেক হ'লে তবে
পেটটা তাহার ভরে।"

এই বালকগুলির দুষ্টামীর মধ্যে যোগীন্দ্রনাথের শৈশব স্মৃতি অপ্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করেছে। এই ধরণের আরও একটি কবিতা হ'ল "ছড়া ও পড়ার" "সাধে বাদ"। বন্ধ আলমারীর পাশে দাঁড়িয়ে গোল গোল চোখ করে খোকাবাবু বলছেন,

"আলমারীতে হয় যে রাখা
মণ্ডা মিঠাই ছানা,
মা ভেবেছে, সে খবরটি
নাইকো আমার জানা।
"পানতুয়া আর রসগোল্লা
হাঃ — হাঃ — হা — হা —
কপালগুণে চাবির গোছা
ফেলে গেছেন মা!"

এরপর খোকার মিষ্টি খাবার পরিকল্পনা আরও যখন অগ্রসর হয়েছে, তখন

"গোল্লা খাবার উৎসাহে যেই
উঠ্‌লো নেচে প্রাণ,
হায় রে কপাল, অম্নি কিনা,
পড়লো কানে টান।"

অর্থাৎ কিনা মিষ্টির মোহন রূপের কল্পনায় বিভোর, অন্যমনস্ক খোকাবাবুর জননীর নিঃসাড়ে প্রত্যাবর্তন ও কর্ণমর্দ্দন। ছড়াটিতে খোকাবাবুর নামকরণ হয় নি। অনায়াসেই এই বালকের স্থলে বালক যোগীন্দ্রনাথ ও তাঁর অগ্রজদের আর সেই সঙ্গে খোকাবাবুর জননীর স্থলে এঁদের পিতামহীর নাম বসান চলতে পারে।

জয়নগরে বাসকালে খেলার সূত্রে যোগীন্দ্রনাথ ও তাঁর অগ্রজেরা গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে যেতেন এবং কখনও বা অন্যের গাছে, কখনও বা বনে ফলে থাকা আম, জাম, কাঁঠাল পেড়ে খেতেন। তাঁদের নিকট আপন পর ভেদাভেদ ছিল না। সেইজন্য অন্যান্য বালকদের সঙ্গে দল বেঁধে যোগীন্দ্রনাথ নিজেদের বাগানের ফলপাকুড়ও "চুরি" করতেন। মানুষের পরিণত জীবনের সূচনা হয় তার শৈশবেই। নিজের ও পরের দ্রব্যের মধ্যে যে পার্থক্যের চিন্তা বৈষয়িক লোকের মনে স্থায়ী আসন দখল করে, যোগীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রাতারা শৈশব থেকেই সে ধরণের চিন্তা থেকে মুক্ত ছিলেন। সেই জন্যই উত্তর জীবনে যোগীন্দ্রনাথ একান্ত নিজের বলে কোনও জিনিষ রাখতে শেখেন নি। তাঁর যা কিছু ছিল, সবই দশজনের জন্য। তাই বোধহয় আজ তাঁর রচনার উপর থেকেও যেন ব্যক্তির অধিকার লুপ্ত হয়ে তা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য জাতীয় সম্পত্তি অর্থে এ কথা বলছি না যে, যে কোন ব্যক্তি তাঁর রচনাকে যথেচ্ছভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করতে পারেন। জাতীয় সম্পত্তি এই অর্থে যে লেখকের নামও জানেনা এমন হাজার হাজার শিশুর কণ্ঠে তাঁর ছড়া নিত্য ধ্বনিত হচ্ছে আর বয়স্কদের বাক্যালাপের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য", অথবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্তের" মতই, যোগীন্দ্রনাথের "বুদ্ধিমান রামধন", "উল্টা বুঝলি রাম", "পেটুক দামু" বা "হারাধনের দশটি ছেলে" প্রবচনের মত ব্যবহৃত হচ্ছে।

জয়নগরে বাসকালেই বালক যোগীন্দ্রনাথের লেখাপড়া আরম্ভ হয় এবং উত্তর জীবনের সহচর, সোদরোপম কেশবচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। অনেকদিন পরে যোগীন্দ্রনাথ যখন "সিটি বুক সোসাইটী" নামক প্রকাশনী—সংস্থাটি স্থাপন করলেন, কেশবচন্দ্র তাঁর কর্ম্মচারী হয়ে এলেন। অবশ্য কেশববাবুকে তাঁর দোকানের কর্ম্মচারী বলতে যোগীন্দ্রনাথের ঘোর আপত্তি ছিল। বলতেন "কেশা আমার ছোট ভাই! কেশববাবুও চিরদিন দাদামশাই ও দিদিমাকে "ছোটদা" এবং "ছোটবৌদি" বলে ডেকেছেন আর মা যেমন করে ঝড়েঝঞ্ঝায় তাঁর সন্তানটিকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি করে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত "সিটি বুক সোসাইটি"কে রক্ষা করেছেন।

জয়নগরে বাসকালেই ছাত্রাবস্থায় যোগীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

অবিনাশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত হ'ন। তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে যোগীন্দ্রনাথ স্বলিখিত যে জীবনী পাঠ করেছিলেন, তাতে দেখেছি,

"তাঁহার (অর্থাৎ অবিনাশচন্দ্রের) পাঠ্যাবস্থায় পরলোকগত পূজনীয় উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু এবং ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী, দীননাথ দত্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ ব্রাহ্মধর্মের মঙ্গলবার্ত্তা লইয়া জয়নগর ও মজিলপুর গ্রামে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাহার ফলে বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু ছাত্রের সহিত আমাদের অগ্রজের চিত্তও ব্রাহ্মসমাজের দিকে বিশেষভাবে আকৃস্ট হইল।"

জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রভাবে একে একে সকল ভ্রাতাই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে যোগীন্দ্রনাথের রচিত "কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন, শত শত আশার কিরণ", "ছোট শিশু মোরা তোমার করুণা", "জগতের পিতা তুমি করুণানিধান", এবং "বরষের পরে পিতা এসেছি আবার"—এই চারটি বালকবালিকাদের প্রার্থনা সঙ্গীত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্তর্গত হয়। মাঘোৎসবে বালকবালিকারা এ সঙ্গীতগুলি গেয়ে থাকে। কিন্তু ঠিক কত সনে যোগীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তা জানতে পারি নি। তবে মনে হয় যে, তাঁরা সকলেই, এমন কি, তাঁদের পিতা পর্য্যন্ত অগ্রসরপন্থী অবিনাশচন্দ্রের মতামতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কারণ যোগীন্দ্রনাথ লিখিত অবিনাশচন্দ্রের জীবনীতে দেখছি :—"ধর্ম্মবিষয়ে অগ্রজের মত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কুরীতির সহিত সংগ্রামেও তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। আমাদের পরলোকগতা কনিষ্ঠা ভগিনী নীরদবাসিনী ১২।১৩ বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতেই পিতৃদেব পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ তাহার বিবাহ দিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু অগ্রজ মহাশয় দৃঢ়তার সহিত এই প্রস্তাবে বাধা দিতে লাগিলেন। একদিকে ভগিনীর মঙ্গলচিন্তা, অপর দিকে পিতৃদেব পাছে মনঃপীড়ায় কাতর হন, সেই আশঙ্কা,—এই উভয় সমস্যার মধ্যে পড়িয়া তাঁহার কোমল হৃদয় যারপরনাই ব্যথিত হইতে লাগিল। তিনি পিতার পদতলে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ কাতর প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু একপদও বিচলিত হইলেন না। এ সম্বন্ধে অগ্রজের দৃঢ়তা দেখিয়া শেষে আমাদের স্নেহপ্রবণ পিতার হৃদয় বিগলিত হইল।"

এনট্রান্স পাশ করে এফ, এ পড়তে পড়তে অবিনাশচন্দ্রকে মাতৃদেবীর পীড়ার জন্য অধ্যয়ন ত্যাগ করে দেশে ফিরে যেতে হয় এবং ১৮৭৭ সনে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁদের মাতৃবিয়োগ হয়। শুনেছি মৃত্যুকালে ১২ বৎসরের বালিকা পুত্রবধূর হস্তে সকল পুত্রকন্যার হস্ত সমর্পণ করে তিনি একরূপ বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করেন।

১৮৭৯ সনে কলকাতার একটি স্কুলে অবিনাশচন্দ্র শিক্ষকতা আরম্ভ করেন এবং মনে হয় যে সমস্ত পরিবারটির ভরণপোষণের ভার তাঁরই উপর পড়ে। পিতা নন্দলাল অবশ্য তখনও জীবিত ছিলেন। চার বৎসর পরে তাঁরা সপরিবারে কলকাতায় এলেন। এই সময় দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁদের যে ঘোর সংগ্রাম করতে হয়েছে, তা আজকের দিনে উপকথা বলে মনে হবে। শুনেছি জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতার সবশুদ্ধ তিনটি ধুতি ছিল। একজন কাপড় ছেড়ে কেচে দিলে এবং সেই কাপড় শুকোলে অন্য ভ্রাতা কাপড় বদলাবার সুযোগ পেতেন। ইতিমধ্যে কিছুদিনের জন্য অবিনাশচন্দ্র সুবর্ণপুর নামক একস্থানে স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য পেলেন। দেড় বৎসর সে স্থানে তিনি ছিলেন। সে সময় তিনি সামান্যই উপার্জ্জন করতেন। তার মধ্যে মাত্র তিনটি টাকা নিজের জন্য রেখে অবশিষ্ট টাকা কলকাতায় পাঠাতেন। এই সামান্য অর্থে কষ্টে তাঁর দিনাতিপাত হত। সকালে নিজেই ভাতে ভাত রেঁধে খেতেন। রাত্রের জন্য একটা দোকানে তিন ছটাক ময়দা বরাদ্দ করা ছিল। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পালাক্রমে একজন সেই ময়দা নিয়ে গিয়ে বাড়ীর থেকে রুটি তৈরী করে পাঠাত, কেউ একটু চিনি, কেউ বা অক্ষমতা বশতঃ শুধুই লবণ। যে যা পাঠাত তিনি সন্তুষ্ট মনে তাই খেতেন।

ওদিকে তাঁর প্রেরিত যৎসামান্য অর্থে কলকাতার সংসার চলাও দুষ্কর ছিল। ভ্রাতাদের ছাত্রাবস্থা শেষ হয়নি। তাঁরা রাত্রে কেরোসিন তেলের অভাবে ল্যাম্প বা লণ্ঠন জ্বালাতে না পেরে রাস্তায় গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে পড়াশোনা করতে লাগলেন। জীবনের এই কঠোর সংগ্রামের দিনগুলির কথাও যখন বলতেন, যোগীন্দ্রনাথের মুখের হাসি ম্লান হতে দেখিনি। কোনও ধনী পরিবারের সন্তানদের সঙ্গে তুলনা করে নিজেদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা কখনও উল্লেখ করতেন না। মনে হয়, ধনী ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষ্যায় নিজেদের দারিদ্র্য নিয়ে গৌরববোধ করবার

পশ্চাতে যে হীনমন্যতা আছে, তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

এই সময় দেওঘর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীলেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বালক যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে দেওঘর নিয়ে গিয়ে সেখানকার স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় এসে তিনি সিটি কলেজে এফ, এ পড়তে আরম্ভ করেন কিন্তু এর কিছুদিন পরেই তাঁর ছাত্রজীবন সমাপ্ত হয়। এ স্থলে একটি বিষয় উল্লেখ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এফ, এ পড়বার সময় ঐচ্ছিক পাঠ্য বিষয় হিসাবে তিনি ল্যাটিন ভাষা নির্ব্বাচন করেছিলেন। সুতরাং ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁর প্রাথমিক জ্ঞান ছিল বলেই অনুমান হয়।

এই সময় যুবক যোগীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবী সহধর্ম্মিনী বৈকুণ্ঠনাথ রায়ের কন্যা পঞ্চদশ বৎসর বয়স্কা শ্রীমতী স্বর্ণলতা বা গিরিবালাকে দেখলেন এবং তাঁর অভিভাবক জ্যেষ্ঠভ্রাতা গৌরীকান্ত রায়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করলেন। গৌরীকান্ত বল্লেন যে, তাঁর ভগিনী বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ দেবেন না। তখন রায় পরিবার বৎসরের অধিকাংশ সময় সিমলায় থাকতেন। মাতামহীর (স্বর্ণলতা বা গিরিবালা দেবী) স্বলজ্জ উক্তি থেকে আবিষ্কার করলাম যে, তাঁরা কলকাতায় এলে যোগীন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁদের গৃহে বেড়াতে যেতেন কিন্তু বালিকা স্বর্ণলতা তাঁকে দেখলেই পলায়ন করতেন আর উপায়ান্তর না থাকাতে যোগীন্দ্রনাথ গৌরীকান্তের পত্নীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে গৃহে ফিরতেন। গৌরীকান্তের কন্যা শ্রীযুক্তা পুণ্যলতা রায়ের নিকট শুনেছি, যুবক যোগীন্দ্রনাথ সেই পলাতকা বালিকার সম্বন্ধে রসিকতা করে ভাবী শালাজকে (গৌরীকান্তের পত্নীকে) লিখেছিলেন,

"যদি কিছু হয়,
তোমাদের ভয়ে।"

শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ হল যখন পাত্রীর বয়স ১৮ বৎসর এবং পাত্রের ২৫। তারিখ ছিল ১০ই মার্চ্চ, ১৮৯২! বিবাহে পৌরোহিত্য করেছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়।

এই সময় এবং এর অনেকদিন পর পর্য্যন্ত তাঁদের পরিবার একান্নবর্ত্তী ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র ১৮৮৬ সন থেকে ১৮৮৯ সন পর্য্যন্ত মাণিকদহ

নামে কোন স্থানের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ইতিমধ্যে মধ্যমভ্রাতা নীলরতনও ১৮৮৯ সনে মেডিকেল কলেজ থেকে এম, ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। অর্থাৎ যোগীন্দ্রনাথের বিবাহের সময় পারিবারিক অনটন আর তত তীব্র ছিল না। তবু তা সম্পূর্ণ দূরও হয়নি। এই সময় যোগীন্দ্রনাথও পরিবারের ভারস্বরূপ হয়ে না থেকে স্বয়ং উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছায় সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করলেন।

শিক্ষক হিসাবে তিনি সেই সময় যে সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন, তার কথা তাঁর কোন কোন ছাত্র (অর্থাৎ যাঁরা আজও জীবিত আছেন), তাঁরা স্মরণ করে থাকেন। তার মধ্যে অন্যতম শ্রীজীবনময় রায়! ১৮৯১ সনে জীবনবাবু প্রথম যোগীন্দ্রনাথকে দেখেন। ইতিপূর্ব্বে "হাসি ও খেলা" এবং "হাসিখুসি" ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে এবং স্কুলে ভর্ত্তি হবার পূর্ব্বেই বালক জীবনময় একটি "হাসি ও খেলা" উপহার পেয়েছেন। যোগীন্দ্রনাথকে তিনি যখন প্রথম দেখলেন, তখন তাঁর রচিত বহু ছড়াই জীবনবাবুর মুখস্থ হয়ে গেছে। সুতরাং মাষ্টারমশাইকে ঠিক "যমের দোসর" না মনে হয়ে বালকবন্ধুই মনে হয়েছিল। এই সময়ের একটি গল্প জীবনবাবুর মুখে শুনেছি। দ্বিজদাস মজুমদার নামে একটি বালক জীবনবাবুদের ক্লাশে পড়ত। সে ছিল ক্লাশের ফার্ষ্ট বয়। ক্লাশে তখন দুটি সেক্‌সন্। কে কোন সেক্‌সনে থাকবে, তা বোধ হয় যোগীন্দ্রনাথই ঠিক করে দেন। সেক্‌সন্ "এ"তে দ্বিজদাসকে মণিটার করে জীবনময়কে সেক্‌সন্ "বি"র মণিটার করা হলে বালক জীবনময় অভিমানভরে বল্লেন, "সেক্‌সন 'এ'তে সব ভাল ভাল ছেলে। আমি ঐ সেক্‌সন এ থাকব।" অবশ্য তিনি জানতেন যে ফার্ষ্ট বয় দ্বিজদাস থাকতে তিনি সেক্‌সন্ "এ"র মণিটার হতে পারবেন না। শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ ছাত্র জীবনময়কে প্রবোধ দিয়ে বল্লেন, **"Better reign in hell than serve in heaven"** (স্বর্গে দাসত্বের চেয়ে নরকে রাজত্ব করাও ভাল)। কথাটি জীবনময়ের এতই ভাল লেগেছিল যে এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তা স্মরণ করে রেখেছেন।

দাদামশায়ের আর একজন প্রাক্তন ছাত্র (পরে তাঁর মধ্যম অগ্রজ স্যার নীলরতন সরকারের জ্যেষ্ঠ জামাতা) বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু জানিয়েছেন যে, ১৮৯৪ সনে যখন তিনি সিটি

কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র, তখন তিনি প্রথম যোগীন্দ্রনাথকে দেখেন। তবে তিনি তখন সেক্‌সন্‌ "এ"তে পড়তেন এবং যোগীন্দ্রনাথ সেক্‌সন্‌ "বি"র শিক্ষক ছিলেন। সেইজন্য বিদ্যালয়ের বাইরের কতকগুলি স্মৃতিই তাঁর মনে বেশী উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর পিতৃব্য আনন্দমোহন বসু এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা এবং যাতায়াত ছিল। বালক দেবেন্দ্রমোহন দূর থেকে পিতৃব্যের এই অসম বয়সী বন্ধুটিকে দেখতেন। তিনি লিখেছেন :—

"During this period he paid frequent visits to my uncle Ananda Mohan Bose's house at 139 Dharmatola Street. Each year at the annual prize distribution of the Sunday Moral Training School, then located at 13 Cornwallis Street, an action song was performed. I believe on the suggestion of my aunt Lady Abola Bose, your Dadu had to translate into Bengali verse some action plays from English. These were set in tune by Upendra Kishore Roy Chowdhuri. My cousin Hemendra Mohon Bose came to train and drill us to sing few of his songs given below :—

(এই সময় তিনি প্রায়ই আমার পিতৃব্য আনন্দমোহন বসুর ১৩৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে দেখা করতে যেতেন। প্রতি বৎসর ১৩নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে অবস্থিত রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একটি করে সঙ্গীতাভিনয় হ'ত। বোধ হয় লেডী অবলা বসুর অনুপ্রেরণায় তোমার দাদু ইংরেজী থেকে কতকগুলি নাটিকা বাংলা কবিতায় তর্জমা করেন। স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় ঐগুলিতে সুর সংযোজন করেন। হেমেন্দ্রমোহন বসু ঐগুলির অভিনয়ে আমাদের তালিম দিতেন। গানগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম করছি :—

(১) আমি বীর সেনাপতি (২) আমরা সখের সেনা (৩) কোথা থেকে আসছ তুমি ছোট্ট মানুষটি (৪) গণকঠাকুর।

এই পত্র থেকে বোঝা যায় যে পারিবারিক অনটনের জন্য শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করলেও যোগীন্দ্রনাথ শুধু শিক্ষক হয়ে থাকতে চান নি। তাঁর পত্নী অর্থাৎ আমাদের মাতামহীর নিকটে শুনেছি যে সিটি স্কুলে

কাজ আরম্ভ করবার কিছুদিন পরেই তিনি নিজস্ব একটি পুস্তকালয় স্থাপন করবার সঙ্কল্প করলেন। সিটি স্কুলের শিক্ষকতা তিনি কবে ত্যাগ করেছিলেন, সঠিক জানি না। তবে শুনেছি যে পুস্তক রচনা এবং প্রকাশের কাজে তিনি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। তাছাড়া তিনি "মুকুল" নামক কিশোরপাঠ্য মাসিক পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। মুকুলের ছবির জন্য তাগিদ দিতে প্রায়ই তাঁকে তদানীন্তন একমাত্র উডব্লক প্রস্তুতকারক প্রিয়গোপাল্ দাশের নিকট চিৎপুর যেতে হ'ত। সেজন্য স্কুলে যেতে দেরী হত। তিনদিন লেট হলে স্কুলের নিয়ম অনুসারে একদিনের বেতন কাটা যেত। সুতরাং মাসিক পনের টাকা বেতনের পুরো টাকা তিনি কোন মাসেই পেতেন না। শেষে পুস্তক রচনা ও প্রকাশের বাধা জানে এই শিক্ষকতা তিনি ত্যাগ করলেন।

১৮৮৩ সনে পয়লা জানুয়ারী আবির্ভূত হয় "সখা" নামক বালক-বালিকাদের পাঠ্য মাসিক পত্রিকা। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রমদাচরণ সেনের ১৮৮৫ সনে মৃত্যু হয়। তারপর সখার সম্পাদনার কার্য্য করেন একে একে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, অন্নদাচরণ সেন ও বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। নবকৃষ্ণবাবু কিছুদিন অতি কষ্টে পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখবার পর পত্রিকাটি বিলুপ্ত হয়। অধুনালুপ্ত শিশু মাসিক পত্রিকা "কৈশোরক"এ যোগীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই তাঁর এক জীবনী প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার লেখক নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পর লিখেছেন :— "নবকৃষ্ণবাবু বলেন—'সখা' উঠিয়া গেলে যোগীন্দ্রবাবু 'সখা'র ব্লকগুলি কিনিয়া লইবার পর গ্রন্থ প্রকাশ করিতে থাকেন।"

এরপর স্বরচিত পুস্তক বিক্রয়ের জন্য ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীটে যোগীন্দ্রনাথ 'সিটি বুক সোসাইটি' নামক পুস্তকালয়টি স্থাপন করেন।

এটি ১৮৯৬ সনের ঘটনা। ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়েছে যোগীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী বর্ণপরিচয় পুস্তক হাসিখুসি, প্রথম ভাগ। এরপর একদিকে যেমন তাঁর রচনার উৎস খুলে গেল, অপর দিকে সেই পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসাটিরও যথেষ্ট উন্নতি হ'ল।

ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করে তিনি আবার বাল্যকালের ফেলে আসা মাটির আহ্বান শুনতে পেলেন। দেওঘরের বিদ্যালয়ে পাঠকালেই সেখানকার

পার্ব্বত্যভূমি ও লালমাটির রুক্ষ সৌন্দর্য্য তাঁর মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। ১৮৯১ সনে প্রকাশিত (অধুনালুপ্ত) তাঁর "বিকাশ" নামক কবিতা-পুস্তকে যোগীন্দ্রনাথের এই ভালো লাগা একটি কবিতার আকারে পাই। কবিতাটির নাম হল বন্যছবি। তার আরম্ভ এইরূপ :—

"বড় বড় ঢেউতোলা মাঠখানি হেলাদোলা,
গিরি এক মাঝখানে তার,
উঁচু উঁচু মাথা তুলি রহিয়াছে তরুগুলি
শাখে শাখে লতাদেহভার,
কল কল পাখি রব, ফুলদল নাচে সব,
আবেগে মলয় গায় গান,
পাষাণ দোফাঁক করি, নিঝর বহিছে ধীরি,
ফুলপাতা তাহে ভাসমান··"

এই প্রকৃতি প্রেম তাঁকে বরাবর কলকাতার বদ্ধকূপের অন্ধকারে থাকতে দিল না। ধীরে ধীরে তাঁর গিরিডির জমিদারীর পত্তন হল, গিরিডিতে ছোট বড় বহু বাড়ী হ'ল, বাগান হ'ল, বাঁধ হ'ল আর হ'ল বহু দরিদ্র, অশিক্ষিত বেহারী ও সাঁওতালের অন্নসংস্থান—সেই সঙ্গে নিতাড়া ও জয়নগরের বহু লোকেরও অন্নসমস্যার সমাধান হ'ল। কর্ম্মভূমি কলকাতার মোহে যোগীন্দ্রনাথ কোনদিন পূর্ব্বপুরুষের বাস্তুভিটাকে একেবারে ভুলে যাননি। একবার আশ্বিনের ঝড়ে তাঁদের নিতাড়ার বাড়ীঘর পড়ে যায় কিন্তু জমির মালিকানা স্বত্ব যায়নি। সেই জমিতে দাদামশায়ের জ্ঞাতিরা পরে পাকাবাড়ী করেন। ১৯৬২ সনে নিতারা বা ন্যাত্‌ড়ার সেই বাড়ী ও তৎসংলগ্ন বিরাট পুকুর দেখে এলাম। যাঁরা ঐ বাড়ীতে বাস করেছেন, (তাঁদেরও পদবী সরকার) তাঁদের নিকট শুনলাম যে, যতদিন শরীরে শক্তি ছিল, দাদামশায় ঐ পুকুরে মাছ ধরবার জন্য ন্যাতড়ায় গেছেন। ১৯২২ সনে ৮ই আগষ্ট একটি চিঠিতে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রথমা কন্যা অর্থাৎ আমার দিদিকে লিখেছেন, "সেদিন আমি একটা চার সের রুই মাছ ধরেছি। আবার যেদিন যাবো আবার ধরবো।" আবার ১২ই আগষ্ট অর্থাৎ চারদিন পরে লিখেছেন, "দিদিমণি, কাল আবার মাছ ধরতে যাবো। তুমি এখানে নেই, মুড়ো খাবে কে? খুব শীগ্‌গির চলে এস, মুড়ো খাওয়াব।"

দুটো চিঠিই কলকাতা থেকে লেখা। সুতরাং মনে হয় যে, ন্যাতড়ার পুকুরে মাছ ধরতে যাবার কথাই লিখেছেন। এই গ্রামে তিনি যেতেন মুক্ত প্রকৃতির বক্ষে বিচরণ করতে, প্রাণ ভরে খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে আর আকাশ বাতাশের সঙ্গে মিতালী করতে। কর্ম্ম উপলক্ষ্যে যতদিন কলকাতার বদ্ধ আবহাওয়ায় বাস করতে বাধ্য হতেন, তার মধ্যেও সঙ্গলাভের জন্য 'গোলদীঘির'র ধারে নিয়মিত বেড়াতে যেতেন। ১৯২২ সনে আমার দিদিকে লেখা কতকগুলি চিঠি দেখছি। তার একটিতে লিখেছেন, "তুমি নাকি কলকেতায় আসতে চাও না? এই বুঝি দাদুর উপর ভালবাসা? বেশ, তুমি এখানে এলে আমি একা একাই গোলদীঘিতে ঘুরবো।" আর একটি চিঠিতে নাতনীকে লিখেছেন, "তুমি আবার কবে আসবে? তখন মস্ত বড় হয়ে যাবে নয়? আমার সঙ্গে গোলদীঘিতে যেতে পারবে ত?" আর একটি চিঠি, "দিদিমণি, তুমি বেশ বড়সড় হয়েছ শুনে সুখী হলাম। কত বড় হয়েছ? এই বুড়ো দাদুকে কোলে নিতে পারবে ত? এবার যখন আসবে, তোমার কোলে চড়ে গোলদীঘি বেড়াতে যাবো। কেমন?"

একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। তাঁর সেই আদরের নাতনীটি তখন নিতান্তই শিশু। দাদামশায়ের চিঠি পড়বার বা তাঁকে চিঠি লেখবার বয়স তার হয়নি। কিন্তু নাতনীর নাম করে কন্যাকে চিঠি লেখা এবং নাতনীর জবানীতে কন্যার হস্তাক্ষরে চিঠি পাওয়া—সেও দাদু-নাতনীর মধ্যে খেলার অঙ্গ ছিল।

তাঁর এই চিঠিগুলির থেকে মনে হয় যে, বরাবরই তিনি গোলদীঘির ধারে বেড়াতে যেতেন। পক্ষাঘাত হবার পরও (আমরা তাঁর পক্ষাঘাত হবার পরই তাঁকে দেখেছি) অর্থাৎ যখন তাঁর সামান্য চলাফেরার শক্তি অবশিষ্ট ছিল, তখনও অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে একহাতে লাঠি নিয়ে গোলদীঘিতে যাওয়া তাঁর নিত্যকর্ম্ম ছিল! সেখানে তিনি ঠিক সময় কাটাতে যেতেন বলে মনে হয় না কারণ প্রথমতঃ গৃহে বসেই তিনি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ যথেষ্ট পেতেন। দ্বিতীয়তঃ, এ সময় তিনি তো আর অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধ ছিলেন না। বরঞ্চ কর্ম্মের সাগরে "হাবুডুবু" খাচ্ছিলেন। আমার মাকে লেখা তাঁর এই সময়কার একটি চিঠিতে দেখছি, "আমার এখন ভীষণ কাজ। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত কুলীর ন্যায় খাটিয়াও সকল দিক সামলাইতে

পারিতেছি না।" সুতরাং ঠিক বন্ধু-সঙ্গের জন্য বা অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধের সংসার পলাতক মনোভাব নিয়ে নয়, বরঞ্চ একটু খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নেবার জন্যই তিনি গোলদীঘির ধারে বেড়াতে যেতেন বলে মনে হয়।

এবার একটু পিছনের কথায় ফিরে যেতে চাই। যোগীন্দ্রনাথের বিবাহের কিছুদিন অগ্রে বা পশ্চাতে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরা সব ভ্রাতারা ব্রাহ্ম হয়েছেন এবং অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথের অনেক ব্রাহ্মবন্ধুলাভও হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শ্রীআনন্দমোহন বসু অন্যতম ছিলেন। গিরিডিতে একটি ব্রাহ্ম কলোনী স্থাপন করবার ইচ্ছা আনন্দমোহনের ছিল। এই ইচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত ফলবতী হয় এবং যেসব ব্রাহ্মরা তদানীন্তন গিরিডির প্রাণস্বরূপ হন, যোগীন্দ্রনাথও তাদেরই একজন ছিলেন। কিন্তু সে পরে। তার পূর্ব্বে মধুপুরে তাঁর মধ্যম অগ্রজ স্যার নীলরতন একটি গৃহ ক্রয় করেন। তখন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী মধুপুরে বাড়ী করেছেন। এঁরা ছাড়া ঠাকুর পরিবারের কেউ কেউও বাড়ী করেছিলেন। ঠিক কত সনে স্যার নীলরতনের এ বাড়ী তৈরী বা কেনা হয়; এবং কত সনেই বা বিক্রী করে দেওয়া হয়, তা জানি না। তবে জ্যেষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্রনাথ ও দ্বিতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথকে নিয়ে যোগীন্দ্রনাথ প্রায়ই সপত্নীক মধুপুর যেতেন। এই গৃহেই মেজমামা সুধীন্দ্রনাথের নামকরণ হয়। আমার মা যোগীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা। এই বাড়ীতে বাস করার কথা তাঁর শেষ জীবনে তিনি মনে করতে পারতেন না। সুতরাং অনুমান হয় যে বিংশ শতকের প্রথমেই ওঁরা মধুপুর যাওয়া বন্ধ করেন অর্থাৎ এই বাড়ীটি বিক্রী হয়ে যায়।

এর পরের ইতিহাস গিরিডির সঙ্গে জড়িত। আনুমানিক ১৯০০ সনে নীলরতন সরকার সংবাদ পত্রে দেখলেন যে বার্ড কোম্পানী মফতপুরে (অর্থাৎ বর্ত্তমান গিরিডিতে) চারটি বাড়ী বিক্রী করবে এবং যাঁরা বাড়ী কিনবেন, তাঁদের উপর ষাট বিঘা জমি বিক্রয় করবার ভার দেওয়া হবে। শোনা যায়, মফতপুর থেকে ২০।২৫ মাইল দূরে বারগণ্ডা নামে একটি গ্রাম আছে। সেখান থেকে মফতপুরে তামার আকরিক (ore) এবং আসত বার্ড কোম্পানী তা থেকে তামা নিষ্কাশন করত। বারগণ্ডা থেকে আকরিক আসত বলে মফতপুরের এই সম্পূর্ণ পাড়াটারই নাম

বারগণ্ডা হয়ে যায়। স্যার নীলরতন কাগজে বাড়ী বিক্রীর খবর দেখে তাঁর বিশেষ বন্ধু শশীভূষণ বসুকে ঐ বাড়ী চারটি কিনতে পাঠান। নীলরতনের প্রদত্ত চব্বিশ শত টাকায় শশীবাবু ঐ বাড়ীগুলি কেনেন এবং ষাট বিঘা জমি বিক্রী করবার ভার নেন। ঐ জমি শশীবাবু ক্রমে ক্রমে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিক্রী করেন। আনুমানিক ১৯০০ শতকে যোগীন্দ্রনাথ শশীভূষণ বসুর বাড়ী সংলগ্ন তিন বিঘা জমি কিনে নিলেন এবং ১৯০৩ সনের শেষে নিজের অঙ্কিত নক্সা অনুযায়ী একটি সুন্দর বাড়ী তৈরী করতে আরম্ভ করলেন। ঐ বাড়ী অর্থাৎ 'গোলকুঠি'ই পরে গিরিডিবাসী বাঙ্গালীদের আনন্দ উৎসবের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। শুনেছি, ১৯০৪ সনের প্রথমেই গোলকুঠী বাসযোগ্য হয়ে উঠল। তখনও বাড়ীটিতে ঘের-দেয়াল হয়নি, ছাদে ওঠবার সিঁড়ি হয় নি, তবুও তিনি সপরিবারে সেই অসম্পূর্ণ বাড়ীতে বাস করতেই গিরিডি গেলেন। এই হ'ল তাঁর গিরিডি বাসের আরম্ভ। এর পরও তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র কলকাতাতেই ছিল, অথবা আরও একটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে, কলকাতা ছিল তাঁর উপার্জ্জনের ক্ষেত্র আর গিরিডিতে ছিল তাঁর আনন্দ, স্বপ্ন আর অধ্যবসায় দিয়ে গড়া মায়াপুরী।

কর্ম্মসূত্রে কলকাতায় থাকতে বাধ্য হলেও গিরিডিতে জমি কেনবার পর গিরিডি মোহিনীর মত তাঁকে হাতছানি দিত। পরে তিনি গোলকুঠী ছাড়াও আরও অনেক ছোট ছোট বাড়ী ধীরে ধীরে তৈরী করালেন। এ বাড়ীগুলি গিরিডির নানা স্থানে ছড়ান ছিল। এগুলি আকারে ছোট ছিল এবং এই সব বাড়ীর দেওয়াল ইটের হলেও ছাদ টালির তৈরী ছিল। মনে হয়, সাধারণ অবস্থার লোকদের ভাড়া দেবার জন্যই এগুলি তৈরী করান হয়েছিল। এ ছাড়াও তাঁর তিনটি পুকুর ছিল। তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পুকুরটি পাড় সমেত ছ বিঘে জমি অধিকার করে ছিল। তার বাঁধান ঘাট এবং কাকচক্ষু জল দর্শকের নয়নকে মুগ্ধ করত। প্রধানত ছিপে মাছ ধরবার জন্যই গিরিডিতে একটা বাঁধ এবং তিনটে পুকুর কাটিয়েছিলেন। বড় পুকুরটি আন্দাজ ১৯১০।১১ সনে কাটান হয়। সে সময়ও এটা কাটাতে প্রায় ৬০০ টাকা খরচ হয়। মেজমামা সুধীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে প্রশ্ন করেন, "দুটো পুকুর ত আছে। আবার একটা কেন?" তিনি হাসতে হাসতে বলেন, "আর কিছু না হোক, কটা গরীব লোক তো খেয়ে বাঁচছে।"

আরও অনেক শিক্ষিত লোকের মতই তাঁর ছিপে মাছ ধরবার সখ ছিল। যোগীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কোন এক স্মৃতি সভায় সুনির্ম্মল বসু একটি রচনা পাঠ করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছেন, "যোগীন্দ্রনাথের মাছ ধরিবারে সখ ছিল খুব বেশী রকম। আমরা দেখেছি গিরিডিতে ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি ছাতা মাথায় দিয়ে টোপ ফেলে বসে আছেন পুকুরের ধারে। ঝড়বাদল রোদ বাতাস কিছুতেই তাঁর দৃষ্টি নাই। অসম্ভব ধৈর্য্যশক্তির পরিচয় এটা।

"একদিন তিনি মাছ ধরতে চলেছেন—হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা আমি তখন স্কুলের বালক। বই নিয়ে স্কুলে চলেছি। আমায় দেখে, তিনি তাঁর স্বাভাবিক মধুর হাসি হেসে বল্লেন—

"ওহে লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে
মৎস ধরিবে খাইবে সুখে।"

ছিপে অনেকেই মাছ ধরতে পারেন কিন্তু দাদামশায় জালও ফেলতে পারতেন। তাঁর মাছ ধরবার সখ অবশ্য নিজের পুকুরে ধরেই মিটত না। সখ বা নেশামাত্রেরই ধর্ম্ম অনুসারে তাঁকে টেনে নিয়ে যেত গিরিডি সহর থেকে দূরে নানা স্থানে। এই রকম একটি মাছ ধরবার স্থান ছিল উশ্রী প্রপাতের দিকে শ্রীরামপুরে। আরও যে সব জায়গায় তিনি এই উপলক্ষ্যে যেতেন, তাদের মধ্যে পচম্বার দিকে আধানাচুয়া নামে একটি স্থান ছিল, উশ্রী নদীর ওপারে ছিল দাশডিহি। শুনেছি তাঁর বন্ধু সারদারঞ্জন রায়ের একটি Sporting store ছিল। সেখানে মাছ ধরবার জন্য "চার" বিক্রী হত। দাদামশায় এই কেনা "চার" দিয়ে মাছ না ধরে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় চার তৈরী করতেন। তার উপকরণ ছিল পচা পনীর, পচা আলু, ঘি ইত্যাদি। সারদাবাবুর দোকানে যে চার বিক্রী হত, তার একটি কৌতুকাবহ নাম ছিল, "ইধর আও।" রসিকতায় দাদামশাই হারবেন কেন? তাঁর চারের নাম হ'ল "উধর মৎ যাও।" অবশ্য সারদারঞ্জনের চার ছিল বিক্রীর জন্য। সুতরাং খরিদ্দারকে আকর্ষণ করবার পক্ষে তাঁর চারের নামটি ঠিক উপযুক্তই হয়েছিল। দাদামশায় তো চার বিক্রী করতেন না। সুতরাং তাঁর চারের নাম যাই হোক, তাতে তাঁর ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। তবে মনুষ্য ভাষায় অজ্ঞ মাছের দল তাঁর চারের নামের অর্থ

না বুঝলেও ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁর ছিপে উঠে আসত। তার পর সেই সব মাছ ঘোড়ার গাড়ী করে বাড়ী নিয়ে আসতে হত। শুনেছি একবার এত মাছ ধরেছিলেন যে গাড়োয়ান বলেছিল, "বাবু, আমার ঘোড়া এত ভারী জিনিস টানতে পারবে না।" দাদামশায়ের শিকারের সখও ছিল। তাঁর একটা দুনলা বন্দুক ছিল। তা দিয়ে অনেক পাখী শিকার করতেন। কিন্তু তিনি কখনও বড় জন্তু মারেন নি। অবশ্য একবার গিরিডির নিকটে তিলৌড়ী পাহাড়ের নীচে কোয়াড়ের জঙ্গলে বন্ধুদের নিয়ে তিনি ভালুক শিকারে গিয়েছিলেন। জঙ্গলের মধ্যে তাঁরা একজন এক একটি স্থান নির্ব্বাচন করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কতক্ষণ অপেক্ষার পর জানি না, একজন শিকারীর (?) সামনে ভালুকের আবির্ভাব হ'ল কিন্তু সেই ভদ্রলোক ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। বন্দুক সমেত তাঁর হাত আর উঠল না। সুতরাং বনের ভালুক নির্ব্বিবাদে এবং অক্ষত অবস্থায় ফিরে গেল। শিকারীরাও ঘরের মানুষ ঘরে ফিরলেন। এই একবার ছাড়া আর বোধহয় কখনও দাদামশায় বড় জন্তু মারবার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু তিনি বোধ হয় চেষ্টা করলে বড় শিকারী হ'তে পারতেন অর্থাৎ শিকারীর instinct তাঁর মধ্যে ছিল বলেই মনে হয়। তা না হলে শুধু শিকার কাহিনী শুনে বা পড়ে "বনে জঙ্গলে"র মতন অমন সুন্দর শিকার কাহিনী তিনি লিখতে পারতেন না। বইটিকে কিশোর পাঠ্য বলা হয়ে থাকে। নির্দ্দোষ ভাব এবং সাবলীল ভাষার জন্যই একথা বলা হয়। তা না হলে শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় বা শ্রীবিশ্বনাথ বসু প্রমুখ পাকা শিকারীর লেখার চেয়ে তাঁর লেখা শিকার কাহিনীও বয়স্কদের কম উপভোগ্য মনে হয় না! বরঞ্চ দাদামশায় যখন "বনে জঙ্গলে" লিখেছেন, তখন বাংলা ভাষায় শিকার বিষয়ক বই কমই লেখা হয়েছে। তাই মনে হয়, ইচ্ছা করলে তিনি একজন বড় শিকারী হতে পারতেন।

কিন্তু শুধু তো শিকার বা মাছ ধরা নয়, তাঁর সখ ছিল ফুলের বাগান, ফলের বাগান, তরিতরকারীর বাগান করার, তাঁর সখ ছিল বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে জমিয়ে মজলিশ করবার, লোক খাওয়াবার আর ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে ভাব জমাবার। জীবনে তিনি অজস্র উপার্জ্জন করেছেন কিন্তু সঞ্চয় করেছেন সামান্যই। নদী যেমন আপন খেয়ালে

বয়ে চলে, চলাতেই যেমন তার আনন্দ, সঞ্চয়ে নয়, দাদামশায়ও তেমনি "পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয়" ক্ষয় করেছিলেন। আবার নদী যেমন পাহাড় থেকে যা নিয়ে আসে তা নিজের জন্য না রেখে পলিমাটি আকারে দুই তীরকে উপহার দিয়ে উর্ব্বরা করে তেমনি তাঁর যা কিছু উপার্জ্জন, তার অধিকাংশই পরের হিত, এমন কি, পরকে আনন্দ দেবার জন্য ব্যয় করেছেন। এমন বিরাট পুরুষ আজকের যুগে দুর্লভ।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যখন দাদামশায় (যোগীন্দ্রনাথ সরকার) গোলকুঠী তৈরীর কাজ তদারক করেছেন, তখন রবীন্দ্রনাথও গিরিডিতে ছিলেন। তিনি প্রায়ই যোগীন্দ্রনাথের নিকটে আসতেন এবং বাগানের কোনখানে কোন গাছ পুঁতলে ভাল হয়, সে সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেন। বলা বাহুল্য, দাদামশায়ের বাগান করবার ভারী সখ ছিল। গোলকুঠী সংলগ্ন তিন বিঘে জমিতে তিনি এমন সুন্দর বাগান করেছিলেন যে, শুনেছি গোলাপ, মাধবী, মালতী, জুঁই, বেল, কামিনী, শেফালিকা, চাঁপা, ঝুমকো, স্থলপদ্ম, রক্তজবা ইত্যাদি দেশী এবং ম্যাগ্‌নোলিয়া, বোগেনভিলা ইত্যাদি বিলিতী ফুল সবই ছিল। তবু তার মধ্যে তাঁর গোলাপের বাগানটিই নাকি বিশেষরূপে দৃষ্টি অকর্ষণ করত।

অবশ্য তিনি শুধু ফুলের বাগানই করেন নি। নানারকম ফল গাছও তাঁর বাগানে ছিল। বলতে গেলে সে অসংখ্য ফল—নানারকম আম, লিচু, পাতিলেবু, করমচা, বাতাবী লেবু, বেল, পেয়ারা, আতা, ডালিম, পীচ, আঙ্গুর, নারকেলী কুল, জামরুল, নারকেল ইতাদি সবই তাঁর বাগানে ছিল। আর আমও ছিল নানারকম—ল্যাংড়া, বোম্বাই, ফজলি, কিষেণ ভোগ, জর্দ্দালু ইত্যাদি।

জমির চারিদিকে Boundary Wall (প্রাচীরের) এর ধারে তিনি প্রায় কুড়ি ফুট অন্তর ইউকালিপ্‌টস্‌ গাছ লাগিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্তে পরে অনেকেই ঐ গাছ তাঁদের বাগানে লাগান কিন্তু গোলকুঠীর গাছের মত অত বড় এবং মোটা গাছ আর কোন বাড়ীতেই হয় নি। মাটি থেকে তিন ফুট উপরেও গোলকুঠীর কোন কোন ইউকালিপ্‌টস্‌ গাছের circumference প্রায় ন ফুট। দাদামশায়ের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান ও যত্নেই গাছ এত বড় এবং মোটা হয়েছিল। ঐটুকু বাগানের পরিচর্য্যা

করবার জন্য ৫/৬ জন মালি ছিল কিন্তু শুধু মালিদের ওপর সব কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি কোন দিন নিশ্চিন্ত থাকতেন না। তাদের সঙ্গে তিনিও প্রত্যহ বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাগানের কাজ করতেন।

দাদামশাই যখন বাড়ী তৈরী করেন, গোলকুঠী থেকে উশ্রী নদী পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যেত কারণ তখন সেখানে বাড়ীঘর খুবই কম ছিল। ফলে "আঁধি" নামক ধূলোর ঝড়ের প্রকোপও খুব প্রবলভাবে অনুভূত হ'ত এবং ইউকালিপটস গাছগুলিও যাতে হেলে না যায়, তার জন্য বাঁশ দিয়ে সেগুলিকে তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন। একবার আঁধির সময় গেটের দুধারের গাছ দুটি এত বেশী দুলতে লাগল যে দাদামশাই এবং তার হেড মালি "বিহারী" গাছ দুটিকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু আঁধির প্রকোপ থেকে সেগুলিকে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারলেন না। গাছের উপর দিক ঝড়ে উড়ে গেল। তখন দাদামশাই নিজের চিকিৎসা করলেন। তাঁর নির্দ্দেশে গাছগুলির উপরের অংশ কোণাকুণিভাবে কেটে গোবর আর মাটি লাগিয়ে কলাপাতা দিয়ে মুড়ে রাখা হল। এই চিকিৎসার ফলে সত্য সত্যই পরে ঐ গাছ খুবই লম্বা হয়েছিল।

গোলকুঠী তৈরীর সময় এবং তার কয়েক বৎসর পর পর্য্যন্ত বারগণ্ডায় দশ বারটার বেশী বাড়ী ছিল না। "ক্রিশ্চান হিল"এর পাশ দিয়ে মেছুনীরা হেঁটে আসত। গোলকুঠীর চাতালে বসে এই দৃশ্য দেখা যেত। অবশ্য অত দূর থেকে মানুষ চেনা যেত না নিশ্চয়ই। তবে তাদের শাড়ী পরবার বিশেষ ভঙ্গীটি দেখে অনুমান করা যেত যে তারা মাছওয়ালী। ক্রিশ্চান হিলের উপর কেউ চড়লেও গোলকুঠী থেকে দেখা যেত। "ক্রিশ্চান হিল" ঠিক পাহাড় নয়। একটি উঁচু টিলা মাত্র। সম্ভবতঃ গিরিডির নিকটস্থ "পচম্বার" ক্রিশ্চান মিশনের নামানুসারে এর নাম হয়। আর গোলকুঠির নামকরণ বোধ হয় মিস্ত্রীদের দ্বারা হয়েছে। কারণ বাড়ীটির সামনের দিকটা একেবারে গোল এবং গোল বারান্দা দিয়ে ঘেরা। সেই বারান্দার একপ্রান্তে অর্থাৎ যে দিকে ফটক সে দিকে একটি গোল চাতাল, তার দুপ্রান্তে গোল করে বেঞ্চের মত লম্বা আসন। তাতে পিছনে হেলান দেবারও জায়গা আছে। দুদিকেরই আসনে এক সঙ্গে দশ বার জন

অবধি বসতে পারে অর্থাৎ "আড্ডা" দেবার জন্য, অথবা একটু মার্জ্জিত ভাষায় বলতে গেলে মজলিশ বসাবার জন্য অতি উপযুক্ত জায়গা। সারাদিনের কাজকর্ম্মের পর এখানে দাদামশায়ের সান্ধ্য আসর বসত।

তিনি গিরিডিতে বাড়ী করবার পর একে একে বহু ব্রাহ্ম এলেন। অবশ্য ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাঁর পূর্ব্বেই সপরিবারে এসেছিলেন। তবে তাঁরা বারগণ্ডা থেকে দূরে "পচম্বা" নামক জায়গায় থাকতেন। পরে বহু ব্রাহ্ম এসে বারগণ্ডাতেই বাড়ী করেন। এঁদের মধ্যে দুচার জন ভিন্ন সকলেই ছিলেন মৌসুমী পাখী—তাঁরা পূজোর সময় বা শীত কালে গিরিডিতে থাকতেন, অন্য সময় যে যার কর্ম্মস্থলে। বাড়ীগুলি হয় তখন খালি থাকতো, নয়তো ভাড়া দেওয়া থাকত। শশীভূষণ বসু তো স্যার নীলরতনের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী কেনেন। পরে দাদামশায়ের ভাই বোনেরাও কেউ কেউ বারগণ্ডায় বাড়ী করেন। স্যার নীলরতনের গিরিডির বাড়ীটির নাম ছিল "মাঝলা কুঠি"। আর এঁদের ভগিনী ৺ক্ষীরোদ বাসিনী দেবীর বাড়ীর নাম ছিল জোড়া বাংলো। এই পাড়াতেই ৺সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের 'উপলা পথ' নামক সুন্দর গৃহটি ছিল। গোলকুঠীর দক্ষিণে ছিল ৺গগন চন্দ্র হোমের গৃহ "হোম ভীলা"। একটু দূরে নিউ বারগণ্ডায় ৺হেরম্ব মৈত্র মহাশয়েরও বাড়ী ছিল। আর বহু ব্রাহ্ম গিরিডিতে বাড়ী করেছিলেন এবং যাতযাত করতেন। "দাসাশ্রম" নামে কলকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। শ্রীজীবনময় রায়ের নিকট শুনেছি যে, সেখানে রাস্তা থেকে রোগী কুড়িয়ে এনে তাদের চিকিৎসা করা হত। এখানকার কর্ণধার বা কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী, ইন্দুভূষণ রায়, ক্ষীরোদ চন্দ্র দাস, প্রভৃতি সকলেই সস্ত্রীক এই ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। একবার দাসাশ্রমের রোগীদের গিরিডিতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আনন্দমোহন বসু সুতরাং গিরিডিতে ব্রাহ্ম কলোনী স্থাপনের যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তা সফল হয়েছিল।

দাদামশাই অত্যন্ত রসিক, আমোদপ্রিয় এবং বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাই তাঁর গিরিডির গৃহে সন্ধ্যা থেকে রাত পর্য্যন্ত অতিথির পর অতিথি আসার বিরাম ছিল না। যিনিই আসতেন, তাঁকে চা দিয়ে, পান দিয়ে

অভ্যর্থনা করা হত। শুনেছি এঁরা বেশীর ভাগই সপরিবারে আসতেন এবং গল্পগুজবের সময় তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যেতেন। একটি ছিল বালক-বালিকাদের দল, অপর দুটি বয়স্ক মহিলা ও পুরুষের দল। বলাবাহুল্য নারী-পুরুষের সম্মিলিত আসরের প্রচলন তখনও হয়নি।

অতিথি অভ্যাগতের কোলাহলে সারা সন্ধ্যা গোলকুঠি গমগম করত। শুনেছি রাত দশটায় অতিথিরা সকলে চলে গেলে খাওয়াদাওয়ার পর দাদামশায় তাঁর বিশেষ প্রিয় একটি আরামকেদারায় বসতেন। এই আরামকেদারাটির আবার এক ইতিহাস আছে। ১৯০৮ সনে একবার যোগীন্দ্রনাথের চারটি পুত্রকন্যার একসঙ্গে অসুখ করে। বেঙ্গল কোল কোম্পানির ডাক্তার প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয় এই অসুখের চিকিৎসা করেন। তিনি রাত্রেও এসে তাঁর শিশুরোগীদের দেখবেন এবং দরকার হলে সেখানেই বিশ্রাম করবেন, এই উদ্দেশ্য নিয়ে এক ভদ্রলোক দুখানি কাঠের "ফোল্ডিং" চেয়ার গোলকুঠিতে পাঠিয়ে দেন। ছেলেমেয়েদের অসুখ সারবার পরও যোগীন্দ্রনাথ সময় পেলেই এই দুটি চেয়ারের একটিতে বসতেন। শীতকাল ছাড়া অন্য সময় যখনই তিনি গিরিডি যেতেন, রাত দশটায় খাওয়াদাওয়ার পর বাইরের চাতালে ঐ আরামকেদারায় বিশ্রাম করতেন এবং তাঁর প্রিয় 'হেডমালি' বিহারী তাঁর পদসেবা করত। সেই সময় বেহারীর সঙ্গে তাঁর নানারকম গল্প হত। বেশীর ভাগ সময়ই সে ছিল বক্তা আর দাদমশাই শ্রোতা।

তখন গিরিডিতে ম্যুনিসিপালিটি হয়নি। সুতরাং গোলকুঠির সামনের যে রাস্তা ষ্টেশন থেকে নদী পেরিয়ে ওপারে চলে গেছে, সেই বাঙ্গাবাদ রোডে কোনও আলো ছিল না। গোলকুঠির চাতালে বসে দূরে রাত্রির ঘন অন্ধকার ভেদ করে আলোর শিখার দপ্‌দপানি দেখা যেত। থেকে থেকে এই রকম আলো দেখা যেত আর বেহারী বলত "ভূত যাচ্ছে।" বলা বাহুল্য এই সব অঞ্চলের অশিক্ষিত লোকেরা তখন ভূতের অস্তিত্বে অতি মাত্রায় বিশ্বাসী ছিল। এসব ভূতেদের আবার নানারকম নামও ছিল, যথা, বিশাচেড়ী (এটি স্ত্রীভূত অর্থাৎ পেত্নী), কারুদানো (ইনি পুরুষ ভূত) ইত্যাদি। দাদামশাই এই সরল, অশিক্ষিত বেহারীর সঙ্গে সমপদস্থের মত কথা বলে যেতেন, প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক তাঁর মনে থাকত না।

একদিকে এমনি করে গিরিডিতে গিয়ে যখন খোলা আকাশের নীচে

প্রকৃতির সঙ্গে মিতালী চলেছে, অপর দিকে তখন যোগীন্দ্রনাথ বইয়ের পর বই প্রকাশ করে চলেছেন। ইতিপূর্ব্বে বাংলা ১২৯৮ অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৯১ সনে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম পুস্তক "বিকাশ" এবং পরের বৎসর প্রকাশিত হয়েছিল "দীপ্তি"। দুখানি পুস্তকই যে তখন সমাদৃত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতী, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী প্রভৃতি তদানীন্তন বহুবিখ্যাত সাময়িক পত্রিকাতে বিকাশের কবিতাগুলির প্রশংসামূলক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। দীপ্তির শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে এই সকল অভিমতের উল্লেখ পাই। দীপ্তির সম্বন্ধেও অনুকূল আলোচনা প্রকাশিত হয়ে থাকা সম্ভব কিন্তু গ্রন্থগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত না হওয়াতে (অথবা হয়ে থাকলেও বর্ত্তমানে সেগুলি দুষ্প্রাপ্য বলে) দীপ্তির সম্বন্ধে সুধীজনের মতামত জানতে পারিনি।

নানাধরণের কবিতায় এই পুস্তক দুটির পৃষ্ঠা পূর্ণ ছিল। তার মধ্যে বিকাশের "সহানুভূতি" কবিতাটির আরম্ভ ছিল এইরূপ ঃ—

"এ বিশ্ব মন্দিরে দেবতা কি নাই,
আসিবি না কেউ প্রাণের কাছে?
দেখিবি না মোর তৃষিত নয়ান
জ্বলন্ত পিপাসা তাহার মাঝে?"

পরে কবি লিখেছেন,

"ধূলার মতন পায় লেগে রব,
চাই না তোদের হৃদয়ে স্থান;
এ হৃদয়টুকু তোদিগে বিলাব,
প্রতিদানে কারো চাই না প্রাণ।"

এই কবিতায় কবিহৃদয়ের যে উচ্ছ্বাস ও অভিমানের নিদর্শন পাই, তাঁর তরুণ বয়সের কথা স্মরণ করে তা ক্ষমার্হ। এইরূপ আর একটি কবিতা "দীপ্তি"র নিরাশ্রয় তারকা।

"প্রতি সায়াহ্ন গগন জাগিবার আগে
অতি সঙ্কোচ ভরেতে ফুটি,
বল্ কার পানে তুই রাখিস মেলিয়া
তোর মলিন নয়ান দুটী!

*　　　*　　　*

শুধু দহিয়া দহিয়া সন্তাপ-অনলে
তোর জ্বলিছে দলিত হিয়া ;
তবু নিঠুর জগতে, তোর অাঁখিধারা
কেহ মুছাল না কাছে গিয়া !
হেথা নাহিক হৃদয়, হৃদয়ের প্রেম,
নাহি একটি বিরাম গেহ ;
ক্ষুদ্র দগ্ধ প্রাণের বেদনা জুড়াতে,
হেথা একটু নাহিক স্নেহ।" ইত্যাদি

ভাবের আবেগপূর্ণ কয়েকটি প্রেমের কবিতাও বিকাশে আছে। তার একটি "অতৃপ্ত বাসনা",

"যে যারে চায় হে সখা,
সে যদি পাইত তায় ;
এত অশ্রু তবে বল
বহিত কি এ ধরায় ?

* * *

শোক চায় শোক ভুলে
গায় সুখ গান,
প্রাণ চায় প্রাণ দিয়ে
পায় নব প্রাণ......"

যোগীন্দ্রনাথের সব প্রেমের কবিতাতেই যে এমন দার্শনিক ভঙ্গী ফুটে উঠেছে, তা নয়। "অাঁখি" নামে শুধু ভাবাবেগে পূর্ণ একটি প্রেমের কবিতা বিকাশে পাই :—

"অাঁখি দুটি থাক ফুটি এমনি করিয়া,
সুধার আবেশে যাক্ হৃদয় ভরিয়া !
নাই বা খুলিলে বালা হৃদয় দুয়ার,
নাই বা দেখালে রম্য প্রতিচ্ছায়া তার ;
ওই দেখ তব অাঁখি আবরণ টুটি
কত ফুল্ল ভাবরাশি উঠিয়াছে ফুটি ;
দেখ চেয়ে তব নেত্রে, বিকশিত প্রতি ছত্রে

হৃদয় ভাষাতে কত স্নেহ ভালবাসা ;
দেখ চারু আঁখিপাতে, সরম ঘোমটা হতে
লুকান হৃদয় তব উঠেছে ফুটিয়া !
আঁখি দুটি থাক ফুটি এমনি করিয়া।"

আবার বিকাশের "বন্যছবি", দীপ্তির "প্রকৃতি পূজা" ইত্যাদি কবিতায় কবির প্রকৃতি-প্রেমের সাক্ষ্য বহন করে। প্রকৃতি প্রেম থেকে কবির মনে যে ঈশ্বর-প্রেমের সূত্রপাত হয়েছিল, তারও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় পুস্তক দু'খানিতে।

কবিতাগুলি পাঠ করলেই সেই তরুণ কবির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের বিষয় অনুমান করা যায়। কিন্তু সাহিত্যের এই শাখায় যোগীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা আর অধিক দূর অগ্রসর হয়নি। বিকাশের প্রকাশক ব্রাহ্ম মিশন প্রেসের কে, সি, দত্ত বিকাশের ভূমিকায় লিখেছেন,

"নানা কারণে গ্রন্থকার এই কবিতাগুলি প্রকাশ না করাই স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লেখকের অনুমত্যনুসারে এই পুস্তকখানি সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম।"

কি কারণে কবি এগুলি প্রকাশে আগ্রহ অনুভব করেননি, তা আজ আর জানবার কোনও উপায়ই নেই। তবে এই সময় থেকে আজ প্রায় আশি বৎসর কাল অতীত হয়েছে। বিংশ শতকের শেষার্দ্ধে এসে আজ যখন পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন মনে হয় যে যোগীন্দ্রনাথ যে বয়স্কদের লেখকদের দলের ভীড় না বাড়িয়ে শিশুসাহিত্যরূপ সাহিত্যের অবহেলিত শাখাটির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার মধ্যে বিধির নির্দ্দেশ ছিল। বয়স্কদের দিকে দৃষ্টিপাত করবার, তাদের সুখদুঃখ, ব্যথাবেদনা, হাসি-অশ্রুকে ভাষা দেবার জন্য অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু যাদের কচি মনের আশ মিটিয়ে গল্প, ছড়া, কবিতা, ধাঁধা তিনি রচনা ও অজস্র ছবি সহ প্রকাশ করে গেছেন, তাদের কথা ভাববার অবকাশ সেদিন কজনেরই বা ছিল ? সেদিনের বয়স্করা শিশুকে শুধু অসম্পূর্ণ মানুষ বলেই জানতেন আর লগুড়াঘাতকেই তাদের সম্পূর্ণ মানুষ করে তোলবার একমাত্র পন্থা বলে ধরে নিয়েছিলেন। সেই যুগে যোগীন্দ্রনাথ এলেন তাঁর নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, শিশুর মনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে, তার জগতের আলোছায়ার মায়াপুরীতে প্রবেশ

করে, তাঁর অমৃতময় লেখনীর জাদুদণ্ডের স্পর্শে এক নূতন রাজ্যের দ্বার খুলে দিলেন। তারপর প্রকাশিত হ'ল তাঁর প্রথম শিশুপাঠ্য পুস্তক "হাসি ও খেলা"। পুস্তকটি একটি সঙ্কলন। তার মধ্যে অধিকাংশই যোগীন্দ্রনাথের নিজের রচনা হলেও অন্যান্য শিশু-সাহিত্যিকের অনেক রচনা পুস্তকটিতে সন্নিবেশিত করে তিনি গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। "হাসি ও খেলা"তে তাঁর নিজের রচনার মধ্যে "চিঠিপত্র" নামে একটি মিষ্টি ছড়া পাই। ছড়াটির বিষয় হ'ল বাপ ও মেয়ের মান অভিমান। কন্যা লিখছেন,

"বাবা, যেদিন তুমি বিদেশ যাও,
একটি চুমো দিয়ে যাও,
আজ দিলে না কেন?
সত্যি বাবা, তোমার মত,
কোথাও আমি দেখিনি ত,
দুষ্ট বাবা হেন?"

বাপের উত্তরটিও সমান মিষ্টি,

"মা, তখন তুমি ঘুমিয়েছিলে,
জাগো পাছে চুমো দিলে,
কাঁদো পাছে বসে;
তাই চুমিতে পারিনি মা,
লক্ষ্মী মিনু, কর ক্ষমা,
সামান্য এ দোষে।"

ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে তাঁর একটিও সন্তানের যখন জন্ম হয়নি, তখন তিনি এই শিশু মনোহর কবিতাটি লেখবার প্রেরণা পেলেন কোথায়? অবশ্য নিজের সন্তান না থাকলেও তখন তাঁদের বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে শিশুর অভাব ছিল না। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র স্বর্গীয় ডাক্তার জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকার একবার আমাকে বলেছিলেন, ছোটকাকা যখনই যা লিখতেন, আমাকে একবার পড়ে শুনিয়ে দেখে নিতেন আমার কেমন লাগছে।" কিন্তু শুধু কি তাতেই অমন রচনা সম্ভব ছিল? বোধহয় তা নয়। যোগীন্দ্রনাথের রচনা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছিল এবং শতধারে স্ফূর্ত্ত ছিল, তার কারণ তিনি শুধু শিশুপ্রেমিক ছিলেন না, মনে প্রাণে তিনিও একটি শিশু ছিলেন।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রমহাশয় তাঁর পুস্তকের ("শতাব্দীর শিশুসাহিত্য") ভূমিকায় লিখেছেন, "অবশেষে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিরোধানের পর বাংলার শিশুসাহিত্যে নবযুগোদয় হয়। পত্রিকাগ্রন্থে তার তরুণালোক প্রতিভাত হতে থাকে। এই কর্ম্মে যিনি পথিকৃৎ তিনি পাঠ্যপুস্তকের নিগড়ের বাইরে শিশু-সাহিত্যের ধারা বইয়ে দিলেও, সাময়িক পত্রিকাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেন! যে গ্রন্থ-সাহায্যে মহৎ কর্ম্মটি সাধিত হয়, সে গ্রন্থ ছিল নানাজনের বিবিধবিষয়ক রচনাসমৃদ্ধ। "হাসি ও খেলা" নামক এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি শিশুমহলে সাহিত্যরস পরিবেশন ও আনন্দদান করে।......শিশু-সাহিত্যিক শব্দটির ব্যবহারেও সাহিত্যিকের প্রতি যথোচিত মর্য্যাদার অভাব ও ব্যঙ্গ প্রকাশ পায়, যদিও বহু মহাজন অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এই সাহিত্য রচনা করে গেছেন।" খগেনবাবু তাঁর শ্রদ্ধা জানাবার জন্যই "নিষ্ঠা" শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। তবু মনে হয়, শুধু নিষ্ঠায়ই কি হয়?

"যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে, দুটি চোখের কিরণ ফেলে
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।"

বোধহয় "হাসি ও খেলা" বইটিকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে শিশু ও শিশুর অভিভাবক মহলে গৃহীত হতে দেখেই দাদামশাই (যোগীন্দ্রনাথ) অন্যান্য শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এই সমাদরের কারণও ছিল। শ্রীসুনির্ম্মল বসু লিখেছেন,

"শিশু সাহিত্যের উষর ক্ষেত্র আজকাল সরস শস্যশ্যামল হয়ে উঠেছে। ....কিন্তু আমাদের শৈশব কালের প্রথম অংশটা পার হতে হয়েছে অনুর্ব্বর মরুভূমির উপর দিয়ে। দুই একটি তাল খেজুরের গাছ যা ছিল, তার ছায়াই তখন আমাদের ছিল পরম তৃপ্তিদায়ক, চরম আনন্দদায়ক। ঠিক এই রকম সময়ে যোগীন্দ্রনাথ এলেন ভগীরথের মত শঙ্খ বাজিয়ে মরুর বুক চিরে তিনি বহালেন নব-গঙ্গার ধারা।

অসহ আনন্দে অধীর শিশুর দল দুই হাতে সেই ধারা পান করতে লাগল অঞ্জলি পুরে' পুরে'। শিশুর অভিভাবকেরা দুই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন এই যুগ প্রবর্ত্তক মানুষটিকে। সমগ্র বাংলাদেশ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল এই অলোকসামান্য প্রতিভার দিকে!

ঘরে ঘরে 'হাসিখুসি'র হল্লা উঠল, 'হাসিরাশি'র হররায় দিক্‌দিগন্ত মুখরিত হল, 'রাঙাছবি'র জেল্লায় রামধনুর রং ঠিক্‌রে পড়তে লাগল দিকে দিকে, 'খেলার সাথী'র দেখা পেয়ে ছিচকাঁদুনের মুখেও হাসির বন্যা বয়ে গেল, "লঙ্কাকাণ্ড" "কুরুক্ষেত্র" নিয়ে ঘরে ঘরে শিশুদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বেধে গেল। ছড়ায়, গল্পে, গানে, ছন্দে, ছবিতে—সারা বাংলাদেশে এক নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হলো। ছোটরা ভাবলে—'ধন্য আমরা'—বড়রা ভাবলে—'হায়রে,—আবার কেন ছোট হয়ে গেলাম না'।

আমি অবশ্য দাদামশাইয়ের রচিত সব পুস্তকের প্রথম প্রকাশের তারিখ সংগ্রহ করতে পারি নি। যতদূর জানি, ১৮৯৩ সনে হাসিখুশি, ছবি ও গল্প এবং ১৮৯৬ সনে রাঙাছবি প্রকাশিত হয়, ও ১৮৯৮ সনে প্রকাশিত হয় 'খেলার সাথী'। হাসিখুসি—দ্বিতীয় ভাগের প্রথম প্রকাশের তারিখ জানি না। অনেকদিন পরে প্রকাশিত একটি বইয়ের প্রথম প্রকাশের তারিখ সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেটি হল "ছড়া ও পড়া"—১৯২১ সনে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর আগে ও পরে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থমালায় দেখছি আষাঢ়ে স্বপ্ন, খেলার গান, ছড়া ও ছবি, ছবির বই, নূতন ছবি, মজার গল্প, হাসিরাশি, হাসির গল্প, হিজিবিজি ইত্যাদি।

একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, গিরিডির নির্জন পরিবেশে দাদামশায় লিখতেন। ধারণাটি একেবারেই ভুল। শুনেছি, গিরিডিতে বাসকালে তিনি কোন বই-ই লেখেননি। অবশ্য প্রচলিত পুস্তক পুনর্মুদ্রণের সময় প্রুফ দেখার কাজ এখানেও করতেন বোধ হয়। তবে গিরিডিতে তাঁর অধিকাংশ সময়ই কাটত পুকুরে, বাগানে, জমিজমা, বাড়ী নিয়ে। কলকাতায় আসতেন প্রয়োজনের তাগিদে। আবার কর্মের অবকাশে যখনই সময় পেতেন, গিরিডিতে চলে যেতেন।

১৯১৩ সনে উশ্রী নদীর ওপারে চাষবাসের জন্য তিনি প্রায় সাড়ে চারশ বিঘে জমি কিনলেন। এই সময় তাঁর বন্ধু ৺সুবোধ চন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় ঠাট্টা করে তাঁকে Duke af Burgundy (বারগণ্ডা নামের বিকৃত উচ্চারণ) বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন কিন্তু সত্য কথা বলতে, তিনি ঠিক জমিদারী করবার জন্য জমি কেনেন নি। যে জমি তিনি কেনেন, তার অনেকটাই পতিত জমি ছিল! ওদেশে তাকে "টাঁড়" বলে। এই জমিতে

আল বাঁধানর কাজে যে প্রতি সপ্তাহে তিনি কত ব্যয় করেছেন, তার ঠিক নেই। এই আল অর্থাৎ জমির ধারে উঁচু পাড় তৈরী না করালে সেই জমিতে জল দাঁড়াত না, ধানও হত না। এ ছাড়া আট বিঘে জমির 'বাঁধ' ছিল ওপারে।. "বাঁধ" শব্দটির অর্থ একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এমন নাবাল জমি হয়, যার তিনদিকে স্বভাবতঃই উঁচু পাড় আছে বাকী একদিকে উঁচু পাড় তৈরী করলেই, সেই জমিতে জল দাঁড়াতে পারে। সেই জমিকে তখন "বাঁধ" বলে। দাদামশাই এই রকম বাঁধ তৈরী করিয়ে মাছের চাষ করতেন। ওপারে চাষের জমির বন্দোবস্ত হবার পর তাঁর বহু প্রজা হয়। এদের কাছ থেকে 'খাজনা' আদায় করবার ব্যাপারে কোনদিনই তিনি খুব বেশী কড়াকড়ি করতেন না। বরং ঐ জমিতে আল বাঁধা. বাঁধ তৈরী, কুয়ো খোঁড়ার কাজ, ইত্যাদি করে প্রজারাই সপ্তাহান্তে তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে যেত। বলা প্রয়োজন গিরিডির নিকটে 'বেনিয়াডি' অঞ্চলে কয়লার খনি থাকাতে এক বাড়ী ভাড়া ছাড়া আর সব টাকা পয়সার দেনা পাওনাই সপ্তাহান্তে হ'ত। এইরূপে প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁর নিকট হতে মজুরেরা একশো, সওয়া শো টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে যেত! ওপারে একটি কুয়ো তৈরী করাতে তখনকার দিনেও সবশুদ্ধ তিন চার হাজার টাকা তাঁর খরচ হয়েছিল।

ইতিমধ্যে তাঁর ছ'টি সন্তানের জন্ম হয়েছে। ১৯০৯ সনের এক ডায়েরীতে তিনি অতি যত্নে তাঁর চার পুত্র ও দুই কন্যার জন্মের তারিখ এবং সময় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তার মধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ আমাদের বড় মামা শচীন্দ্রনাথ ভিন্ন দাদামশায়ের আর সকল সন্তানেরই অর্থাৎ মেজমামা সুধীন্দ্রনাথ, আমাদের মা বীণা দেবী, সেজমামা সত্যেন্দ্রনাথ, মাসীমা মাধুরী দেবী (যাঁর ডাক নাম ছিল ইলা) এবং ছোট মামা শমীন্দ্রনাথ সকলেরই জন্ম হয়েছিল দাদামশায়ের মেজদাদা স্যার নীলরতনের ৬১ নং হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে।

সকল মাতাপিতাই পুত্রকন্যাকে ভালবাসেন কিন্তু দাদামশায়ের বাৎসল্যের মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। জীবনে তিনি কখনও পুত্রকন্যাদের শাসন করেন নি অথচ তাদের মঙ্গলচিন্তা অনুক্ষণ তাঁর মনে ছিল। শুনেছি তাঁর দুটি কন্যাসন্তান অতি শৈশবেই মারা যায়, একটি তাঁর প্রথম সন্তান

এবং আর একটি তৃতীয় অর্থাৎ আমার বড়মামা ও মেজমামার মধ্যে ছিল। ওই শিশু মৃত্যুও তাঁর প্রাণে এমন আঘাত করেছিল যে শুনেছি আমার মার জন্মের পর তিনি নাকি অনেকদিন তাঁকে কোলে নিতেন না। কারণ দাদামশায়ের ধারণা ছিল যে, তাঁর প্রথম দুই কন্যার মত এ কন্যাটিও স্বল্পায়ু হবে। তাই তিনি মায়া বাড়াতে চান নি। পরে অবশ্য এই কন্যা তাঁর নয়নের মণি হন। আমাদের জ্ঞান হয়েও আমরা এর বহু নিদর্শন পেয়েছি কিন্তু তাঁর কন্যাস্নেহের সবথেকে পাকা সাক্ষ্য বোধহয় রয়েছে "ছড়া ও ছবি" র একটি ছড়ায়। ছড়াটি হল

"পরীর রাণী"

ঝুণ্টু আমার পরীর রাণী
পরীর মতন শরীর খানি
চাঁদের মত মুখ ;
রাশি রাশি ফুলের হাসি
ক'রতেছে টুকটুক্ !

কচি মুখের কোমল সুরে,
সারা অঙ্গ শীতল করে,
নেচে উঠে বুক ;
ঝুণ্টু আমার পরীর রাণী
চাঁদের মত মুখ !

বলা বাহুল্য, মার ডাক নাম "ঝুনু"র আদরের রূপান্তরই হল ঝুণ্টু। তবে শুধু তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যাকেই নয়, সব পুত্রকন্যাকেই তিনি অসাধারণ রকম স্নেহ করতেন। সাধারণতঃ জননীর স্নেহই বাক্যে ও আচরণে প্রকাশ পায়—পিতার স্নেহধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত হৃদয়ের গভীরে লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম সকলেই লক্ষ্য করতেন। শুনেছি মা, মাসী ও মামারা যখন ছোট, দাদামশায় বাড়ীর বাইরে যাবার সময় প্রত্যেকের নিকট জনে জনে বিদায় নিয়ে তবে যেতেন এবং রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখতেন যে উপরের বারান্দা থেকে সন্তানেরা কেউ ঝুঁকে তাঁকে দেখছে কিনা। ঝুঁকতে দেখলে আবার ফিরে এসে তাকে বারণ করতেন। জীবনের শেষ দিকে যখন তিনি অথর্ব্ব অবস্থায় ওয়াই, এম, সি,-এর তিন তলার ফ্ল্যাটে জীবনের শেষ দিনের প্রতীক্ষা করছেন, তখনও তাঁর প্রত্যেকটি পুত্র বাড়ী ফিরেছে কিনা সে খোঁজ নিয়ে তবে তিনি ঘুমোতেন।

তাঁর অনুজা ক্ষীরোদবাসিনী মিত্রের স্বামীর যখন মৃত্যু হয়, তখন

থেকেই এই ভগিনীর পুত্র কন্যারা তাঁদের ছোটমামা যোগীন্দ্রনাথের একটু আদরের পাত্রপাত্রী হয়ে উঠলেন। মার এই পিশেমশাই দার্জ্জিলিঙে কোন চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। একবার তিস্তা নদীতে ভীষণ বন্যার সময় কারও নিষেধ না শুনে কুলীদের পারিশ্রমিক দেবার জন্য তিনি রওনা হলেন ; আর ফিরে এলেন না। এই নিখোঁজ মানুষের সন্ধান করবার জন্য যোগীন্দ্রনাথ এক বন্ধুর সঙ্গে যাত্রা করেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁর বস্ত্রাদির সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু দেহ নিখোঁজই থাকে। অনেকের ধারণা তিনি বন্যার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে তিস্তা নদীর ধারে কোন গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন কিন্তু গ্রামের যে লোকের গৃহে তিনি আশ্রয় নেন, সে অর্থলোভে তাঁকে হত্যা করে। যাহোক এটা অনুমান মাত্র। মোট কথা, আদরের ভগিনীটির বৈধব্য দাদামশায়কে বড়ই দুঃখ দিয়েছিল। এরপর এই ভগিনীরই দ্বিতীয় পুত্রও জলমগ্ন হয়ে মারা যান। ক্ষীরোদবাসিনী দেবীর (তাঁকে আমরা 'গিরিডির দিদিমা' বলে ডাকতাম) বাকী জীবনের অধিকাংশই সপরিবারে তাঁর ছোটদাদার সঙ্গে একগৃহে কাটান।

ঠিক কবে জানি না, ওঁরা ৬১ নম্বর হ্যারিসন রোডের বাড়ী ছেড়ে হ্যারিসন রোডেই একটি গলির মধ্যে ৬৫।৩ নম্বরের বাড়ীতে চলে যান। এই গলির মুখেই ৺হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের বাড়ী ছিল। আমাদের শৈশবে এই বাড়ীর ছেলেমেয়েদের আমাদের মামার বাড়ীর ছাদে এসে খেলা করতে দেখেছি। আমি তখন নিতান্তই শিশু—খেলার খেলুড়ী হবার যোগ্য বলেই কেউ আমাকে মনে করত না। তাই ছাদে উঠে বড় ছেলেমেয়েদের খেলা এবং ছোটমামার ঘুঁড়ি ওড়ান দেখতাম। ৭নং সর্ট ষ্ট্রীটে স্যার নীলরতনের প্রাসাদোপম গৃহটি কবে তৈরী বা কেনা হয়েছিল জানি না। তবে ৬৫।৩ হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে যোগীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদবাসিনী এবং যতদূর সম্ভব যোগীন্দ্রনাথের অগ্রজ উপেন্দ্রনাথ—এঁরা সকলে চলে আসবার পরও স্যার নীলরতন ৬১ নম্বরের বাড়ীতে থেকে যান এবং ঐ বাড়ীতেই আমার মার বিবাহ হয় আর আমরা প্রথম তিন ভগিনী জন্মগ্রহণ করি ৬৫।৩ নম্বরে। জ্ঞান হয়ে অবধি মামার বাড়ী বলতে আমরা এই বাড়ীটিকেই জানতাম। তবে আমরা দাদামশায়ের পরিবার ভিন্ন শুধু মার বড় পিসীমা ক্ষীরোদবাসিনী-

দেবীর পরিবারকেই এই বাড়ীতে দেখেছি। দাদামশায়ের অন্য সব ভ্রাতা ভগিনী তখন ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বাস করতেন। তবে সামান্য কোনও উপলক্ষ্য হলেই সকলে একত্র হয়ে কাজ করতেন। সেইজন্য কারো জন্মদিনের উৎসব হলেও বৃহৎ পরিবার একত্র হবার ফলে বিবাহের উৎসবের মত মনে হত।

দাদামশায়কে হ্যারিসন রোডের এই গৃহে যখন দেখি, তখন আমি নিতান্তই শিশু। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে তাঁকে যেন এ গৃহ থেকে লোকের কাঁধে ভর দিয়ে গোলদীঘির ধারে বেড়াতে যেতে দেখেছি, তাঁর বইয়ের ছবি আঁকাবার জন্য আর্টিষ্টকে ডাকিয়ে নির্দ্দেশ দিতে দেখেছি আর দেখেছি বন্ধুবান্ধব এলে খুব জোরে জোরে গল্প করতে ও হাসতে। তবে এ সব স্মৃতিই অস্পষ্ট। তার থেকে অনেক বেশী স্পষ্ট মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়ে গিরিডিবাসের স্মৃতি। অবশ্য গোলকুঠির সুন্দর ফুলবাগান আমরা দেখি নি। আমাদের জন্মের পূর্ব্বেই সে ফুলবাগানের অধিকাংশ গাছ কেটে দেওয়া হয়েছে। বরঞ্চ ফলের বাগান আমরা কিছু কিছু দেখেছি। গোলকুঠির বিস্তৃত মাঠে যেখানে পূর্ব্বে ফুলবাগান ছিল, সেখানে কাঠের তক্তাওয়ালা লোহার চেনের দোলনায় দোল খেয়েছি, মাঠে ছুটোছুটি করে খেলে 'মাইকা' ছড়ান জমিতে পড়ে গিয়ে হাঁটু ছেঁচে ফেলে মার কাছে বকুনি খেয়েছি, আর খেয়েছি দাত্বর বাগানের মিষ্টি মিষ্টি আম। এই আম যে কত রকম ছিল, তার সবগুলির নামও জানি না। আমাদের কাছে লেখা চিঠিতে বার বার একটি "লতানে" গাছের ছোট ছোট মিষ্টি আম পাঠানর কথা উল্লেখ করেছেন। মনে পড়ে, গিরিডি গেলেই দেখতে পেতাম যে একটি ছোট ঘরের মেঝেতে আম ছড়ান আছে। ঠিক মনে নেই, সেগুলিকে বোধহয় একটু কাঁচা থাকতে পেড়ে পাতা দিয়ে ঢেকে রেখে পাকান হত। প্রতিদিন একবার করে ঐ ঘরে বসে দাদামশায় (তখন তিনি নানা রোগাক্রান্ত এবং প্রায় অথর্ব্ব) আম বাছতেন। যখন গিরিডিতে থাকতাম, আম বাছা হলে সব চেয়ে ভাল আমগুলি অবশ্যই আমরা তাঁর নাতি-নাতনীরা পেতাম। বাড়ীর লোক ছাড়াও তাঁর গিরিডির বন্ধুবান্ধব, পরিচিত, এমন কি, স্বল্প পরিচিত লোকের বাড়ীও এই আম উপহার যেত। তাঁর সন্তানদের মধ্যে একমাত্র আমার মা বৎসরের অধিকাংশ সময় দূরে অর্থাৎ বাবার চাকুরীস্থলে থাকতেন বলে, যখন যেখানে থাকতেন (অর্থাৎ আমরা থাকতাম) আম, লিচু ইত্যাদির

পার্শেল নিয়মিত তাঁর কাছে যেত। আর যেত তাঁর চিঠি, প্রতিদিন একটি করে, খবরের কাগজের মত নিয়মিত কিন্তু খবরের কাগজের মত নীরস নয়—তাঁর বাগানের রসালো আমের মতই সরস।

তাঁর কাছ থেকে পাওয়া বহু চিঠিই আমার মা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। অবশ্য তার মধ্যে অনেকগুলিই আমাদের অর্থাৎ তাঁর নাতনীদের উদ্দেশ্যে লেখা। এইসব চিঠির মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশীতে "আম পাঠালাম" এই কথাটি দেখছি। যখন গিরিডির গাছের আম ফুরোত, বা তিনি কলকাতায় থাকতেন, তখন আম কিনেও পাঠাতেন। এইরকমই এক চিঠিতে মাদ্রাজী আম "নীলাম্বরী"র নাম দেখছি। অবশ্য এ হ'ল কদাচিৎ। তাঁর গাছের আমই তিনি অধিকাংশ সময় পাঠাতেন। তিনি যে কিভাবে আমের যত্ন করতেন, তা তাঁর ২৬।৫।৩৩ সনের একটি চিঠি পড়লে বোঝা যায়। চিঠিখানি আমাদের চারবোনকে একসঙ্গে লেখা। তাতে লিখেছেন, "আজ তোমাদের জন্যে ৩৬টা বোম্বাই আম পাঠালাম। বেশ পুরু করে বালি বিছিয়ে আমের বোঁটার দিক মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সেই বালির মধ্যে ডুবিয়ে একটু ফাঁক ফাঁক করে সাজিয়ে রেখো আর তার উপর খড় বা শুকনো আমের পাতা চাপা দিও। ঘরটা একটু গরম হয় যেন। এইভাবে আমগুলি বেশ ভাল করে পাকিয়ে খেয়ো। ....বালির অভাবে খড় পেতে শুকনো পাতা চাপা দিও।"

অনেক পরে দাদামশায়ের মৃত্যুর পর বড় হয়ে বহরমপুর গিয়েছিলাম অর্থাৎ বাবা সেখানে বদলী হয়েছিলেন। সেখানকার বিখ্যাত ধনী মাড়োয়ারীদের গৃহে আম্রভোজে (mango party) নিমন্ত্রিত হয়ে দেখেছি দেড়শ রকম আম পরিবেশনের ব্যবস্থা। সব অবশ্য চাখবার সৌভাগ্য হয়নি কারণ পাকস্থলীতে স্থানাভাব। তবে শুনেছি সেই সব আম যেগুলির নাম জর্দ্দালু, কিষেণভোগ, গোপালভোগ, রাণীপ্সন্, বিবিগসন্ ইত্যাদি সেগুলির তদারকের জন্য আমের মালিকরা বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করতেন—তাঁদের কাজ ছিল প্রত্যেকটি আম সময় মত গাছ থেকে পাড়ান এবং পাকামাত্র—তা সে রাত বারটারই হোক আর একটাতেই হোক—মালিককে খবর দেওয়া। অর্থাৎ ঠিক সেই সময়টিতে সেই আমটি খেলেই তার বিশেষ স্বাদটি পাওয়া যাবে। আমার মনে হয় এই পেশাদার বিশেষজ্ঞদের চেয়ে আমার দাদামশাই আম সম্বন্ধে কিছু কম জানতেন না। তবে যে সময়ের কথা বলছি, তখন বোধহয় আমের

স্বাদগ্রহণটা তাঁর পরস্মৈপদী ছিল। তাঁকে কখনও আম খেতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যতদূর সম্ভব দুরারোগ্য "ডায়াবেটিস্" রোগে তিনি তখন আক্রান্ত বলে মিষ্টি আম খাওয়া তাঁর নিষেধ ছিল। কিন্তু তাঁর জন্য তাঁর আমের যত্নের ক্রটি হত না। বরঞ্চ অন্যকে বিতরণ করে তিনি যে অনাবিল আনন্দ পেতেন, নিজে খেয়ে তত আনন্দ পেতেন কিনা সন্দেহ।

আমার দাদামশায়ের মত এমন সন্তানস্নেহ, এমন বন্ধুপ্রীতি আর এমন মজলিশি স্বভাব খুব কমই দেখেছি। তাঁর বন্ধুদের সকলকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে অনেকেরই নাম শুনেছি। যথা:—কুন্তলীন, দেলখোস ইত্যাদি প্রস্তুতকারক সুবিখ্যাত হেমেন্দ্রমোহন বসু (পরে ইনি যোগীন্দ্রনাথের বৈবাহিক হ'ন), তাঁর সহপাঠী (এবং সম্ভবতঃ Indian Messenger-এর এককালীন সম্পাদক) প্রতুলচন্দ্র সোম, ডি, চৌধুরী নামক sports-এর দোকানের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সিটি স্কুলের শিক্ষক বামনদাস মজুমদার, বিখ্যাত কবি এবং শিশুসাহিত্যিক নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, জীবজন্তু প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি। অবশ্য এ ভাবে তালিকা প্রস্তুত করে তাঁর বন্ধুদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। কারণ তিনি ছিলেন "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এবং তাঁর বন্ধুর সীমাসংখ্যা ছিল না। তাঁর মাছধরার সঙ্গী ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তিন ভ্রাতা, অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়, অধ্যাপক মুক্তিদারঞ্জন রায় এবং "রবিনহুড", "ইলিয়ড", "অডিসি", "পুরাণের গল্প" ইত্যাদি প্রণেতা কুলদারঞ্জন রায়। এছাড়াও শুনেছি সখারাম গণেশ দেউস্কর নামক মহারাস্ট্র দেশীয় বাংলা গ্রন্থলেখকের নাম। এঁর রচিত "দেশের কথা" বইটি বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেন। ইনি যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কলিত স্বদেশী সঙ্গীতের সংগ্রহ "বন্দেমাতরম্"এর ভূমিকাও লেখেন।

দাদামশাইয়ের আর এক বন্ধু ছিলেন বসুমতী সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। এঁর বিষয়ে একটি মজার গল্প শুনেছি। প্রত্যেক বৎসর পূজার সময় দাদামশায় একটি করে পুস্তক প্রকাশ করতেন। সে সময় এখনকার মত পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের রীতি ছিল না। সুতরাং মনে হয় যে নানা পত্রিকার পূজাবার্ষিকী বা শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের যে রীতি আজ দেখা যায়, তার মূলেও তাঁর এই প্রচেষ্টা ছিল। এইভাবে ক্রমান্বয়ে তাঁর

টম্‌কাকার কুটীর, গালিভারস্‌ ট্র্যাভেল্‌স্‌, রবিন্‌সন্‌ ক্রুশো, ডন্‌ কুইকসোট্‌ (সবই অবশ্য অনুবাদ কিন্তু ছোটদের জন্য সংক্ষেপে এবং সরল ভাষায় রচিত) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এরপর কিছুদিন গিরিডির জমিজমা ইত্যাদি নিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকাতে নূতন কোনও পুস্তক প্রকাশ করতে পারেন নি। এই সময় তাঁদের কলকাতার হ্যারিসন রোডের বাড়ীর নিকটেই বেনেটোলা লেনে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ থাকতেন। এমন কি, এক বাড়ীর কথাবার্ত্তা অন্য বাড়ীতে বসে শোনা যেত। আমাদের মাতামহীর নাম গিরিবালা। তাঁর এই নামটিতেই তিনি শ্বশুরবাড়ীতে পরিচিত ছিলেন। হয়তো বাল্যকাল সিমলায় কাটিয়েছেন বলে গিরিনন্দিনী হিসাবেই তাঁর ওই নাম ছিল। যে কারণেই হোক "গিরিবালা" থেকে সংক্ষেপ করে "গিরি" বলেই তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠরা তাঁকে ডাকতেন। এ বিষয়ে দাদামশায়ের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য্য মিল ছিল। দাদামশায়ের আসল নাম ছিল কেদারনাথ। তাঁর ডাক নাম "যোগী"ই পরে রূপান্তরিত হয়ে যোগীন্দ্রনাথ হয় এবং ঐ নামই তাঁর পোষাকী নামে পরিণত হয়। দিদিমার বেলাও দেখি, তার স্বর্ণলতা নাম অনেকে জানতেনই না। যা হোক দাদামশাই প্রায়ই নানা কাজে 'গিরি', 'গিরি' বলে দিদিমাকে ডাকতেন। হেমেন্দ্রবাবু নিজের বাড়ী থেকে এই ডাক শুনতে পেতেন। এরপর এক বৎসর পূজোর আগে দাদামশায়ের কি একখানি বই প্রকাশিত হল। হেমেন্দ্রবাবু সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখলেন :—

"বছর বছর বই বেরোত
পড়ত না তো ফাঁক,
এখন কেবল যোগীনবাবুর
'গিরি', 'গিরি' ডাক।"

ছড়াটি দ্ব্যর্থবোধক। গিরি অর্থে গিরিডিও ধরা যেতে পারে, আবার দিদিমার নামও বোঝা যেতে পারে।

সেকালে এমন বহু রসিক লোক ছিলেন এবং তাঁদের অনেকের সঙ্গেই দাদামশাইয়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই প্রসঙ্গে হ্যারিসন রোডের তদানীন্তন শর্ম্মা কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার গিরিশ শর্ম্মার কথা বলা যেতে পারে। শুনেছি এঁর সঙ্গে সরকার পরিবারের সকলেরই খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। ৬১ নং হ্যারিসন রোডে যখন দাদামশায়রা থাকতেন, গিরিশবাবুর বাড়ী নিকটেই ছিল। এই

দুই রসিক পুরুষের মিলনে যে রসের সৃষ্টি হত, সে কাহিনী সত্যই উপভোগ্য। সরকার পরিবারের সঙ্গে গিরিশবাবুর ঘনিষ্ঠতা তো ছিল; তা ছাড়াও সেকালে কোন একান্নবর্তী পরিবারে নিমন্ত্রণাদি ব্যাপারে পাঁচজনকে নিয়ে আনন্দ করবার রীতি ছিল। গৃহে কোন ভোজের ব্যাপার থাকলে গিরিশবাবু অবশ্যই নিমন্ত্রণ পেতেন। একবার ভ্রমক্রমে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। গিরিশবাবু খবর পেয়েছিলেন যে সরকার বাড়ীতে ভোজ আছে। তিনি করলেন কি—বাড়ী থেকে রান্না করা খাবার সঙ্গে করে এনে নিমন্ত্রিতের সারিতে একপাশে বসলেন এবং যখন পরিবেশন আরম্ভ হয়েছে, তখন নিজের আনা খাবার পাতে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। বলাবাহুল্য, এরপর প্রবল হাস্যধ্বনির মধ্যে খাওয়া আরম্ভ হল এবং অনুমান করা কঠিন নয় যে গিরিশবাবু শেষ পর্য্যন্ত সরকার বাড়ীতে রান্না খাবারই খেলেন। তিনি তো আর ওঁদের ওপর অভিমান করেননি। শুধু ওঁদের ভুলের কথা স্মরণ করিয়ে একটু লজ্জা দিতে চেয়েছিলেন।

গিরিশবাবু যে কি রকম রসিক ছিলেন, তা এই গল্প থেকেই বোঝা যায় এবং রসিক লোকের স্বভাব অনুসারে শিশু এবং বালক বালিকাদের চিত্ত বিনোদন করতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি নাকি তিনটে বল একসঙ্গে লুফে, নাক থেকে সুতো বার করে এবং আরও নানারকম ম্যাজিক দেখিয়ে তাদের আমোদ দিতেন। এই গিরিশবাবুকে জব্দ করতে গিয়ে দাদামশাই নিজেই একবার জব্দ হয়েছিলেন। দাদামশাই একবার খবর পেলেন যে গিরিশবাবু বাজার থেকে মাংস কিনে এনেছেন। গিরিশবাবুর অজ্ঞাতে তিনি পাঁঠার লেজটি তুলে এনে বাড়ীতে রান্না করতে দিলেন। অবশ্য এর মধ্যে মাংস খাবার ইচ্ছা ততটা ছিল না, যতটা ছিল বন্ধুর সঙ্গে কৌতুক। কারণ শুনেছি সে সময় একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারে মাংস রান্না করলে সুবিধে হত বলে রোজ রাত্রেই মাংস খাওয়া হত। যা হোক, গিরিশবাবুর বাড়ীর থেকে আনা মাংস রান্না হচ্ছে, তিনি ইতিমধ্যে খবর পেয়ে গেছেন যে মাংস চুরি (?) হয়ে গেছে এবং হেরম্ব মৈত্রের বাড়ীর একটি ছেলেকে পাঠিয়ে খবরও নিচ্ছেন যে মাংস নামতে কত দেরী। অন্য বাড়ীর ছেলেকে পাঠান অবশ্য উদ্দেশ্যমূলক। তাকে দেখলে তো আর "যোগীনবাবু" আন্দাজ করতে পারবেন না যে, সে কি উদ্দেশ্যে এসেছে। তারপরের ব্যাপার সংক্ষিপ্ত। মাংস রান্না হয়ে গেলে গিরিশবাবু এসে

হাঁড়িশুদ্ধ নিয়ে চলে গেলেন আর সরকার বাড়ীর সকলে সকৌতুকে তাকিয়ে রইলেন!

দাদামশাই এবং তাঁর বন্ধুদের বিষয় আর একটি মজার গল্প শুনেছি। গল্পটি সিটি স্কুলের শিক্ষক দাদামশাইয়ের বন্ধু ৺বামনদাস মজুমদারের নিকট শ্রীজীবনময় রায় শোনেন এবং তাঁর নিকটে আমি শুনেছি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ছিলেন বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া। খগেনবাবু, বামনদাসবাবু, দাদামশাই, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্রনাথ বসু এবং প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় (জংলীবাবু) প্রভৃতির মধ্যে একবার তর্ক হয় যে, বৈষ্ণবেরা যখন কীর্ত্তন করে, লোকে তাদের কথায়, না, সুরে, কিসে মুগ্ধ হয়? খগেনবাবু বল্লেন, "সুরই আসল। কথায় কি আসে যায়?" এর পর তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য তিনি এক কীর্ত্তনের দল বার করলেন। এই দলে দাদামশাইও ছিলেন। দলটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ থেকে "অচল, অধম" ইত্যাদি সুর করে গেয়ে গেয়ে কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ভিক্ষা চাইতে লাগলেন। বৈষ্ণবদের অনুকরণ হচ্ছিল তো? তাই ভিক্ষা। লোকে কীর্ত্তনের সুরে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়ে কাছে এসে কথা শুনে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল কিন্তু অভিনব কীর্ত্তনীয়াদের ভিক্ষা দিতেও ত্রুটি করল না। এইরূপে নাকি পঁচিশ টাকা বার আনা পয়সা এবং দেড় মণ চাল সংগ্রহ হয়েছিল।

দাদমশাইয়ের জীবনে বন্ধুপ্রীতি এবং হাস্যরসিকতা—এ দুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। অসাধারণ মিশুকে মানুষ ছিলেন, দশজনকে নিয়েই তাঁর জীবন ছিল। তিনি লোককে খাওয়াতে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং প্রায়ই তাঁর গৃহে বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের নিমন্ত্রণ হত। গিরিডিতে বাড়ী, জমিজমা করবার পর যখন সেখানে ব্রাহ্ম কলোনী ভালভাবে প্রতিষ্ঠিতহয়েছে, তখন গোলকুঠির উদ্যানে পূর্নিমা সম্মেলন নামে এক অনুষ্ঠান আরম্ভ হল।

এই সম্মেলনের একটু ইতিহাস আছে। গিরিডিতে বাড়ী করবার পর বাড়ীটিকে এবং তৎসংলগ্ন জমিটিকে সুন্দর করে সাজাবার জন্য দাদামশাই উঠে পড়ে লাগলেন। গোলকুঠির গোল চাতালের সামনে একটি গোল জায়গা ঘিরে পাটাঝাউ গাছ আছে। এই গাছগুলিকে তিনি ভাগলপুরের বামাচরণ

ঘোষ মহাশয়ের কোন আত্মীয়ের নিকট থেকে আনিয়ে ছিলেন। গাছগুলি বোধ হয় কোন ট্রেনে রাত ন'টার সময় এসেছিল। পূর্ব্ব হতেই সেগুলি পোঁতবার জন্য জমিতে গর্ত্ত করা ছিল। রাতে ছোট ছোট টবে গাছগুলি এসে পৌঁছতে যোগীন্দ্রনাথ এতই খুসী হলেন যে সেই রাত্রে বেহারী প্রভৃতি মালিদের সাহায্যে লণ্ঠনের আলোতে সেই গাছ লাগিয়ে ফেললেন। সন্ধ্যাবেলায় যেখানে কিছুই ছিল না, সকালবেলা সেখানে একটি আস্ত বাগান দেখে প্রাতঃভ্রমণকারীরা চমকে উঠলেন। অবশ্য এইভাবে চমকে দেবার উদ্দেশ্যেই রাতারাতি গাছ লাগান হয়েছিল। এই চমকে দেবার ইচ্ছার মধ্যে তাঁর শিশুসুলভ সরলতা প্রকাশ পেলেও আসলে তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে শিল্পী। ঐ পাটাঝাউয়ের গাছগুলির স্থান নির্ব্বাচনই তার এক প্রমাণ—তাছাড়া আটদিকে গোল করে আটটি ও মধ্যস্থলে একটি—এইভাবে নটি গাছ লাগান হয়েছিল—এর থেকেও তাঁর রুচির প্রমাণ পাওয়া যায়।

এর পর বাড়ীর সামনের বাগানটি সাজানর জন্য তিনি উশ্রী প্রপাতের ধার থেকে গাড়ী করে অনেক পাথর আনালেন। বড় বড় সাদা পাথরগুলি বাগানের সীমানায় একটু দূরে দূরে পুঁতে দেওয়া হ'ল। (আমরা জন্মেও এ পাথর দেখেছি এবং খেলতে খেলতে শ্রান্ত হয়ে এই আসনে বসে বিশ্রাম করেছি।) এই রকম কিছু পাথরকে টুকরো টুকরো করে বাগানের চারদিকের সীমানায় ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। লাল সুরকীর রাস্তা, সাদা পাথরের টুকরো এবং সবুজ গাছগুলি মিলিয়ে এক অপূর্ব্ব শোভা হ'ল। কোজাগরী পূর্ণিমার ঠিক আগের দিন এই পাথর বসান শেষ হ'ল। শুনেছি সেটা ছিল ১৯১০ কিংবা ১৯১১ সন। সময়টা সঠিক জানতে পেরেছি কিনা বলতে পারব না। কারণ এ গল্প শুনেছি, তাঁর ভাগিনেয় ডাক্তার অশোক কুমার মিত্রের (আমাদের 'রুণিমামা'র) নিকট কিন্তু তিনি নিজেও তখন বালকমাত্র। সুতরাং সঠিক সাল তারিখ তার মনে আছে কিনা জানি না। যাই হোক পাথর বসানর ব্যাপারটা শেষ হলে চাঁদের আলোয় বাগানের অপূর্ব্ব শোভায় মুগ্ধ হয়ে দাদামশাই ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু (বোধহয় শশীভূষণ বসুই তার মধ্যে প্রধান) ঠিক করলেন যে সেই বাগানে একটা অনুষ্ঠান করতে হবে এবং সেটা হবে পরের দিনই অর্থাৎ কোজাগরী পূর্ণিমার দিন। সঙ্গে সঙ্গে একটা 'নোটিশ' লেখা হ'ল এবং আমার বড় ও মেজ মামা শচীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ

এবং রুণিমামা বাড়ী বাড়ী 'নোটিশ'টিকে ঘোরালেন। এই নোটিশে কি লেখা ছিল জানি না। সেটি সংগ্রহ করতে পারলে একটি স্মরণীয় ব্যাপার লিপিবদ্ধ করতে পারতাম।

যাই হোক্ দর্শক বা শ্রোতা অথবা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা কেউই ব্যাপারটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অনুষ্ঠানও তেমনি হ'ল। শুনেছি একটা ভাঙ্গা শোলার হ্যাটে ফুটো করে তার মধ্যে লাঠি ঢুকিয়ে কি কৌশলে জানি না, একটি একতারা তৈরী হয়েছিল। বোধহয় কুলদাবাবু সেটি বাজিয়েছিলেন। কারা গান গেয়েছিলেন জানি না কিন্তু বেছে বেছে যাঁদের গলায় সুর নেই, সেই রকম লোকেদের দিয়েই গান করান হয়েছিল। গানও হয়েছিল তেমনই। "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"—এইটিকেই সুর করে গাওয়া হয়েছিল। যাহোক, তার জন্য কারো আনন্দের কিছু অভাব হয় নি। এইভাবে আরম্ভ হয়ে পূর্ণিমা সম্মেলন একটি নিয়মিত বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হল এবং গিরিডিতে এর সাফল্য দেখে পরে মধুপুর, দেওঘর ইত্যাদির অধিবাসীরাও এই অনুষ্ঠান করতে আরম্ভ করলেন।

মার কাছে শুনেছি গোলকুঠিতে খোলা ষ্টেজে এই অনুষ্ঠান হত এবং ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকলে এতে অংশ গ্রহণ করতেন। ছোটরা অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে দাদামশায়ের রচিত শিশুনাটক

"আজ সুরেনের জন্মদিনে
মনের মত জিনিষ কিনে
আনবো মোরা ভাই,
চল বাজারেতে যাই।"

গান ও অভিনয় করত।

এছাড়া বড়দের কমিক্ হত, মগামগীর নাচ নামে যুগল নৃত্য হত, অবশ্য যাঁরা নাচতেন, তাঁরা দুজনেই পুরুষ। কুলদাবাবুর ঘুঙুর পায় নাচের কথা মায়ের স্মৃতিতে ছিল আবার সুনির্ম্মল বসুও সে কথা লিখেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ—

"মনে পড়ে প্রতি বৎসর কোজাগরী সন্ধ্যায় যোগীন্দ্রনাথের উদ্যানে পূর্ণিমা সম্মিলনীর কথা। সে অনাবিল আনন্দ যিনি একবার উপভোগ করেছেন, তিনি তা জীবনে ভুলবেন কিনা সন্দেহ।

মনে পড়ে প্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায় মহাশয়ের 'বাজীকরের ছেলে' সেজে সেই অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নৃত্যগীতের কথা। তাঁর অপরূপ সুরের

"আজ পূর্ণিমার সম্মিলন,
যোগীনবাবুর নিমন্ত্রণ"*

এখনো আমার কানে ভাসছে। বাংলা দেশের এমন বিখ্যাত লোক খুব কমই আছেন যাঁরা এই পূর্ণিমা সম্মিলনীতে যোগ না দিয়েছেন এবং আনন্দ উপভোগ না করেছেন।

এই সমস্ত উৎসবের পুরোধা ছিলেন এক সময় যোগীন্দ্রনাথ।"

এই পূর্ণিমা সম্মিলনকে আজকের কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করতে দ্বিধা হয় কারণ কোন সংস্কৃতির ধারক বা বাহক হয়ে এর জন্ম হয়নি। এ ছিল নেহাৎই অকারণ পুলকে কটি রসোচ্ছল প্রাণের মিলনোৎসব।

আমার যখন জ্ঞান হয়েছে, তখন এই রসিকদের সভা আর বসে না, নানারোগে দাদামশাই প্রায় পঙ্গু। তবু তাঁর মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাণের প্রকাশ দেখেছি, তা সাধারণে দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের গীত মনে পড়ে "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া"। বোধহয় এই "আপন হতে বাহির" হতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে বলা সাজত, "যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ, ফুরাবে না আর প্রাণ।"

শুনেছি ১৯২৩ সনের কোন সময় রক্তচাপ বৃদ্ধির ফলে দাদামশাই অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর থেকে তাঁর শরীরের ডানদিক অবশ হয়ে যায় কিন্তু অসাধারণ মানসিক শক্তিবলে শরীরের অক্ষমতাকে অবহেলা করে তিনি উঠে বসলেন। এই অবস্থাতেই আমরা তাঁকে দেখেছি। দিনের বেলা বিছানায় প্রায় থাকতেই পারতেন না। প্রায় সারা দিনই একটি আরামকেদারায় বসে থাকতেন। গিরিডিতে থাকলে মাঝে মাঝে লোকের কাঁধে ভর দিয়ে জমি, বাগান ইত্যাদি তদারক করে বেড়াতেন। তবে বেশীক্ষণ এভাবে

---

* কুলদাবাবু যে গীত গেয়ে নৃত্য করতেন, তার আরও দুটি পংক্তি মেজমামার নিকট এইরূপ শুনেছি :—

"আমার রঙটা একটু কালো,
আমি সানাই বাজাই ভালো।"

চলবার ক্ষমতা থাকত না। আবার ফিরে এসে নিজের চেয়ারটিতে বসতেন।

এই সময় ডান হাতে লেখবার ক্ষমতা হারিয়ে তিনি বাঁ হাতে লেখা অভ্যাস করে নিলেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯১৮ সনে ছোটদের রামায়ণ এবং ১৯১৯ সনে ছোটদের মহাভারত নাম দিয়ে রামায়ণ মহাভারতের দুটি কিশোরপাঠ্য গদ্য সংস্করণ তিনি রচনা করেছেন। শরীরের ডানদিক অর্থাৎ ডান হাতও অসাড় হয়ে যাবার পর ১৯২৯ সনে "সপ্তকাণ্ড রামায়ণ" নাম দিয়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণের একটি সংস্করণ রচনা ও প্রকাশ করলেন। এর দু'বৎসর পূর্ব্বে "ছোটদের চিড়িয়াখানা" এবং "জানোয়ারের কাণ্ড" নাম দিয়ে প্রাণীতত্ত্বমূলক দুখানি বই তিনি লিখেছেন। ১৯২৯ সনে যখন সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সম্পাদনা করছেন, সেই সময় প্রকাশিত হ'ল তাঁর অপূর্ব্ব কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনী "বনেজঙ্গলে"।

যোগীন্দ্রনাথের রচিত বা সঙ্কলিত স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মধ্যে "জ্ঞানমুকুল" এবং "চারুপাঠ" নামে দুখানি পুস্তক এক সময় খুবই সমাদৃত হয়েছিল কিন্তু এগুলি তাঁর অসুখের পূর্ব্বে বা পরে কবে প্রথম প্রকাশিত হয়, বলতে পারিনা। অন্যান্য স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মধ্যে "ছেলেদের কবিতা" নামে একটি সংগ্রহ পুস্তক ১৯১২ সনে তিনি প্রকাশ করেন। ১৯২৩ সনে পক্ষাঘাত হবার পর অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাসে তাঁর শরীরচালনার স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেল। তবু তিনি দমলেন না। ইতিপূর্ব্বে তাঁর যে সব পুস্তক প্রচলিত হয়েছে, তার নূতন নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতে নূতন রচনা আরম্ভ হ'ল। "সাহিত্য" নামে যে স্কুলপাঠ্য পুস্তকটি ১৯১৮ সনে তিনি প্রথম প্রকাশিত করেন, ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে তার দশটি সংস্করণ হ'ল, ১৯২২ সনে প্রথম প্রকাশিত নূতন পাঠ, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগও প্রচলিত রইল, এ ছাড়া ১৯২৫ সনে (বামহস্তে) লিখলেন আদর্শপাঠ, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ, ১৯২৪ সনে লিখলেন "সুশিক্ষা" ও "পঞ্চরত্ন", ১৯২৯ সনে একই সঙ্গে "শিক্ষা-প্রবেশ" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, "জ্ঞান-প্রবেশ" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, এবং "শিক্ষা-সঞ্চয়" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। এগুলিতে তাঁর নিজের রচনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য লেখকদের শিশুপাঠ্য বা কিশোরপাঠ্য রচনারও সঙ্কলন আছে।

বইগুলি তখনকার দিনে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। মা যখন আমার বাবার কর্ম্মস্থল গৌহাটিতে, তখন দাদামশায় তাঁকে (২১।৮।২২ তারিখে) লিখেছেন " 'সাহিত্য' ও 'ছোটদের রামায়ণ' বেঙ্গলের ডিরেক্টর কর্তৃক text book রূপে অনুমোদিত। এ দুখানা বই কলিকাতার এবং বেঙ্গলের অনেক অনেক হাই স্কুলে পাঠ্য হয়ে থাকে।" প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ১৯২২ সনে যে নূতন পাঠ, দ্বিতীয় ভাগ রচিত হয়, তার বিষয়ে খ্যাতনামা অধ্যাপক "ঢাকা এড্যুকেশন বোর্ড"-এর তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, "প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্য রাশি রাশি পুস্তক আমাকে পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে যোগীন্দ্রনাথবাবুর নূতন পাঠ যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।" দুঃখের বিষয় ১৯৩৭ সনে লেখকের মৃত্যুর বৎসরেই এর দ্বাবিংশ এবং শেষ সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

এসব বইয়ের প্রুফ দেখার কথা কিছু কিছু আজও মনে পড়ে। একটি Paperweight জাতীয় কোনও ভারী জিনিষ দিয়ে প্রুফটি চেপে রেখে বাঁ হাত দিয়ে তিনি সংশোধন করতেন। আর সে প্রুফ দেখাও তাঁরই নিজস্ব ভঙ্গীতে। তাঁর জীবিতকালে তাঁর রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকে একটিও মুদ্রণের ভ্রম থাকতনা। 'প্রেস' এর সঙ্গে যাঁদের কারবার আছে, তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, কত কঠিন পরিশ্রম করলে আমাদের দেশে এ ধরণের নির্ভুল মুদ্রণ সম্ভব। ওইভাবে বাঁ হাতে তিনি চিঠিও লিখতেন। সে চিঠির মধ্যে অনেকগুলি আজও আমাদের কাছে আছে। তাঁর ডান হাতে লেখা চিঠিও দেখেছি অর্থাৎ যে সব চিঠি তিনি আমাদের মাকে লিখেছিলেন, তার অনেকগুলিই এখনো আছে। দাদামশায়ের ডান হাতের হস্তাক্ষর মুক্তার মত ছিল। বাঁ হাতের লেখা এত সুন্দর না হলেও খুবই সুন্দর ছিল। আর তাঁর রচনা ছিল নির্ভুল অর্থাৎ কাটাকাটিশূন্য এবং চিঠিতেও থাকত ঠিক ছাপার বইয়ের মত ডান দিক ও বাঁ দিকে সমান মার্জ্জিন।

কলকাতায় দাদামশায়ের নিকট নিত্য জনসমাগম হত, সাহিত্যিক বন্ধুরা আসতেন, পুস্তকের নূতন নূতন চিত্র ও প্রচ্ছদপটের বিষয় আলোচনা করবার জন্য আর্টিষ্ট আসতেন। আত্মীয় স্বজন তো ছিলেনই। কিন্তু গিরিডিতে এই সব শ্রেণীর লোক ভিন্নও আর একদল লোক আসত—তারা হল

তাঁর জমিদারীর প্রজা। মনে পড়ে গোল বারান্দায় তিনি একটি আরামকেদারায় অর্দ্ধশয়ান, পাশে খাটের উপর সরকার গোপালবাবু লাল খেরোর সরু লম্বা বাঁধান খাতা নিয়ে বসে আছেন—বারান্দার নীচে সারি সারি বসে আছে বা দাঁড়িয়ে আছে প্রজারা। কেমন করে জানি না, সেই বাঁধান খাতার একটি পাতা আমার কাছে থেকে গেছে। তাতে সেই প্রজাদের নাম দেখছি, ভাতু কাহার, মানোয়া চামার, নানী দোসাদ, শিবসহায় বেলদার অর্থাৎ এরা সবাই তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর ছিল। এদের সঙ্গে দাদামশাই সমানে কথা বলে যেতেন। দেনাপাওনার হিসাব করতেই তারা আসত, কিন্তু সব সময় এই জমিদার প্রজা সম্বন্ধ থাকত না। তাদের কথা শুনতে দাদামশায়ের ভাল লাগত। তাই সারা সকাল তাদের বসিয়ে রাখতেন। আবার তারা যে সব সময় খাজনা দিতে আসত, তাও নয়। অধিকাংশ সময়ই তারা খাজনা মাপ চাইতে আসত এবং মাপও হয়ে যেত।

দাদামশায়ের প্রজাদের ছবি ছাড়াও স্মৃতির অ্যালবাম্ খুলে আরও যে সব ছবি পাই, তার মধ্যে দেখছি তরীতরকারী মুরগী ইত্যাদি নিয়ে সাঁওতাল ও বিহারী পসারী ও পসারিণী আনাগোনা করছে। বুধনা নামক জেলে বিরাট এক মাছধরা জাল এনে গোলকুঠির মাঠে শুকোতে দিয়েছে। কখনও বা একটি ধাতবদ্রব্যের তৈরী (কোন ধাতু জানি না) মাকুর মত জিনিষ দিয়ে জালটি সংস্কার করছে। জালটি কার ছিল জানি না। তবে ঐ জালে দাদুর ওপারের বাঁধ থেকে মাছ ধরান হত। বিরাট বিরাট মাছ উঠত। শুনেছি এককালে গোলকুঠির উঠোনের দরজার সঙ্গে লাগান এক প্রকাণ্ড মাছ ওজন করবার দাঁড়িপাল্লা ছিল। আমরা এ দাঁড়িপাল্লা দেখিনি। তবে মাঝে মাঝে জেলে দিয়ে মাছ ধরানর কথা এখনও মনে পড়ে। প্রথমে গোলকুঠিতে মাছ নিয়ে এসে ওজন করে বাড়ীর প্রয়োজন মত মাছ ঢেলে দিয়ে জেলেরা মাছ বিক্রী করতে বাজারে যেত। একবার এই নিয়ে একটি মজার ঘটনাও হয়। একদিন আমরা গিরিডিতে থাকতেই একটি লোক মাছ বিক্রী করতে এল। তাকে মামার বাড়ীর কেউ চিনতেন না। মাছের প্রয়োজন নাই বলাতে সে তার মৎস্যের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করবার জন্য বলতে লাগল, "নিন না বাবু, ভাল মাছ, যোগীনবাবুর পুকুর থেকে ধরা।" (অবশ্য হিন্দীতেই সে কথাগুলি বলেছিল)। অন্য কারও বাড়ী হলে লোকটি নিশ্চয়ই মার খেত কিন্তু

দাদামশাই প্রবল হাস্যরোলে বারান্দা মুখরিত করে বললেন, "তবে রে, আমার পুকুর থেকে মাছ ধরে আমাকেই বিক্রী করতে এসেছ?" লোকটি মানে মানে পালিয়ে বাঁচল।

জেলে দিয়ে মাছ ধরান বোধহয় আমাদের জন্মের পর কমই হত। কারণ মেছুনীদের আনা মাছ গোলকুঠিতে বসে দিদিমাকে কিনতে দেখেছি। সেই কথাই মনে পড়ছে। কত পসারী, কত পসারিণীই যে আসত! কখনও "টুক্‌রী" করে কেউ কয়লা আনছে, কখনও খাসীর মাংস নিয়ে সোফি মাংসওয়ালা আসছে, কখনও বা রূপোলী ঝক্‌ঝকে দুধিয়া মাছের স্তূপকে কাপড়ে ঢেকে মাছওয়ালী মাছ বিক্রী করতে আসছে। ভিতরে রোয়াকে বসে দিদিমা সওদা করছেন ও তারই ফাঁকে ফাঁকে চলেছে ভাঁড়ার বার করা, রান্না করা বা ঠাকুরকে রান্না দেখানো।

একবার পূজোর সময় মার সঙ্গে মামার বাড়ী অর্থাৎ দাদামশায়ের গিরিডির বাড়ীতে গিয়ে অনেক আত্মীয় স্বজনের কোলাহল মুখরিত বাড়ীটি ছেড়ে যেতে আর ইচ্ছে করল না। তাই বাবার কর্ম্মস্থল খুলনায় মা চলে যাবার পরও গিরিডিতে থেকে গেলাম। তখন দাদামশায়ের জন্য পানসাজা ও ছাঁচা, তাঁকে জল দেওয়া ইত্যাদি, ছোটখাট সেবার কাজগুলি আমাকেই করতে হয়েছিল। নানা অসুখে তখন তাঁর দেহ জর্জ্জর। বহুরোগের সঙ্গে যুঝে চলেছেন। ওদিকে তাঁর বড় আদরের কনিষ্ঠা কন্যা আমাদের মাসীমা ইলাদেবী কালরোগে আক্রান্ত। এই বিবাহিত কন্যার রোগমুক্তির জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও সামর্থ্য তিনি ব্যয় করেছেন, তা সত্যই কাহিনী বলে মনে হয়। মাসীর চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে নার্স রেখে দাদামশাই তাঁকে তখন অতি যত্নে রেখেছেন এবং ডাক্তারের নির্দ্দেশমত পুষ্টিকর খাদ্য তৈরী করে গোলকুঠি থেকে তাঁকে পাঠান হচ্ছে। দাদুর মন এ সব ব্যাপারে অবশ্যই উদ্বিগ্ন ছিল। তার উপর বড়মামা ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ সরকার তখন সস্ত্রীক এডিনবারায় দন্ত-চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে গেছেন। এই সকল ব্যয় বহন করা দাদামশায়ের পক্ষেও প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে কিন্তু তাঁর বাইরের ব্যবহার এতই স্বাভাবিক ছিল, দৈনিক জীবনযাত্রা এমন নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা ছিল যে হঠাৎ দেখলে বোঝাই যেত না, তাঁর মনের মধ্যে কি ঝড় বইছে।

সকালে উঠে চা-পানের পর একটি পান খেতেন। অন্য পানের সঙ্গে

তফাৎ করবার জন্য আমরা তার নাম দিয়েছিলাম "ছোটপান"—"ছোটপান" মানে হল একটি পানকে চিরে অর্দ্ধেক করে কম মশলা দিয়ে সাজা পান। বোধহয় শারীরিক অসুস্থতার জন্য বেশী পান খাওয়া ডাক্তারের নিষেধ ছিল। বেলা নটা আন্দাজ দাদামশাই একবার বেলের সরবৎ খেতেন। সরবৎ খাবার পর আবার একটি পান। বেলা দেড়টা দুটো আন্দাজ ছিল তাঁর দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময়। লুচির আকারের দুটি হাতে রুটি ও প্রচুর শাক-সব্‌জি এই ছিল তাঁর খাদ্য। মাছও খেতেন, মাংসের কথা মনে নাই। খাবার পরে আবার একটি পান। দুপুরবেলা গোলবারান্দায় আরামকেদারায় বসতেন। দ্বিপ্রাহরিক আহারের ঘন্টাখানেক পরে এক গেলাস জল খেয়ে একটি পান খেতেন। তাঁকে কখনও দুপুরে ঘুমোতে দেখিনি। এই সময়টা ছিল তাঁর চিঠিপত্র লেখবার সময়। নিজে লিখতে তাঁর কষ্ট হত। অন্য কেউ কাগজ চেপে ধরলে বাঁ হাতে লিখতেন। আমরা থাকলে চিঠি লেখার কাজটা আমাদেরই করে দিতে হত। এইভাবে দাদামশায়ের চিঠি লিখে দিতে দিতে আমার বাংলা ভাষা শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল।

তখন আমার বয়স নয় কি দশ। তবু "ছেলেমানুষ" বলে দাদামশাই কখনও অবহেলা করেননি। আমি মাকে ছেড়ে মামার বাড়ী ছিলাম, তাই গল্পগুজবে আমাকে ভুলিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তবুও পাছে আমি একলা বোধ করি সেজন্য একবার রবীন্দ্রনাথের তিন খানি বই "রাজা ও রাণী", "বিসর্জ্জন" ও "হাস্যকৌতুক" এবং চণ্ডীচরণ সেন কৃত "টম্‌কাকার কুটীর" (Uncle Tom's Cabin-এর বাংলা অনুবাদ) কলকাতা থেকে আমার জন্য আনালেন। তারমধ্যে "বিসর্জ্জন" এবং "রাজা ও রাণী" এ দুটি বই তাঁর কাছে বসে পড়ে দিতে দিতে প্রায় আগাগোড়া মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। আর বিশেষ বিশেষ জায়গার পাঠ শুনে তিনি আবেগের বশে শিশুর মত কাঁদতে আরম্ভ করতেন। সেই রকম একটি জায়গা ছিল "রাজা ও রাণী"র শেষ দৃশ্যে যেখানে রাণী সুমিত্রা তাঁর স্বামীর রোষানল থেকে জালন্ধরের নিরীহ প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য নিজ ভ্রাতা কুমারের মুণ্ড স্বহস্তে ছেদন করে রাজদরবারে উপহার দিতে এসেছেন এবং যে ভৃত্য এই ভ্রাতাভগিণীকে পালন করেছিল, সেই বৃদ্ধ শঙ্কর কুমারের ছিন্ন মুণ্ড দেখে বলছে,

"প্রভু, স্বামী,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,
এই ভালো, এই ভালো! মুকুট পরেছ
তুমি এসেছ রাজার মত আপনার
সিংহাসনে।"

এই সব জায়গা পাঠ করতে করতে আমারও যেমন শরীর রোমাঞ্চিত হত, দাদামশাইও তেমনি বিচলিত হয়ে পড়তেন।

তাঁর নিজের রচনাও কি সুন্দর ছিল। নিজে লিখতে পারছেন না, মুখে মুখে বলছেন, তবু সে চিঠির ভাষা ছিল সাহিত্যেরই ভাষা। তাছাড়া কি পরিপাটি করেই না চিঠিগুলি লিখতে হত। তাঁর নিজের হাতের লেখা চিঠিতেও যেমন কোথাও কাটাকুটি থাকত না এবং দুদিকে সমান মার্জ্জিন থাকত, অন্য কেউ তাঁর হয়ে চিঠি লিখে দিলেও তিনি ঐ রকম করেই লেখাতেন। বারান্দায় ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তিনি বলে যেতেন ও পাশে টেবিল নিয়ে বসে লিখতাম। মাঝে মাঝে একরকম ছোট ছোট পোকা চোখের সামনে দিয়ে উড়ে বেড়াত। বিরক্ত হয়ে উঠতাম। দাদামশাই ধৈর্য্য ধরতে উপদেশ দিতেন। সেই সূত্রে একটি গল্প বলেছিলেন। গল্পের নায়কের নাম ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে, প্রাচীনকালে এক ঋষির শিষ্য তার গুরুর আদেশে কোন কার্য্য সম্পাদন করবার জন্য শস্যক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে বসেছিল। সেই অবস্থায় একটি বিষাক্ত কীট তার পায় কামড়ে দেয় এবং একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। তবুও শিষ্য গুরুর আদেশ অবহেলা করে সেখান থেকে সরেনি।

এই সময় দাদামশাই যাঁদের কাছে চিঠি লিখতেন, তার মধ্যে একজন তো অবশ্যই ছিলেন আমার মা। এ চিঠি ছিল দৈনিক সংবাদ পত্রের মতন। তাঁর অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তাঁর বৌদি স্যার নীলরতনের সহধর্ম্মিনী লেডি নির্ম্মলা সরকারকে চিঠি লিখতেন। বোধহয় দাদার সময়ের অভাব ছিল বলেই বৌদিকে চিঠি লিখে ওদের খবরাখবর নিতেন। নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিদের মধ্যে স্যার জগদীশচন্দ্রের সহধর্ম্মিনী লেডি অবলা বসুর কাছে তাঁর হয়ে চিঠি লিখে দিয়েছি বলে মনে পড়ে। ব্যাপারটি মনে আছে একটি ঘটনার জন্য। দাদামশায়ের হয়ে যে চিঠি লিখে দিয়েছিলাম, তাতে বোধহয়

কোনও প্রশ্ন বা প্রয়োজনীয় কথা ছিল। সুতরাং খুব শীঘ্র উত্তর এল। চিঠির তলায় স্বাক্ষর ছিল অবলা বসু। আমি হস্তাক্ষর পড়তে না পেরে দাদুকে বল্লাম, "কে এক অবলা বাবু তোমাকে চিঠি লিখেছেন।" দাদু সে কথা শুনে খুব হাসতে লাগলেন।

এ সকল চিঠি ছাড়াও তিনি প্রায়ই চিঠি লিখতেন নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে। বোধহয় আমার মাকে লেখা চিঠির সংখ্যার পরেই নবকৃষ্ণ বাবুকে লেখা চিঠির সংখ্যা ছিল। ২৩শে জানুয়ারি, ১৯৩৪ সনে দাদামশায়কে লেখা নবকৃষ্ণ বাবুর একখানি চিঠি আমার হাতে এসেছে। তাতে তিনি লিখেছেন,

"সকল বন্ধুর দ্বারাই অবহেলিত হইয়াছি। কিন্তু জগদীশ্বর ছাড়া এখনও ত আমার একজন বন্ধু আছেন, যিনি আমার সংবাদ পাইবার জন্য ব্যস্ত! জীবনে এমন একজন বন্ধুও লাভ করিয়াছি বলিয়া এখন আমি জগদীশ্বরের প্রতি আমার করুণা দেখিয়া তাঁহার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণতি করিতেছি।"

নবকৃষ্ণ বাবু এর পর নিজ দারিদ্র্য ও অন্যান্য লোকেদের তাঁর প্রতি ব্যবহারের জন্য দুঃখ করে লিখেছেন,

"বোধহয় জীবনের এই সকল কথা এতদিন কাহাকেও বলিতে পারি নাই বলিয়াই এতদিন মৃত্যু হয় নাই। আজ তোমাকে লিখিয়া মনটা অনেক হাল্কা বোধ হইতেছে। সুতরাং এবার হয়ত শীঘ্রই মরিব।......

২ খানা ছবির বইয়ের লেখা মজুত, আর ত এ কাজে যোগীনবাবু নাই, কাজেই ছাপিতেও কেউ চায় না। কোন্ দিক দিয়া কি আর করিতে পারি, বল।"

দাদামশাই নবকৃষ্ণ বাবুকে যে সব চিঠি লিখতেন, সেগুলি সংগ্রহ করতে পারিনি কিন্তু নবকৃষ্ণবাবুর এই উত্তর থেকেই বোঝা যাবে, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই দুই শিশু সাহিত্যিকের হৃদয়ের যোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।

গিরিডিতে গোলকুঠির গোলবারান্দায় বসে দাদামশায়ের হয়ে চিঠি লিখে দিতে দিতে শীতের স্বল্পায়ু বেলা ফুরিয়ে আসত। মাথায় ঝাঁকা নিয়ে মুসলমান রুটিওয়ালা প্রাত্যহিক পাঁউরুটি যোগান দিতে আসত। ওর সঙ্গে পাড়ার বেশির ভাগ লোকের মাসকাবারী বন্দোবস্ত থাকত। তাই তার সরু লম্বা খাতায় সই করে রুটি নিতে হত। চিঠি লেখার থেকে অবসর পেয়ে

খানিকক্ষণের জন্য উঠতাম। ক্রমে বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামত। তখন আবার দাদামশায়ের পাশে এসে বসতাম—এবার গল্প শুনতে। এই সান্ধ্য গল্পের আসরটি কখনও আমাদের দাদুনাতনীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকত কখনও বা বয়স্করাও কেউ কেউ সে আসরে যোগ দিতেন। দুঃখ হয় যে এত বৎসরের পর দাদামশায়ের সে মজলিশি সুর আর শোনাতে পারব না কারণ সেই ৯।১০ বৎসর বয়সে শোনা সুর আজ আমার নিজেরই মনে নাই।

অজস্র গল্প ছিল দাদামশায়ের ভাণ্ডারে। তবুও গল্প শোনার জন্য আব্দার করলে মাঝে মাঝে বলতেন, "এত দেরীতে এলে কেন দিদিমণি?" আগে আমি 'নলিনী', 'মিনি'দের কত গল্প শুনিয়েছি। গল্প মনে না পড়লে ইংরেজী বই পড়ে অনুবাদ করে শুনিয়েছি।"

'নলিনী', 'মিনি' এঁরা ছিলেন ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের কন্যারা। প্রথম থেকেই আনন্দমোহন বসুর মনে ইচ্ছা ছিল যে গিরিডিতে একটি ব্রাহ্ম কলোনী স্থাপন করবেন। যোগীন্দ্রনাথ গিরিডিতে প্রথম এসে ওঁদের গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করেন। বাড়ী খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তারপর দেখলেন যে একটি বাড়ীর বারান্দায় বসে নলিনী দেবী কুলোয় করে চাল ঝাড়ছেন। তাঁকে দেখেই যোগীন্দ্রনাথ আনন্দমোহনের বাড়ী চিনলেন। অবশ্য এর অনেক পূর্ব্ব হতেই বসু পরিবারের সঙ্গে দাদু দিদিমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। দিদিমার নিকট শুনেছি যে তাঁদের বিবাহের পর প্রায়ই তাঁদের একত্রে আনন্দমোহন বসুর বাড়ী বেড়াতে যেতে হত এবং বেশী দিন না গেলে অনুযোগ শুনতে হ'ত। দাদামশায় একলা বোধহয় আরও ঘন ঘন যেতেন—সে ওই গল্প বলার তাগিদে।

আমি তাঁর দৌহিত্রী। সুতরাং তাঁর কন্যা বা কন্যাস্থানীয়ারা তাঁর জীবনের যে চিত্র দেখেছেন বা তাঁর নিকটে যে সব কাহিনী শুনেছেন, সব দেখা বা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবুও "যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।" তাঁর গল্প বলার অনবদ্য সুরটি কালের ব্যবধানে হারিয়ে গেলেও কতকগুলি কাহিনী এখনও মনে আছে। সেগুলিই বলবার চেষ্টা করছি।

দাদামশাই তাঁর বাল্যস্মৃতির থেকে অনেক গল্প করতেন। তার মধ্যে একটি ছবি ও গল্প মনে পড়ে। গ্রামে যতদূর সম্ভব চৈত্র মাসে একটি

উৎসব হ'ত। গ্রামের যত আবর্জ্জনা দুই ভাগে ভাগ করে গ্রামবাসীরাও দুই দল হয়ে সেই স্তূপে আগুন লাগিয়ে দিতেন এবং কাদের আগুন বেশী জোরে জ্বলছে, তা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ'ত। এমন কি, সাময়িক উত্তেজনায় পরস্পরকে গ্রাম্য ভাষায় গালি দেওয়াও চলত। তবে এ ব্যাপারটাও উৎসবেরই অঙ্গ ছিল। তার ফলে দুই দলে মনোমালিন্য হত না। অনেক সময় এমনও হত যে একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি, হয়তো বা পিতাপুত্র দুটি ভিন্ন দলে থাকতেন এবং আগুন নিভে গেলেই তাঁদের উত্তেজনাও শান্ত হত। তখন যে যার আত্মীয়ের সঙ্গে আবার মিলিত হতেন।

দাদামশায়ের জীবনে বহু ফাঁড়া গেছে। জন্মের অনতিবিলম্বে বোধহয় সূতিকাগারেই—খাট থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান এবং আর একবার অতি শৈশবেই বৃষ্টির জল বুকে পড়ে নিউমোনিয়া হয়। বাল্যকালে জয়নগরে বাসকালেই একবার এক বিষাক্ত সাপ তাঁকে কামড়াতে আসে। ওদেশে সেই সাপকে দুমুখো সাপ বলে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শেষমুহূর্ত্তে দেখতে পেয়ে কেউ তাঁকে সাবধান করে দেয়। সুতরাং সে যাত্রা তিনি বেঁচে যান। পরিণত বয়সে কলকাতায় একবার দুটি ট্র্যামের মাঝখানে পড়ে যান। তখন নাকি ট্র্যামের দু পাশেই দরজা থাকত। দরজা দিয়ে তিনি উঠতে যাচ্ছেন, সেই সময় উল্টো দিক থেকে আর একটি ট্র্যাম এসে তাঁর পিঠের জামা এবং চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে চলে যায়। আর দু একটি অর্থাৎ সবশুদ্ধ সাতটি ফাঁড়ার কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে আর একটিমাত্র মনে আছে। শুনেছি ১৯২৬ সনে তাঁর সর্ব্বাঙ্গে এক সঙ্গে সাতটি কার্ব্বাঙ্কল হয়। এই সময় তাঁর জীবনের আশা ছিল না। অপরের মুখে শুনেছি যে সেই অসহ্য যন্ত্রণা তিনি অতি ধীরভাবে সহ্য করতেন। সেই সময় নিদ্রাকর্ষণের জন্য প্রতি রাত্রে তাঁকে মর্ফিয়া দেওয়া হত। একমাসের উপর মর্ফিয়া দেবার পর একদিন তাঁর ভাগিনেয় ডাক্তার অশোককুমার মিত্র অর্থাৎ আমাদের রুণিমামা বল্লেন যে, এভাবে মর্ফিয়া নিলে শেষ পর্য্যন্ত আর সহজভাবে তাঁর নিদ্রাই আসবে না। সেই এককথাতেই নাকি তিনি মর্ফিয়া নেওয়া ছেড়ে দিলেন। এর কতদিন পূর্ব্বে জানি না, তাঁর নাসারন্ধ্রে 'পলিপ' অপারেশন হয়। বোধহয় তাঁকে অজ্ঞান না করেই এই অপারেশন করা হয়েছিল। আমাদের

নিকট হাসতে হাসতে গল্প করতেন, "কশাইরা যেমন গরুছাগল কাটে, তেমনি অমুক এক কশাই বাতি ধরল আর অমুক কশাই ক্ষুরে ক্ষুরে নাক থেকে মাংস কেটে বার করল।" যে দুজন ডাক্তার এই কর্ম্ম করে 'কশাই' আখ্যা লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর আত্মীয় এবং অপরজন পরম বন্ধু। দুজনেই খ্যাতনামা ছিলেন। তাঁদের প্রতি কোন আক্রোশ নিয়ে দাদামশাই তাঁদের 'কশাই' বলতেন না। এ গালি ছিল আদরেরই নামান্তর। তাঁর অসাধারণ সহ্যশক্তির পরিচায়ক বলেই এ ঘটনা উল্লেখ করলাম। এটিকে যদি তাঁর ষষ্ঠ ফাঁড়া বলে ধরা যায়, তাহলে আর একটি মাত্র ফাঁড়ার কথা ভুলে গিয়েছি।

তাঁর জীবনে অনেক ফাঁড়াই এসেছে কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় প্রত্যেকটি ফাঁড়াই কেটে গেছে। তাঁর রচিত অনেকগুলি কবিতার মধ্যেই তাঁর সরল, সুন্দর ঝরঝরে ভাষায়, সহজ উদাহরণের সাহায্যে তিনি শিশুর মনে ঈশ্বর বিশ্বাসের বীজ বপন করেছেন। ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্তর্গত তাঁর রচিত বালক বালিকাদের প্রার্থনা সঙ্গীতগুলি স্মরণ হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে মিষ্ট গীত বোধহয়

"ছোট শিশু মোরা তোমার করুণা হৃদয়ে মাগিয়া লব"।

ওই গানেরই দুটি পংক্তি স্মরণ হয়,

"ছোট তারা হাসে আকাশের গায়, ছোট ফুল ফোটে গাছে,
ছোট বটে তবু তোমার এ জগতে আমাদের কাজ আছে।"

এই পংক্তি দুটির মধ্যে তিনি যে আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন, তা শুধু শিশুদের নয়, অনায়াসেই বয়স্কদেরও "motto" হতে পারে। আজকের দিনের অভিভাবক হয়তো বলবেন, "তারা" অর্থাৎ নক্ষত্র তো আর সত্যই ছোট নয়। সুতরাং এ গীতি শেখালে শিশুকে ভুল জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখানো হবে। কিন্তু আর একটু গভীরভাবে ভাবলে যোগীন্দ্রনাথের উপমাটির উপযোগিতা উপলব্ধি করা যাবে। "ছোট" তারা যেমন সত্যি ছোট নয়, ছোট শিশুও তো সত্যি ছোট নয়। সে যেন বুঝতে শেখে যে তার কাজের মধ্যে দিয়ে সেও নিজের মহত্ব প্রমাণ করতে পারে। এ আদর্শ বয়স্কদেরও আদর্শ হতে পারে।

ব্রহ্মসঙ্গীত ছাড়াও "ছোট পাখী" নামে একটি কবিতা মনে পড়ছে।

পাখীকে বালক পরিপাটি এক খাঁচার লোভ দেখাচ্ছে। সে খাঁচায় মখমলের শয্যা বিছানো আব সে খাঁচায় থাকলে পাকা পাকা মিষ্ট ফল খেতে পাওয়া যাবে। এই প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হয়ে ছোট পাখী উত্তর দিচ্ছে,

"না ভাই, যাব না আমি তরুলতা ছাড়ি,
সুন্দর কাননে মোর আছে ঘর বাড়ি;
উড়িতে বাসনা মোর নীলাকাশে ভাসি
হলেও সোনার খাঁচা ভাল নাহি বাসি।"

এরপর বালক যখন ছোট পাখীকে নিদারুণ শীতে সাগর পার হয়ে একাকী দূরদেশে যেতে নিষেধ করছে, ছোটপাখী উত্তর দিচ্ছে,

"না, না ভাই, একা নহি, আছেন ঈশ্বর,
তাঁহার উপরে মোর সদাই নির্ভর,
বায়ু সম স্বাধীনতা দিয়েছেন মোরে,
সুখে গেয়ে ফিরি তাই দেশ দেশান্তরে।"

দাদামশাই নিজেও গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। তাই বোধহয় জীবনে বহুবার বিপদ আসলেও প্রত্যেকবারই তিনি আশ্চর্য্যভাবে বিপন্মুক্ত হয়েছেন।

তিনি ছিলেন সদানন্দ পুরুষ। তাঁর আশেপাশে গাম্ভীর্য্যের আবহাওয়া তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস তাঁকে কোনদিনই গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরতে শেখায় নি। প্রেমানন্দে তাঁর দিবসরাত সত্যই পরিপূর্ণ ছিল। মনে হয় ঈশ্বর প্রেম থেকে জীবে প্রেম এবং সেই প্রেম-সঙ্গীত আনন্দ জগতকে দুহাতে বিতরণ এই যেন তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

কত গল্পই যে তাঁর ভাণ্ডারে জমা ছিল। কত দেশ দেশান্তরের কাহিনী শোনাতেন, কত বীরত্বের কাহিনী, আবার কত মজার গল্প। তাঁর নিকটে Cowboyদের গল্প শুনতাম, শুনতাম স্কটল্যাণ্ডের কোন কৃষকের ছেলে একবার কেমন করে ধারাল অস্ত্রে নিজের হাত কেটে রক্ত বার করে তাই দিয়ে কাপড় রাঙ্গিয়ে, সেই কাপড় উড়িয়ে একটি ট্রেণ দুর্ঘটনা নিবারণ করেছিল। ইরাণীদের কথা বলতেন, আফ্রিকার সিংহ শিকারের গল্প করতেন। কিন্তু সব গল্পের মধ্যে কি জানি কি কারণে কৌতুককর কাহিনীগুলিই বেশী করে মনে পড়ছে।

ইউরোপের দুএকটি গল্প মনে পড়ছে। কণ্টিনেণ্টে এক দেশ থেকে আর এক দেশে (দেশগুলির নাম মনে নাই) ট্রেণ যাবার সময় সকলের মাল-পত্র পরীক্ষা করবার জন্য শুল্কবিভাগের লোক এসেছে। এক বৃদ্ধা বসে কাগজ পড়ছিলেন। শুল্কবিভাগের কর্ম্মচারী কামরায় উঠতেই তিনি গম্ভীরভাবে অপর "বার্থ"এ উপবিষ্ট এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের বাক্স থেকে ৫।৭ পাউণ্ড নিষিদ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ পশম আবিষ্কার করে কর্ম্মচারী তা বাজেয়াপ্ত করে নেমে যেতেই ভদ্রলোক বৃদ্ধার উপর বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠলেন। বৃদ্ধা বললেন, "আরে, চটেন কেন? আসুন, মাথা ঠাণ্ডা করে এটা ভাগ করে নিই" বলে নিজের বাক্সের থেকে রাশীকৃত পশম বার করলেন।

আর একবার কোনও ষ্টেশনে 'বাস' থেমেছে। বড়ই ভিড়, একটিও আসন খালি নেই। এমন সময় এক বৃদ্ধার সঙ্গে এক তরুণী এল। বৃদ্ধা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, সুন্দরী তরুণীটি 'বাস'এ উঠে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাইতেই একটি যুবক তাকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে বলল, "আপনি বসুন, আমি পরের 'বাস'এ যাব।" তরুণী বসে আছে, বাইরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরমা গল্প করছেন। বাস ছাড়বার ঘণ্টা পড়তে তরুণী গম্ভীর মুখে নেমে গেল এবং ঠাকুরমা তার জায়গাটি অধিকার করে বসে পড়লেন। অদূরে দণ্ডায়মান যুবকটিকে ধন্যবাদ দিতে অবশ্য তরুণী ভোলেনি।

আর একটি গল্প আরও কৌতুককর। এক ফরাসী ও এক ইংরেজের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে। ফরাসী জিজ্ঞাসা করছে, "ইংরেজী danger আর catastrophe শব্দের অর্থে কি পার্থক্য?" ইংরেজ উদাহরণসহ শব্দদুটির অর্থ ব্যাখ্যা করে বলছে যে, "মনে কর তোমার শ্বাশুড়ীকে নিয়ে তুমি নদীর ধার দিয়ে কোথাও যাচ্ছ। হঠাৎ তোমার শ্বাশুড়ী জলে পড়ে গেলেন। সেটা হবে তার পক্ষে danger আর তুমি যদি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাঁচাও, তাহলে সেটা হবে তোমার পক্ষে catastrophe".

মনে হয় এসব গল্প বিলাতী মাসিক পত্রিকাতে কোন সময় পড়ে মনে করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বরচিত অনেক মজার গল্পও বলতেন। একবার দুদল চোরের সম্বন্ধে একটি কৌতুককর কাহিনী বলেছিলেন। একদল চোর এক বড়লোকের বাড়ী চুরি করে প্রচুর বাসন পেয়েছে। একটি খাটিয়ার

উপর বাসনগুলিকে সাজিয়ে তার উপর কাপড় চাপা দিয়ে চুরির মালকে তারা মৃতদেহের মতন করে নিয়ে যাচ্ছে আর কাঁদতে কাঁদতে বলছে,

"বাপ্ মলো রে বাপ্।"

ঠিক সেই সময় অপর একদল চোর সেইখান দিয়ে যাচ্ছে। দুইদলে তো পরস্পরের "মাসতুত ভাই"। সুতরাং তারা ব্যাপারটা ঠিকই বুঝতে পেরে এদের ব্যঙ্গ করে বলছে,

"গাড়ুর নলটি ঢাক্"

প্রথম চোরের দল দেখল অবস্থা খারাপ। তারা তখন কান্নার সুর বজায় রেখে বলতে লাগল,

"ভাগ নেবে তো এসো।"

তখন দ্বিতীয় চোরের দলও খাটিয়াতে কাঁধ দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল,

"কবে মলো রে মেশো?"

আমার বিশ্বাস ছড়াগুলি দাদামশায়ের স্বরচিতই ছিল যদিও তাঁর কোন বইয়ে এগুলি পাইনি। ঠিক বলতে পারি না, হয়তো যে সব কিশোরপাঠ্য মাসিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন, সেই 'মুকুল', 'সাথী' ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়ে থাকবে।

মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত দাদামশায়ের সব রচনাই যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তা নয়। শিশু সাহিত্যিক খগেন্দ্র নাথ মিত্র তাঁর গ্রন্থে ("শতাব্দীর শিশুসাহিত্য") লিখেছেন :— "সাথীর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথমেই অমর-যশা শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় একটি কবিতায় 'আবাহন' করেছেন—

কোথা আছ
ভাইটি আমার কোথা আছ বোন,
আয় ছুটে
আয় শোন্‌রে এসে সাথীর আবাহন···"

এ কবিতাটি তাঁর কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে জানি না। সেইরকমই বোধ হয় তাঁর বলা চোরের গল্প ও ছড়া কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি।

আর একবার 'কুন্তলীন' কেশতৈলের বিজ্ঞাপন নিয়ে একটি গল্প

বলেছিলেন। এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে বলছে, "ভাই অবাক কাণ্ড! আমার সামনে একবাটি কুন্তলীন পড়ে ছিল। একটা ইঁদুর তার মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ পরে দেখি বাটির থেকে বেরোচ্ছে একটা সজারু।" গল্পটির তাৎপর্য্য বুঝতেই পারছেন। কুন্তলীন এমনই তেল যে ইঁদুরের গায় তা সজারুর মত কাঁটা গজিয়ে দিল। এক সময় দাদামশায়ের বন্ধু এবং পরে বৈবাহিক হেমেন্দ্রমোহন বসুর "কুন্তলীন" তেল, নানারকম 'সেন্ট' ও 'পানের মশলা' খুবই বিখ্যাত ছিল এবং বাংলা বিজ্ঞাপন জগতে একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল তাঁর সেই ছড়ায় বিজ্ঞাপন :—

"কেশে মাখ কুন্তলীন
অঙ্গবাসে দেলখোস,
সুবাসে মাতাও ধরা,
ধন্য হোক্ এইচ্ বোস।"

বোধহয় 'তাম্বূলীন' নামক পানের মশলাটি তৈরী করবার পর ছড়াটি একটু পরিবর্ত্তিত হয়ে এই আকার ধারণ করে :—

"কেশে মাখ কুন্তলীন,
অঙ্গবাসে দেলখোস,
পানে খাও তাম্বূলীন,
ধন্য হোক্ এইচ্ বোস।"

এ ছড়ার রচয়িতা কে ছিলেন জানি না। দাদামশায় কুন্তলীনের বিষয় যে গল্পটি বলেছিলেন, সেটিও বিজ্ঞাপন মাত্র। হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই ঐ বিজ্ঞাপন কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু যেখানে যত মজার গল্প পড়তেন, বা শুনতেন, দাদামশায় ঠিক মনে করে রাখতেন এবং তাঁর বলবার অপূর্ব্ব ভঙ্গীর গুণে তা হয়ে উঠত আরও সরস।

তাঁর বলা আর একটি গল্প মনে পড়ছে। পত্রিকায় গল্প বা প্রবন্ধ পাঠিয়ে আজকের লেখক রুদ্ধশ্বাসে বসে থাকেন — ছাপা হবে, কি হবে না এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে। বহু রচনার মধ্যে থেকে প্রকাশের যোগ্য রচনা চয়নে ব্যাপৃত সম্পাদক বা সহ-সম্পাদক বলতেও পারেন,

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী।"

কিন্তু এমন দিনও নাকি ছিল যখন সম্পাদক তাঁর দপ্তর খুলে বসে থাকতেন—

গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতা কিছুই পাওয়া যেত না। সেই বিষয়ে দাদামশায় এক গল্প বলেছিলেন। কোন সম্পাদক তাঁর মাসিক পত্রিকার শেষ কটি পাতার জন্য কোনও লেখাই পাচ্ছেন না। এক ফর্ম্মার দুটি মাত্র পাতায় লেখা বাকী, সেই লেখাটি হলেই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত লেখা পাওয়াই গেল না। কিন্তু গ্রাহকরা যথাসময়ই পত্রিকাটি পেলেন। সূচীপত্র খুলে তাঁরা দেখেন একটি রচনার নাম — "দুপিঠ সাদা"। তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে পাতা উলটিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেখেন যে দুটি শূন্য পাতার শিরোনামায় লেখা "দুপিঠ সাদা।"

যোগীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর নানা সংবাদপত্রে এবং মাসিক পত্রিকায় যে শোক সংবাদ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁর সেই অনবদ্য গল্প বলার ভঙ্গিমার কথা পাই। ৩০শে জুন, ১৯৩৭ সনে অমৃত-বাজার পত্রিকায় সংবাদটি এইরূপ ছিল ঃ—

"The death of Sri Jogindra Nath Sircar at the age of 70 removes from the literary field a strikingly colourful personality who had specialised in Juvenile literature and was, in fact, the pioneer in that line. He was also one of the first to devote attention to the resuscitation of the nursery rhymes of Bengal. He lived a retired life at Giridih and was practically disabled. But as he lay on his invalid chair for hours children gathered round him and he amused them with his never-ending funny stories. He had an almost inexhaustible fund of humour and Juvenile literature has been considerably enriched from this fund."

(৭০ বৎসর বয়সে যোগীন্দ্রনাথ সরকার পরলোক গমন করলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে একজন বিচিত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সেবক অপসৃত হলেন। তিনি যে শিশুসাহিত্যকে নিজের রচনার বিশেষ ক্ষেত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন, তা নয়। বস্তুতঃ সাহিত্যের এই বিভাগের তিনি পথিকৃৎ ছিলেন। বাংলা ছড়া সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য যাঁরা প্রথম প্রচেষ্টা করেছেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। শেষ বয়সে তিনি

প্রায় অক্ষম অবস্থায় তাঁর গিরিডির বাড়ীতে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু "ইন্‌ভ্যালিড্‌" চেয়ারে শুয়ে থাকা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে থাকত আর তিনি তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে মজার গল্প বলে তাদের আনন্দ পরিবেশন করতেন। তার এই অক্ষয় রসভাণ্ডার শিশুসাহিত্যকে প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে।)

এই সংবাদ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গিরিডিতেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং শিশুসাহিত্য বিষয়ক একটি গ্রন্থে এই ভুল সংবাদটি মুদ্রিত অবস্থায় দেখেছি। তাঁর মৃত্যু হয় কলকাতায় কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে ইয়ং মেন্‌স্‌ ক্রিশ্চান এসোসিয়েশনের যে গৃহ আছে, তারই তিনতলার ফ্ল্যাটে। সে ফ্ল্যাটে তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন পরে অর্থাৎ '৩৭ সনেরই কোন সময় সাহিত্য সেবক সমিতি যে স্মৃতিসভা আহ্বান করেন, সে সভাও এই ওয়াই, এম, সি, এরই "ওভারটুন" হলে হয়েছিল। সেই উপলক্ষে প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুনির্ম্মল বসু লিখেছিলেন ঃ—

"যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না—তাঁরা হয়তো জানেন না, কি রকম সদানন্দ, অমায়িক পুরুষ ছিলেন তিনি। 'হাসিখুসি'র লেখক লোকটি যে কি রকম হাসিখুসি ছিলেন—তার খোঁজ অনেকেই রাখেন না। যাঁরা গিরিডি গেছেন, তাঁরা জানেন—যোগীন্দ্রনাথের বাড়ী গোলকুঠী এক সময় ছিল সমস্ত আনন্দ উৎসবের কেন্দ্রস্থল। আর এই উৎসব-তীর্থের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ স্বয়ং। পূজার সময় 'গোলকুঠীর' গোলমাল কানে না এলে মনটা যেন দমে যেত।"

দাদামশায় তো চাকুরী করতেন না। তবুও পূজোর সময়ই গিরিডি যেতেন কেন? এর কারণ এই মনে হয় যে, পূজার ছুটিতে অর্থাৎ শরৎকালে ছোটনাগপুরের এই পাহাড়ী নদীর ধারে তদানীন্তন অর্দ্ধপল্লী, অর্দ্ধশহর স্থানটি যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অপরূপ হয়ে উঠত, তেমনি এখানে বহু স্বাস্থ্যান্বেষী একত্র হতেন। বোধহয় সেইজন্যই দাদামশায় এই সময়টিতেই গিরিডি যাওয়া পছন্দ করতেন। তখন মধুপুরে গাড়ী বদল করে ছোট লাইনের গাড়ীতে গিরিডি যেতে হত। দাদামশায় অথর্ব্ব ছিলেন বলে তাঁর জন্য বিশেষ মাশুল দিয়ে গাড়ী "থ্রু রিজার্ভ"

হত অর্থাৎ যে কামরাটি তাঁর জন্য রিজার্ভ হ'ত, সেটিকে (সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ বগীটিকে) মেন লাইনের ট্রেন থেকে কেটে ছোট লাইনের ট্রেনে জুড়ে দেবার ব্যবস্থা রেল কর্তৃপক্ষই করতেন। তাঁর সঙ্গে এই আনন্দ ভ্রমণে আমরাও বার বার সঙ্গী হয়েছি।

গিরিডিতে ব্রাহ্ম কলোনীর কথা ইতিপূর্ব্বে বলেছি কিন্তু দাদামশায় যে গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন, বা, গিরিডিতে শুধু ব্রাহ্মরা থাকতেন, তা নয়। শারদীয়া পূজার শেষে বিজয়ার দিন রক্ষণশীল পরিবারের বহু লোক এসে বিজয়ার মিষ্টান্ন খেয়ে প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে যেতেন। প্রতি বৎসর পূজার পূর্ব্বে কলকাতায় থাকবার সময় তিনি একটি করে ছোটদের বই প্রকাশ করে তাদের আনন্দবর্দ্ধন করতেন। তাঁর অব্রাহ্ম বন্ধুদের মধ্যে ৺নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য অন্যতম ছিলেন। এঁর সঙ্গে দাদামশায়ের অন্তরের যোগ শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তাছাড়া তাঁর ক্রিশ্চান বন্ধুও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে "প্রচার" কাগজের সম্পাদক রেভারেণ্ড জি, সি, দত্ত বা গোপালচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। দাদামশায়কে লেখা তাঁর খান দুই চিঠি আমি পেয়েছি। তার একটিতে যোগীন্দ্রনাথকে তিনি লিখছেন,

"নিরাপদে ঘরে পৌঁছিয়াছি। সমস্ত পথ তোমারই কথা ভাবিতেছিলাম। যতক্ষণ তোমার কাছে ছিলাম, তোমার সমস্ত কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলাম, আর সেই সঙ্গে তোমাকে খুব লক্ষ্য করিতেছিলাম। তোমার বাল্যকালের সেই অমায়িকতা, সেই উদারতা, সেই শিশুবৎ সরল ভাব এখনও তোমার জীবনে অক্ষুণ্ণ আছে দেখিয়া আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছি। কেবল এবারে নয়, যখনই তোমার সঙ্গে দেখা হইয়াছে, এই ভাব দেখিয়াছি। সাংসারিক লোকের পরীক্ষা, দুর্ভাবনা, নিরাশা, আশাভঙ্গ, শোক দুঃখ যে কি জিনিষ তা আমি বেশ জানি। কিন্তু এ সকলের মধ্যে যে বাল্যজীবনের শিশুবৎ ভাব বজায় রাখিতে পারে, সেইত 'মানুষ', তাই যিশু বলেছিলেন "স্বর্গরাজ্য শিশুদিগের ন্যায়।" আর ভাই, তোমার আভ্যন্তরিক জীবনে অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি বিতরণ করিয়া, তুমি বাঙ্গালা দেশের সকলকে, বিশেষভাবে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে বিশুদ্ধ স্ফূর্ত্তি দিয়াছ,—তুমি যে কত লোককে হাসাইয়াছ,—হাসির সঙ্গে শিক্ষা দিয়াছ, তাহা কে গণনা

করিতে পারে? শিশুসাহিত্যের জন্মদাতা তুমি। তুমি চিরকাল লক্ষ লক্ষ জীবনে অমর হইয়া থাকিবে।"

গোপালবাবুর চিঠিতে "তুমি……স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে বিশুদ্ধ স্ফূর্ত্তি দিয়াছ" এই কথাটি সময়োপযোগী ছিল কারণ ১৯৩০ সনেও স্ত্রীলোকদের শিশুর মত অপরিণতবুদ্ধি বলেই মনে করা হত। যোগীন্দ্রনাথ কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সমসাময়িকদের থেকে অনেক অগ্রসর পন্থী ছিলেন। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, (আমাদের বড়মাসীমা) সেকালের বি, এ,—যেটি সে আমলের মহিলাদের মধ্যে দুর্লভ ছিল। সে জন্য দাদামশায় তাঁকে একটু বিশেষ স্নেহ করতেন। স্ত্রীশিক্ষার দিকে তাঁর গভীর দৃষ্টি ছিল। গিরিডির উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় প্রধানতঃ তাঁর যত্ন ও চেষ্টাতেই স্থাপিত হয়েছিল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ের উন্নতি কামনা করে গেছেন। এমন কি, দেশে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হলে যখন তাঁর পরিবারের সকলকে টীকা দেওয়া হত, গিরিডির বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য তিনি নিজে টীকার বীজ সংগ্রহ করে তদানীন্তন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যবালা ঘোষের নিকট পাঠাতেন—সে কথা মাকে লেখা তাঁর চিঠিতে দেখছি।

সকলকে আনন্দ দিতে ও সকলের মঙ্গলচিন্তা করতেই যেন দাদামশায় ছিলেন। একই সঙ্গে হার্ণিয়া, ডায়াবেটিস্ ও পক্ষাঘাতে যখন তিনি পঙ্গু, তখনকার চিত্রই আমার স্মৃতিতেই মুদ্রিত আছে। তবু কি অদ্ভুত ছিল তাঁর প্রাণশক্তি। যখন যেখানে তিনি থেকেছেন, সমস্ত পরিবেশ যেন তাঁর ব্যক্তিত্বে পূর্ণ হয়ে গেছে।

তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে বড়মামা যে জীবনী পাঠ করেছিলেন, তাতে এই কথারই উল্লেখ ছিল:—

"তাঁহার বাড়ী সব সময়ই অতিথি অভ্যাগতে পূর্ণ থাকিত। ইহাই ছিল বালক বৃদ্ধ ছেলেমেয়ে সকলের মিলনকেন্দ্র। শিশু যেমন একেলা থাকিতে পারে না, তিনিও তেমনি সকল সময় পাঁচজনকে লইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন এবং এই পাঁচজনের বয়স হয়ত পাঁচ হইতে পঁচাত্তর অবধি হইত। কাহারও সঙ্গে অনাবিল বিনা রহস্যে শুধু গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারিতেন না। এই জন্য সকলেই তাঁহার সঙ্গ খুঁজিত।"

সত্যই তাঁর সেই হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডারের দ্বার সদা উন্মুক্ত থাকত, রহস্যের সদামুক্ত ফোয়ারা সকলকে কেন্দ্র করেই উচ্ছ্বসিত হত। তাঁর রচিত সব ছড়া গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় নি। মুখে মুখে তিনি দু'চারটে আজগুবী ছড়া বলতেন! অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে যে তার মধ্যে একটি—অনেকটা "ফড়িংবাবুর বিয়ে" নামে তাঁর যে ছড়াটি তাঁর "হাসিরাশি''তে, আছে, অনেকটা সেই ধরণের ছিল কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তার স্পষ্ট রূপটি মনে করতে পারছি না। মেজোমামা শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকারের নিকট তাঁর মুখে মুখে বলা একটি ছড়া শুনলাম। কোন সময় ওঁদের কালু সিং নামে একটি পাহাড়ী ভৃত্য ছিল। তাকে দাদু বলতেন,

"কালু সিং
তিড়িং বিড়িং
দার্জ্জিলিং।"

আর একটি ছড়া আমার মাসীমা ইলাদেবী—সেদিনের ক্ষুদ্র বালিকা আমার দিদি যাঁকে "ইয়া" বা "অ-ইয়া" বলে ডাকত—দিদিকে খেলার ছলে বলতেন। ছড়াটি হিন্দী। জানি না, এটি দাদুর রচনাই ছিল কিংবা কোনও হিন্দী লেখকের লেখা। ছড়াটি এইরূপ :—

''রাম চলিন হুয় আগে আগে
পিছে লছমন ভাই,
ঔর তেক্‌রা পিছে মিয়া সুন্দরী
কঁকর কঁকর কাঁই।"

দাদামশায় একটি উড়িয়া ছড়া বলতেন। তার ভাষা উড়িয়া ব্যাকরণ অনুসারে শুদ্ধ কিনা জানি না। তবে মাতৃভাষা নিয়ে যেমন কৌতুক করতেন, এটিও সেই কৌতুকের বশেই রচিত। সুতরাং ভাষা বা ব্যাকরণের দোষ (যদি থাকে, তা) ক্ষমা করে কৌতুকটুকুই উপভোগ্য। ছড়াটি হল একটি ধাঁধা। একজন তার হলধর নামক সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করছে,

''হলধর-অ ভাই, জলধর-অ কি মতি মরিল?"

অর্থাৎ ভাই হলধর, "জলধর-অ" মানে ব্যাঙটা কি করে মরল?
তার উত্তরে হলধর বলছে,

''স্বরগে ছিল পঞ্চপাণ্ডব-অ, মারি কিড়ি বনবাস-অ গিল।"

স্বর্গে অর্থাৎ গাছের উপর চালকুমড়ো ছিল। চালকুমড়োর পাঁচটি খাঁজ ও গোল গোল অংশের এক একটিকে এক একটি পাণ্ডব ভ্রাতা বলে কল্পনা করা হয়েছে। সেই চালকুমড়ো ব্যাঙের উপর পড়ে ব্যাঙটাকে থেঁতলে মেরে গড়াতে গড়াতে বনে চলে গেল।

দাদামশাই প্রায়ই চিঠিতে ছড়া লিখতেন। তার অনেকগুলি হারিয়ে গিয়ে কয়েকটি এখনও আমাদের নিকট আছে। সেই চিঠিতে দেখছি, আমার দিদিকে একবার লিখছেন,

"দিদি দিদি
দিন্ দিন্
দিদি নাচে
তা ধিন্ ধিন্।"

আর একটি চিঠিতে দিদিকেই লিখেছিলেন:—

"তুমি একটি সোণার যাদু,
আমি একটি বুড়ো দাদু।"

যখন দিদি ও আমি দুজনে জন্মেছি, তখন এক চিঠিতে লিখেছিলেন,

"বড় ছোট,
কোলে ওঠ,
ছোট বড়,
কোলে চড়,
কিসি দাও,
কিসি নাও।"

এরই আর একটি রূপান্তর অন্য এক চিঠিতে দেখছি,

"আমার দিদি—
ছোট বড়, বড় ছোট!
আমার দিদি—
হেসে হেসে নেচে ওঠো।
যত পার চুমো দাও
পেট ভরে চুমো খাও!"

এরপর আর একটিতে দেখছি,

"ছোটখাট দুটি বোন
হাসিখুসি সারাখন,
দুই বোন হাসিমুখ
রাঙা হাসি টুক্‌টুক্‌।"

যখন আমাদের চার বোনের জন্ম হয়েছে (বোধহয় আমরা তখন খুলনায়) দাদু আমাদের ডাকনাম নিয়ে ছড়া তৈরী করে পাঠালেন :—

"দীপু দিদি সোণার যাদু,
আভা বেজায় ভালো,
ইভা আর শোভায় মিলে
ঘর করেছে আলো।"

আর একটি চিঠিতে ছড়া দেখছি :—

"রুটি যাবে শ্বশুরবাড়ী
সঙ্গে যাবে কে?
সঙ্গে যাবে চিনি মাখন
নাচতে লেগেছে।
চিনি নাচে, মাখন নাচে
আর নাচে বাজু,
বাজুর বাবা বলরাম
মস্ত বড় পাজু।"

"বাজু" বা "বাজুয়া" ছিল তাঁর বালক ভৃত্যের নাম। বলাবাহুল্য শেষ পংক্তিতে শুধু মিলের খাতিরে "পাজু" (পাজী গালিটির রূপান্তর) লেখা হয়েছে। ঐ ভৃত্যের পিতার নাম সম্ভবতঃ বলরাম ছিল না, বা তাকে গালি দেওয়া দাদামশায়ের উদ্দেশ্য ছিল না।

তাঁর জীবনে যত বন্ধুলাভ হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলিই ছিল এই ভৃত্যশ্রেণীর সরল, দরিদ্র লোক। অশিক্ষিত, তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদের সম্বন্ধে সেকালের হিন্দু সমাজের মনে যে ঘৃণার ভাব ছিল, তা তাঁকে ব্যথিত করত। রুণিমামার মুখে শুনেছি, অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য তিনি তাঁর গিরিডির তথাকথিত অস্পৃশ্য প্রজাদের হাতে জোর করে জল পান

করতেন। একবার সেই কারণেই তাঁর হেডমালি বেহারীর নিকট এক গ্লাস জল চান। সে বেচারা জীবনে এমন ব্যাপার দেখে নি। কিছুতেই সে জল দেবে না। দাদামশায়ও তার হাতে জল না খেয়ে ছাড়বেন না। অবশেষে অন্যান্য পাঁচজন প্রজার সামনে তার হাতের জল পান করে, তারপর তার "হপ্তা" বা সাপ্তাহিক বেতন দিলেন।

আর একবার ওখানকার একটি ডোম মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। একে হিন্দু সমাজের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে তার জন্ম, তার উপর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে মুসলমান হওয়া — এই "ডবল" পাপের সাজা স্বরূপ তাকে কেউ কাজ কর্ম্ম দেয় না। বেচারা বিনা দোষে না খেতে পেয়ে মারা যায় দেখে, যোগীন্দ্রনাথ নিজের গরু বাছুরের তত্ত্বাবধানের জন্য তাকে নিযুক্ত করলেন।

আর একটি চামার জাতীয় লোক মদ গাঁজা খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল। তার উপকারার্থে তাকে আমার মার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লিলুয়া নামক আমাদের এই চির পুরাতন ভৃত্যটি আজও আমার ভগিনীর নিকট রয়েছে। বলা বাহুল্য, যে সময় দাদামশায়ের অনুরোধে বাবা তাকে আমাদের গৃহে ভৃত্যের কর্ম্ম দেন, তখন ভৃত্য সমস্যা বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল বলে জানি না। মাসিক ২।৩ টাকা বেতনে ব্রাহ্মণ ভিন্ন যে কোন জাতের ভৃত্য পাওয়া সহজ ছিল। লিলুয়ার জীবনটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, তার জন্যই দাদামশাই তাকে মার নিকট পাঠিয়েছিলেন। একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। যতদূর জানি, দাদামশায় যখন প্রথম বেহারীর হাতের জলপান ইত্যাদির দ্বারা অস্পৃশ্যতা নিবারণের চেষ্টা করেন, গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা নিবারণ আন্দোলন তখনও আরম্ভ হয়নি। সুতরাং দাদামশায়ের ঐ প্রচেষ্টার মূলে কারও অনুকরণ নয়, তাঁর স্বভাবের প্রেরণাই ছিল।

দাদামশায় বার বার গিরিডি যেতেন শুধু সম্পত্তি রক্ষা করতেও নয়, নিছক প্রকৃতি প্রেমেও নয়, তদানীন্তন গিরিডির অশিক্ষিত সাঁওতাল ও অন্যান্য সাধারণ লোকের প্রতিও তাঁর ছিল দুর্ব্বার আকর্ষণ। গোলকুঠির মাঠে কতবার সাঁওতালদের সঙ্ঘনৃত্য (group dance) হয়েছে, সে কথা মনে পড়ে। তাছাড়াও দু একজন সাঁওতাল গোলকুঠিতে সর্ব্বদা যাওয়া আসা করত। কখনও কখনও মুরগী বিক্রী করতে এসে কৃষ্ণকলির মত কালো, মসৃণ, সুঠাম দেহে নিপুণভাবে সাদা কাপড়টি পরা সাঁওতাল মেয়ে হাত বাড়িয়ে লাল

ফুল তুলে খোঁপায় গুঁজত, কখনও বা কি কারণে জানি না, আসত সুন্দর মাঝি। মাথায় তার লাল পাগ্‌ড়ি বাঁধা। বেঁটেখাটো মানুষটির হাতে সর্ব্বদা একটা লাঠি থাকত। আমাদের দেখতে পেলে সুর করে গোল হয়ে নেচে নেচে গান গাইত,

"বাবা ভুজ্‌নু বিড়ি হে পড়িল রে,
চল ভুজ্‌নু দুম্‌কা, চল ভুজ্‌নু রে,
হুঁকা খেতে বিলম্ কর ফক্‌ ফক্‌ ফক্‌।"

প্রত্যেকবার "ফক্‌" বলার সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠিটা ঠক্‌ঠক্‌ করে ঠুকত। সাঁওতাল সুন্দর মাঝির বিপরীত চেহারা ছিল মাঝ্‌লা কুঠির ভোজপুরী দারোয়ানের। বিশালবপু এই মানুষটি লাঠি হাতে কি জানি কি কারণে দাদুর কাছে আসত। তিনি সকলের সঙ্গে বন্ধুর মত গল্প করতেন।

রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন:—

"কৃষাণের জীবনের সরিক যে জন,
কর্ম্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জ্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

দাদামশায় সেই কবি ছিলেন কিন্তু তিনি বাণী যা কিছু দিয়েছিলেন, তা শিশুদের। "রাঙ্গাছবি"তে বনের পাখীকে শিশুর মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন,

"মা বলেছে, কা'রো প্রাণে
কষ্ট দিতে নাই,
বাসতে ভাল তোমায় পাখী
তাই ত আমি চাই।"

এর চেয়ে সরল ভাষায় সুন্দর উপদেশ শিশুদের জন্য আর কি হতে পারে?

"যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি" বলে রবীন্দ্রনাথ বয়স্কদের যে বাণী দান করলেন, এটি সেই বাণীরই রূপান্তর। শিশুদের মতই সরল ছিল সেদিনের অশিক্ষিত শ্রেণী। তাই শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও তিনি ভালবাসতেন এবং তাদের জীবনকে সুন্দর করে তোলবার প্রয়াস করতেন।

দাদামশায়ের নিকট আপন পর ভেদাভেদ ছিল না। কি আশ্চর্য্য

ছিল সেই জীবন, যেমন তার গভীরতা, তেমনি তার প্রসার। ১৯২০ সনের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি আমার মাকে "তোমাদের সেই জয়গোপাল" নামে কার কথা লিখেছিলেন। ভাবে মনে হয় কোন ভৃত্য। তার চিকিৎসার কথা দাদামশায়ের চিঠিতে দেখছি। তার চোখের অসুখ সারাবার জন্য দাদামশাই তাকে ডাক্তার দেখাচ্ছিলেন—সম্ভবতঃ তাঁর নিজের খরচে।

অনেক দিন পরে আমরা নিজেরাই দেখেছি, একবার তাঁর বাড়ীর চাকর হরির কি এক কঠিন ব্যায়রাম সারাবার জন্য অনেক খরচপত্র করে চিকিৎসা করালেন। তার শ্বাসনালীতে কিছু হয়েছিল। সে রোগের চিকিৎসা করা কখনই তার ক্ষমতায় কুলোত না। আর চিকিৎসা না করালে মৃত্যু অবধারিত ছিল। সে যখন হাসপাতাল থেকে ফিরে এল, দেখলাম তার গলায় একটি ফুটো করে তার উপর রবারের গোল ফুটোওয়ালা একটি চাকতি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চলেছে। অবশ্য ভাল হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে দাদামশায়ের বাড়ী থেকে চলে যায়। এ অবশ্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। শুনেছি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেউ একবার বলেছিল, "বিদ্যাসাগর মশাই, অমুক আপনার নিন্দা করছিল।" বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর দিলেন, "সে কি? আমি তো ওর কোনও উপকার করিনি।" এইটাই সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম, অন্ততঃ আমাদের দেশে। সুতরাং দাদামশায়ের পয়সায় চিকিৎসা করিয়ে নিয়ে অশিক্ষিত মেদিনীপুর নিবাসী হরি যে অন্যগৃহে চাকুরী নিয়ে চলে যাবে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। "বাজুয়া" নামক ভৃত্যের প্রতিও তাঁর প্রীতির সীমা ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পরও সে আমাদের মামার বাড়ীতে ছিল এবং 'বাজুর বাবা বলরাম মস্ত বড় পাজু" ঐ ছড়াটি আবৃত্তি করত। ১৯৩৭ সনে তাঁর মৃত্যুর পর কয়েকদিন পরে খবর পেয়ে এক বুড়ো মুসলমান আমওয়ালা এসে আক্ষেপ করে, "হায়, হায়, আমি কেন আগে খবর পেলাম না? বাবা মারা গেলেন, আমি তাঁর ছেলে, মাটি দিতে পারলাম না?" এই মাটি দেবার ব্যাপারটা ঠিক বুঝি নি। বোধহয় পিতার কবরে সন্তানের অঞ্জলি ভরে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করবার প্রথা মুসলমান সমাজে আছে। এক্ষেত্রে তার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু সেই বৃদ্ধ, অশিক্ষিত আমওয়ালার সেই উচ্ছ্বসিত আবেগের কথাও একেবারে ভোলা বা তুচ্ছ করা সম্ভব নয়। এতো

দাদুর গৃহে ভৃত্যও ছিল না। শুধু মাঝে মাঝে আসত। তবু ঐ একটুক্ষণের দেখাতেই বৃদ্ধ কতটা মুগ্ধ হয়েছিল, তা স্মরণীয়।

দাদামশায়ের অধিক প্রিয় ভৃত্যরা অবশ্য গিরিডিতেই ছিল। তাদের মধ্যে তাঁর প্রাক্তন হেডমালী বেহারীর নাম উল্লেখযোগ্য। আমরা যখন তাকে দেখেছি, তখন সে অতিবৃদ্ধ—মালীর কাজ করে না—প্রচলিত অর্থে ভৃত্যের কাজও নয়। সে যে গোলকুঠিতে কি করতে আসত জানি না। বোধহয় নিয়মিত হাজিরা দিলেই বেতন পেত। বেহারী ভিন্ন 'জিত্‌না' ও 'বিশ্‌না' নামক দুই ভৃত্যের কথা মনে পড়ে। তারাও দাদুর পদসেবা করত আর দাদু সমানে তাদের সঙ্গে রহস্যালাপ করতেন। তাঁর মুসলমান প্রজা 'চুটুরিয়া'ও বোধহয় কিছুদিন তাঁর ভৃত্যের কাজ করেছিল। পাচকদের মধ্যে 'ঝরি' আর 'টহল' এই দ্'ুটি নাম মনে পড়ছে। আর সকলের নাম মনে করতে পারছি না। শুধু মনে পড়ে যে তিনি তাদের সকলের সঙ্গেই পরম বন্ধুভাবে মিশতেন।

জীবনের অধিকাংশ সময় কলকাতা এবং গিরিডিতে কাটালেও পিতৃপুরুষের জন্মভূমিকেও তিনি একেবারে ভোলেন নি। গিরিডির জমিজমা তদারকের জন্য অনেক সময়ই দেশের অর্থাৎ 'নিত্তাড়া' বা 'ন্যাতড়া'র লোক নিয়ে গিয়ে গিরিডিতে রেখেছেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দেওয়া। তার ফলে অনেক সময় তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষতিকে তিনি জীবনে কোনদিনই বড় স্থান দেন নি। তাঁর বালক-বালিকাদের জন্য রচিত প্রার্থনা সঙ্গীতে আছে,

"জগতের মাঝে জগতের কাজে আপনা ভুলিয়া রব।"

এ শুধু মৌখিক উপদেশ নয়। তিনি নিজের সব কষ্টকে তুচ্ছ করেই জগতকে আনন্দ বিতরণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ জীবনে তাঁর জন্য দারুণ শেল অপেক্ষা করেছিল। ১৯৩১ সনে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আমাদের মাসীমা "ইলা" দেবী সেকালে দুরারোগ্য এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। শেষ জীবনে দাদামশায়ের রোগযন্ত্রণার উপর কন্যার জন্য দুশ্চিন্তা তাঁর মৃত্যুবাণরূপে দেখা দিল।

১৯৩৪ সনে যখন তাঁর নিকটে ছিলাম, সারাদিন তাঁর হাসিমুখ দেখেছি, সন্ধ্যাবেলা শুনেছি তাঁর অনবদ্যভঙ্গীতে বলা মধুর কাহিনী।

তারই ফাঁকে ফাঁকে আর এক দৃশ্য দেখেছি, সেও ভোলবার নয়। বিকেলে যেদিন বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করত না, বারান্দার এক প্রান্তে চুপটি করে বসে থাকতাম। আমি তখন নিতান্তই ক্ষুদ্র বালিকা—হয়তো মার কথা, বাবার কথা, বোনেদের কথা মনে পড়ে মন খারাপ করত। সেই সময় অনতিদূরে আরামকেদারায় একলা বসে দাদু প্রার্থনা করতেন। সে প্রার্থনার ভাষা বোঝা যেত না, গানের মত গুন্‌গুন্‌ ধ্বনিটুকু শুধু শোনা যেত। আমাকে হয়তো তিনি দেখতে পেতেন না কারণ গোলকুঠির তিনদিকে গোল করে ঘোরান বারান্দা ছিল—তার ফলে একই বারান্দার দুপ্রান্তে বসে দুজন লোক পরস্পরকে দেখতে পেত না। ঠিক জানি না, এই কারণে দাদু আমার উপস্থিতি জানতে পারতেন না কিংবা নিতান্ত শিশু জেনে আমার সামনে হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। যেভাবেই হোক, তাঁর চিরন্তন হাসির ফোয়ারার অন্তরালে লুকোন অশ্রুর উৎসও দেখেছি। সেকালের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যত রকম চিকিৎসার বিধান ছিল, আদরিণী কন্যার জন্য তার কোনটি বাকী রাখেন নি। ব্যয় করেছেন অকাতরে। তারপর ১৯৩৬ সনের আরম্ভে যখন মাসীকে কলকাতায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল, প্রধানতঃ তাঁকে দেখবার জন্যই কলকাতায় এলেন।

কলকাতায় ওয়াই, এম, সি, এ (কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত ইয়ং মেন্‌স্‌ ক্রিশ্চান এ্যাসোসিয়েশন) তে তখন ভদ্র পরিবারের বাসের উপযোগী করে ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হত। তিনতলার ফ্ল্যাটটিতে মামারা থাকতেন। বাবা যখন কলকাতায় এ্যাসিস্‌টেন্ট পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল হয়ে বদলী হয়েছেন, তখনও তাঁর বালিগঞ্জের গৃহটি নির্মিত হয় নি। তাই ওয়াই, এম, সি, এরই দোতলার ফ্ল্যাটটি তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন। দাদামশায় কলকাতায় এসে তিনতলার ফ্ল্যাটে রইলেন। তাঁর মনে তখন মাসীর রোগের চিন্তায় ঝড় বইছে কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ ছিল অল্পই। আমাদের তখন কি আনন্দ! মাসীর অসুখের কথা যে একেবারে বুঝতাম না, তা নয়। তিনিও আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু কোন চিন্তা নিয়ে বেশীক্ষণ মন খারাপ করে থাকবার বয়স সেটা নয়। সুতরাং স্কুলের ছুটির পর বাড়ী এসে জলখাবার খেয়েই দাদুর কাছে তিনতলায় যেতাম। আমাদের সঙ্গে তখনও অনেক গল্প করতেন।

তবে ধীরে ধীরে তাঁর শরীর আরও অশক্ত হয়ে পড়েছিল। শেষে চোখে দেখতে পেতেন খুবই কম। চোখ বোধহয় আরও আগে থেকেই খারাপ হয়েছিল কারণ ১৯৩৪ সনের ১১ই জানুয়ারী রেভারেণ্ড গোপালচন্দ্র দত্ত তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে দেখছি, "তোমার চোখের অসুখের কথা শুনিয়া ভারী দুঃখিত হইয়াছি। অবিশ্রান্ত সাহিত্যসেবায় তোমার চক্ষু দুইটি বলিদান করিয়াছ। তোমার এই মহাত্যাগে সহস্র সহস্র বালকবালিকা উপকৃত হইয়াছে, কিন্তু তুমি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ। লোকের উপকারই তোমার মহাপুরস্কার ; তবে পরজগতে করুণাময় পিতা তোমাকে গৌরবমুকুটে বিভূষিত করবেন। তোমার স্থান উর্দ্ধে, অতি উর্দ্ধে।"

চোখে কম দেখতে পেলেও দাদামশায়ের বই পড়ার আগ্রহ যায় নি। চিরদিন বই নিয়েই থেকেছেন। শেষ জীবনেও তিনি চাইতেন যে কেউ তাঁর নিকটে বসে কোন ভাল বই পড়ে শোনাক। তাঁর এই শেষ দিন কটিতে আত্মীয়স্বজন যে যখন তাঁর কাছে থেকেছেন তাঁদের, এবং কখনও কখনও তাঁর পুস্তকালয় 'সিটি বুক সোসাইটি'র কর্ম্মচারীদেরও কোনও না কোনও বই থেকে তাঁকে কিছু পড়ে শোনাতে হয়েছে।

ঐ সময় "কৈশোরক" নামক কিশোরপাঠ্য মাসিক পত্রিকায় যোগীন্দ্র-নাথের বিষয় এই রচনাটি প্রকাশিত হয় :—

"অনেকদিন আগে এদেশে গভর্ণমেন্ট অনুবাদক সমাজের সদস্যগণ বিদেশী শিশু-সাহিত্যের অনুকরণে এদেশে শিশু-সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। সে সময় তাঁহারা ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। তাহারই ফলে, সে কালের বাঙ্গলায় "চকমকির বাক্স", "ছোট কৈলাস ও বড় কৈলাস", "কুৎসিত হংসশাবক" প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পুস্তকাবলী "গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক-সংগ্রহ" নামে প্রচারিত হয়। তখন শিশুপাঠ্য সাহিত্যের অস্তিত্বও ছিল না। ইহার কিছুকাল পরে মনস্বী কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে দেশে ফিরিলেন। তিনি বিলাতের সুলভ সংবাদপত্রের অনুকরণে "সুলভ-সমাচার" ও শিশুপাঠ্য সাহিত্যের অনুকরণে "বালকবন্ধু"র সৃষ্টি করিলেন। "বালকবন্ধু"ই শিশুপাঠ্য সচিত্র সুকুমার সাহিত্যের আদি।

তাহার পর স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন "সখা"র প্রতিষ্ঠা করিয়া কেশববাবুর উপ্ত বীজে জলসেক করিতে লাগিলেন। প্রমদাচরণ শিশুহিতে

জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—হায়! অকালে সেই পরার্থপর কর্ম্মবীরের জীবন অবসিত হইল। 'সখা'র সমাগমে সচিত্র শিশু-সাহিত্যে নূতন যুগের অভ্যুদয়। তখন ফুল ফুটিয়াছিল, এখন ফল ধরিতেছে। শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র হইতেই বাঙ্গলায় শিশুপাঠ্য সাহিত্যের সৃষ্টি।

"বাঙ্গলা শিশুপাঠ্য সাহিত্যে সেই "সখা"র সময় হইতে যাঁহারা সেবা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার জীবিত রহিয়াছেন। (১৯৩৭ সনের প্রথমার্দ্ধে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়)... ... ...
"নবকৃষ্ণবাবু এবং যোগীন্দ্রবাবু অকৃত্রিম বন্ধু। নবকৃষ্ণবাবুকে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে এবং তাঁহার রচিত শিশুদের পাঠ্যগ্রন্থাদির বিষয় আলোচনা করিবার কথা জানাইলে তিনি বিনীতভাবে বলিলেন—"আমার আগে যোগীনবাবুর কথা লিখিবেন। তিনি অধ্যবসায় বলে সাহিত্যের এই নূতন বিভাগে সেকালে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার বইয়ের যত আদর এমন আদর কাহারও হয় নাই।" —নবকৃষ্ণবাবুর কথা যে কতদূর সত্য বাঙ্গলা-দেশের সকলেই তাহা জানেন।

"আমাদের দেশে কত লোকের 'জয়ন্তী' উৎসব হয়, কত সমাদর হয়, সম্বর্দ্ধনা হয়,—একান্ত দুঃখের বিষয় যে ছোটদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথের কথা কেহই ভাবেন না! হয়ত দেশের বড়লোকেরা মনে করেন, শিশু-সাহিত্য কি আবার সাহিত্য! কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের লোকেরা মনে করেন—যাঁহারা শিশুদের মনকে আনন্দরসে অভিষিক্ত করিতে পারেন, তাঁহারাই দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী পথপ্রদর্শক।" আমাদের দেশে যোগীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশের পরেই শিশু-পাঠ্য সাহিত্যের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছিল।...

* * * *

যোগীন্দ্রবাবু সুকবি।
এই ছড়াগুলি কখনও পুরাণো হয় না:—

"ঘুমিয়ে যখন থাকি,
মায়ের চুমা ফুটিয়ে তোলে
আমার দুটি আঁখি।

হাসলে আবার চুমা,
থাকলে জেগে চুমা দিয়ে
বলেন 'খুকু ঘুমা!'

কাঁদলে আমি পরে
অমনি কেন ধারার মত
হাজার চুমা ঝরে!

মায়ের মুখের ছড়া
তাও যেন ঠিক চুমার মত
সুধা দিয়ে গড়া!

নাইকো চুমার শেষ
উঠতে চুমা বস্‌তে চুমা
চুম্ চুমা চুম্, চুম্ চুমা চুম্,
চলছে মজা বেশ!"

কৈশোরকের লেখক যোগীন্দ্রনাথের এই ছড়াটি উদ্ধৃত করবার পর তাঁর রচনার বিষয় আরও দুচার কথা বলে প্রবন্ধ শেষ করবার পূর্ব্বে লিখেছেন :—

"যোগীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের সাহিত্য সমাজে যে সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী তাহা তিনি পান নাই—আমাদের দেশের সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলির কি কর্ত্তব্য নয় এই জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধকে সম্বর্দ্ধনা করা?"

এই রচনাটি প্রকাশের অল্পদিন পরে যোগীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই "জলছবি" নামক কিশোরপাঠ্য মাসিক পত্রিকায় এই শ্রদ্ধাঞ্জলিটি প্রকাশিত হয় :—

"কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি আজো স্মরণ আছে!
প্রথম কাব্য শিখেছিলেম, কবি, তোমার কাছে।
রঙীন ছবি, রাঙা লেখায় ভুলিয়েছিলে মন,
মুগ্ধমনের কৃতজ্ঞতার তাই এ নিবেদন।
বাংলাদেশের ছেলেমেয়ের পক্ষ হ'তে, প্রিয়,
'জলছবি'র এই সম্পাদকের প্রণামখানি নিয়ো।"

জীবনের শেষবেলায় কিশোর পাঠ্য একটি গল্পের সঙ্কলন তিনি প্রকাশ করলেন। সঙ্কলনটির নামকরণ হ'ল "গল্প-সঞ্চয়"। অবশ্য তাঁর দ্বিতীয়পুত্র (আমাদের মেজমামা) সুধীন্দ্রনাথ সরকার সাহায্য না করলে তাঁর চোখের ঐ অবস্থায় লেখা সম্ভব হত না। এই বই পড়ে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা লিখেছিলেন,

"ছেলেদের যেমন চাই দুধভাত, তেমনি চাই গল্প। যে মা-মাসিরা তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই তাদের মিষ্টি গলায় গল্প জুগিয়ে এসেছে। ছেলেদের সেই সত্যযুগ আজ এসে ঠেকেছে কলিযুগে—আজকের দিনের মা-মাসিরা গেছেন গল্প ভুলে—কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলেনি। ছেলেরা আজও বলছে, গপ্প বলো। কিন্তু তাদের ঘরের মধ্যে গপ্প নেই। এই গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যাঁরা কোমর বেঁধেছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করেছেন। ছেলেরা তো অ শীর্ব্বাদ করতে জানে না, সেই আশীর্ব্বাদ করবার ভার নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।"

এ হ'ল ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ সনের কথা। তার একমাসের মধ্যে অর্থাৎ ১১ই অক্টোবর তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু হ'ল। কি শান্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে সেই আঘাত দাদামশায় সহ্য করলেন, না দেখলে তা অনুমান করা কঠিন। এই বিবাহিতা কন্যার রোগমুক্তির আশায় জীবনের শেষ ক' বৎসর তিনি যে অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করেছেন, তারও উদাহরণ দুর্লভ। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিজের রোগযন্ত্রণার কথা ভুলে তিনি সন্তানদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই চিন্তা করে গেছেন। ঋগ্বেদের বাণী স্মরণ হয় ঃ—

"অঙ্গাৎ অঙ্গাদ্ সম্ভবসি হৃদয়াৎ অধিজায়সে
আত্মাবৈ পুত্র নামাসি, ত্বং জীব শারদঃ শতম।"

অর্থাৎ "আমার শরীর মনের থেকে তোমার জন্ম। তুমি পুত্র নামক আত্মা। তাই তোমার শত শরৎকাল (শতবর্ষ) আয়ু হোক এই কামনা করি।" এ যেন দাদামশায়ের মনের কথা ছিল। তবে দাদামশায়ের নিকট পুত্রকন্যায় কোন পার্থক্য ছিল না।

তবুও যখন সব স্নেহের দাবী তুচ্ছ করে তাঁর এই আদরিণী কন্যা চলে

গেলেন, সে আঘাত তাঁর রোগজীর্ণ জীবনের অবশিষ্ট জীবনীশক্তিটুকুও হরণ করে নিল। মাসীর মৃত্যুর পর আট মাসও কাটল না। দুরারোগ্য নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ওয়াই, এম, সি-এর ওই ফ্ল্যাটেই ২৬শে জুন, ১৯৩৭ সনে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেশের সাংবাদিক মহলে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করছি :—

আনন্দবাজার পত্রিকা লিখলেন,

"শিশু-সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় গত শনিবার বেলা সাড়ে দশটার সময় তাঁহার হ্যারিসন রোডস্থ বাসভবনে নিউমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

"যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ১২৭৪ (?)* সালের ১২ই কার্ত্তিক ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নন্দলাল সরকার। ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার ইঁহার অগ্রজ। বাল্য-কালে ইনি দেওঘর বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'ন। তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি সিটি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। শৈশবকাল হইতেই সাহিত্য রচনার প্রতি ইঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। ইঁহার সরস রচনাগুলি তখন হইতেই বাঙ্গলার পাঠক-পাঠিকাগণ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার "হাসি ও খেলা" নামক বাঙ্গলা ভাষার সর্ব্বপ্রথম শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়। শিশুদের জন্য ১৩০১ সালে "মুকুল" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং প্রথম হইতেই যোগীন্দ্রনাথ উহাতে নিয়মিতভাবে লিখিতে থাকেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সিটি বুক সোসাইটি নামক একটি পুস্তকের দোকান স্থাপন করেন এবং বালক-বালিকাদের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহার রচিত গল্প ও পাঠ্য পুস্তকগুলি প্রকাশ করিতে থাকেন।

"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি "বন্দে মাতরম্" নামে বাঙ্গলার জাতীয় সঙ্গীত সমূহের একখানি সংগ্রহ পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বার্দ্ধক্যে অত্যন্ত অসুস্থতার মধ্যেও তিনি "বনে জঙ্গলে", "গল্প সঞ্চয়" প্রভৃতি শিশুপাঠ্য

* তারিখটি ঠিক নয়। ১২৭৩ সালের ১২ই কার্ত্তিক তাঁর জন্ম হয়েছিল।

পুস্তক রচনা করেন। ইনি প্রায় ৪০ খানি পুস্তক বাঙ্গলা দেশের বালক-বালিকাদিগকে উপহার দিয়াছেন। গত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ ইনি বঙ্গবাণীর সেবা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত "হাসিখুসি", "পশুপক্ষী", "হিজিবিজি", "চিড়িয়াখানা", "আষাঢ়ে স্বপ্ন" প্রভৃতি বাঙ্গলার শিশুদের চির আদরের পুস্তক। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলার শিশু-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।"

(১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৪)

* * * *

কয়েকদিন পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় এই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় :—

"শিশু-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল সন্দেহ নাই। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলা ভাষায় শিশুসাহিত্য বলিয়া বিশেষ কিছু ছিল না, আমাদের বাল্যকালে আমরা তাহার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। সেই সময় যাঁহারা আধুনিক যুগোপযোগী শিশু-সাহিত্য রচনায় প্রথম ব্রতী হন, যোগীন্দ্রবাবু তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। তাঁহার সচিত্র শিশুপাঠ্য গ্রন্থ, কবিতা, ছড়া প্রভৃতি সেকালের বালকবালিকা মহলে যে বিস্ময় ও আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা এখনও আমাদের মনে পড়ে। ……তারপর এই দীর্ঘকাল ধরিয়া যোগীন্দ্রবাবু শিশুদের জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে আরও বহু লেখক এই পথে অগ্রসর হইয়াছেন। বর্ত্তমানে বাংলা ভাষায় শিশুসাহিত্য অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ এবং ইহার মূলে যোগীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব খুবই বেশী, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৪৪)

* * * *

"সঞ্জীবনী" লিখলেন,

"বাঙ্গলা দেশে নূতন ধরণের শিশু-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বালক-বালিকাগণের প্রিয় গ্রন্থকর্ত্তা বাবু যোগীন্দ্রনাথ সরকার ৭০ বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে গত ২৬শে জুন পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৮৯১ সালে তাঁহার সরস শিশুসাহিত্য 'হাসি ও খেলা' নূতন ধরণে নানা বর্ণে ছাপা হইয়া সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ……প্রায় ৪০ খানি শিশু-সাহিত্য তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। ঐগুলি কেবল গল্প নহে, উহা নানা

বিষয়ের ছিল। পশুপক্ষী সম্বন্ধে নানা গল্প, ঠাকুরমার গল্প প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বালক-বালিকাগণের নীতিপূর্ণ সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা ঘুচিবার নহে।"

(সঞ্জীবনী, ১৭ই আষাঢ়, ১৩৪৪)

* * * *

সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকা লেখেন,

"সরকার মহাশয় প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বাঙ্গালীর সেবা করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই সেবা সার্থকতা লাভও যথেষ্ট করিয়াছে। যোগীন্দ্রবাবুর লেখায় গভীর পাণ্ডিত্য বা বাস্তবদাবাদীদের বাঁধা নিরিখের কবিত্ব হয়ত অনেকে দেখিতে পাইবেন না. কিন্তু যোগীন্দ্রবাবুর বৈশিষ্ট্য সেদিক হইতে নয়। তিনি শিশুদের চিত্তকে নাচাইতে জানিতেন, দোলাইতে জানিতেন, তাহাদের মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটাইতে পারিতেন। শিশুদের মনকে লইয়া এমন খেলা খেলিতে হইলে নিজেকেও শিশু হইতে হয়, রূঢ় বাস্তবের বিচারবিশ্লিষ্ট জগৎ হইতে নিজের দৃষ্টিকে সরাইয়া লইয়া শিশুদের কল্পনারাজ্যের দিকে সে দৃষ্টিকে ধ্যান রসিকতার সহিত নিবিষ্ট করিতে হয়। যোগীন্দ্রবাবু বাংলার শিশুদের সেবার এই পথ সাহিত্যের দিক হইতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার পরলোক গমনে বাংলা দেশ এবং বাংলা সাহিত্য একজন সত্যকার সাধককে হারাইল।"

(দেশ, ১৯শে আষাঢ়, ১৩৪৪)

* * * *

কৈশোরিকা নামক কিশোরপাঠ্য মাসিক পত্রিকা লিখলেন,

"যোগীন্দ্রনাথ শিশুদিগের সত্যিকার দরদী বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা শিশুদের জন্যই আজীবন নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি জানিতেন শিশুর মনোরাজ্যের রহস্যময় পরিচয়, তাই তিনি 'হিজিবিজি', ছড়াগল্পের ছন্দের ভিতর দিয়ে তাহাদের মনে আনন্দের চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এ আনন্দ-চাঞ্চল্য যে শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে একান্ত সহায়ক একথা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

"শিশুসাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথের দান অফুরন্ত। 'হাসিখুসি', 'গল্প সঞ্চয়', 'বনে জঙ্গলে', 'পশুপক্ষী', 'ছোটদের চিড়িয়াখানা', 'রাঙাছবি' প্রভৃতি পুস্তকের

রচনার ভিতর দিয়ে তিনি যে সুমধুর রসধারা পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন, রস-সন্ধানী শিশুচিত্ত চিরদিন তাহা উপভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবে। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাইতেছি।"

(কৈশোরিকা, শ্রাবণ, ১৩৪৪)

* * * *

"অগ্রগতি", "দুন্দুভি", "হিতবাদী" ইত্যাদিও শোক-সংবাদ প্রকাশ করে অনুরূপ শ্রদ্ধাসহকারে বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁর দানের কথা উল্লেখ করেন।

* * * *

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে সংবাদটি এইভাবে পরিবেশিত হয়:

"Mr. Jogindranath Sarkar who died last week-end in Calcutta at the age of seventy, could be described without any fear of exaggeration as a pioneer in the field of Juvenile literature in Bengali. He had, of course, his predecessors in Pandit Sivanath Sastri and Pramada Charan Sen and contemporaries in Upendra Kishore Roychowdhuri and Dwijendra Nath Bose, but he had one advantage over all of them— in the richness of variety and a catholicity in the choice of the subjects and mode of treatment, suiting almost all ages of children. A continuous stream of books issued from his well-known publishing firm—City Book Society—which, at one time, had the monopoly of Juvenile publications in Calcutta, and though ill-health in capacitated him for the last ten years, he never lost his interest in children, who were his daily companions and whom he knew, as few do, how to entertain. A generous and warm-hearted friend, his urbanity and snavity were remarkable and his memory will abide with those who knew him."

(The Calcutta Municipal Gazette, July, 1937)

(যোগীন্দ্রনাথ সরকার গত সপ্তাহান্তে সত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তাঁকে বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম দিশারী বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রমদাচরণ সেন প্রমুখ পূর্বসূরিগণ ছিলেন আর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

প্রভৃতি সমকালিনগণও ছিলেন কিন্তু এক বিষয়ে তিনি সকলকে অতিক্রম করে গিয়েছেন, তা হচ্ছে তাঁর বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য আর বিষয় নির্ব্বাচনে উদারতা। তার উপর আছে বলবার ভঙ্গী, যা শৈশব, বাল্য, কৈশোর সব বয়সের পক্ষেই উপযুক্ত। তাঁর বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সিটি বুক সোসাইটির নির্ঝ'র থেকে অবিশ্রান্ত পুস্তক-প্রবাহ বেরিয়েছে, যা একসময় কলকাতার শিশুসাহিত্য প্রকাশনীর অসপত্ন অধিকার ভোগ করেছে। ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুণ গত দশ বৎসর পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকা সত্ত্বেও শিশুদের সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ অটুট ছিল। শিশুরাই ছিল তাঁর সারাদিনের সাথী, কারণ তাদের চিত্তাকর্ষণের অন্যের অজানা কায়দাটি শুধু তাঁরই আয়ত্ত ছিল। ঔদার্য্য আর সৌহার্দ্যের মিশ্রণে, রুচির সঙ্গে কোমলতার মিলনে তাঁর চরিত্র ছিল অপূর্ব্ব। পরিচিতজনের হৃদয়ে তাঁর স্মৃতি চিরজাগরূক থাকবে।"

(ক্যাঃ মিঃ গেজেট, জুলাই, ১৯৩৭)

* * * *

মডার্ণ রিভিউ লিখলেন,

"Srijut Jogindranath Sircar, author, compiler and publisher of some forty illustrated Bengali books for children, died last month at the age of 70. He was the youngest surviving brother of Dr. Sir Nilratan Sircar. He entered life as a teacher in the City School, Calcutta. Subsequently he began to write books for little children and established a publishing and book-selling firm named City Book Society. About 43 years ago he along with late Mrs. Labanyaprabha Sarkar and Ramananda Chatterjee, persuaded the late Pandit Sivanath Sastri to become the editor of a new Bengali monthly for children, named "Mukul". Srijut Sircar contributed largely to its success. During the Bengal anti-partisan movement he published a collection of Bengali patriotic songs, under the litle "Bande Mataram". It was a very good compilation and had a phenomenal sale.........

Jogindranath Sircar still remains unrivalled in the field of Juvenile literature".

(Modern Review, July, 1937)

(যোগীন্দ্রনাথ সরকার গত মাসে সত্তর বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। একাধারে তিনি ছিলেন লেখক, সঙ্কলক এবং প্রকাশক, শিশুদের উপযোগী প্রায় চল্লিশটি সচিত্র পুস্তক তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের যে সকল ভ্রাতা জীবিত, তাঁদের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ ছিলেন। কলকাতা সিটি স্কুলে শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করে তিনি কর্ম-জীবনে প্রবেশ করেন। পরে তিনি শিশুদের জন্য পুস্তক রচনা করতে আরম্ভ করেন এবং সিটি বুক সোসাইটি নাম দিয়ে একটি প্রকাশন এবং পুস্তক-বিক্রয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। প্রায় তেতাল্লিশ বৎসর আগে তিনি, স্বর্গতা লাবণ্যপ্রভা সরকার এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে 'মুকুল' নামে একটি শিশু-মাসিক পত্রের সম্পাদনার ভারগ্রহণ করবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাঁদের আগ্রহাতিশয্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাতে স্বীকৃত হন এবং সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। ঐ পত্রিকার সাফল্যের পিছনে যোগীন্দ্রনাথের প্রচুর অবদান ছিল। বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনের সময় তিনি "বন্দেমাতরম্" নামে একটি দেশপ্রেমাত্মক গানের সঙ্কলন প্রকাশ করেন। সঙ্কলনটি যে খুব সুষ্ঠু হয়েছিল, পুস্তক বিক্রয়ের অবিশ্বাস্য সংখ্যাই তার প্রমাণ। ......যোগীন্দ্রনাথ এখন পর্য্যন্ত শিশুসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।"

(মডার্ণ রিভিউ, জুলাই, ১৯৩৭)

*　　*　　*　　*

যোগীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনতিকাল পরে শিশুসাহিত্যিক ৺সুনির্ম্মল বসু লিখলেন :—

"উপযুক্ত বয়সে যোগীন্দ্রনাথের তিরোধান হয়েছে এ জন্যে দুঃখ করবার কিছু নেই। দুঃখ এই যে জীবদ্দশায় তাঁকে বাংলাদেশ যথাযোগ্য সম্মান দেয় নাই। বাংলাদেশে শিশুসাহিত্যিকেরা চিরকালই অবজ্ঞাত, অপাংক্তেয়।...... যদি কোনদিন সত্যিকারের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়—তাতে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে যোগীন্দ্রনাথের কথা—এ আমার ধ্রুব ধারণা।"

*　　*　　*　　*

জলছবি সম্পাদক প্রভাতকিরণ বসু লিখলেন,

'তুমি এসেছিলে চির সুকুমার শিশুর মতন মনে,
এসেছিলে কচি কিশোর পরাণে আনন্দ-বিতরণে।

সহসা অকালে পাকিয়ে যাওয়ার বুড়িয়ে যাওয়ার দেশে,
আসনি কিন্তু মুরুব্বিদের মাতব্বরের বেশে।
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সেজে সবজান্তার রূপে
আসোনি বন্ধু, ছোট খেলাঘরে এসেছিলে চুপে চুপে।
তাই ত' যেদিন কিশোর ছিলাম, তোমারে আপন ব'লে
চিনিয়াছিলাম, বচনে তোমার তাই গিয়াছিনু গ'লে!
যা দিয়েছ দান, নিয়েছি মাথায়, রেখেছি মরমপটে,
রেশটুকু তার যায় নি মিলায়ে, জাগিছে স্মৃতির তটে।
আজো ফিরে যেতে রয়েছে বাসনা রঙীন খেলার ঘরে,
যেথা তুমি আছ অমর হইয়া অনাদিকালের তরে!

কি করিয়া লোভ করিলে দমন পরিণতদের মাঝে
খ্যাতির আসন করিতে দখল? নাম যাতে বেশী বাজে,
বেশী কোলাহল, বেশী জয়গান, বেশী মোহ-মাদকতা
চিরদিন ধ'রে শুনালে কেবলি ছোট ছেলেদের কথা!
ছেলেরা হয়েছে প্রবীণ যখন তোমারে দেখে নি ফিরে,
তাদেরো ছেলের দল আসিয়াছে আবার তোমারে ঘিরে।

ওগো চিরশিশু, রেখেছিলে মন চির নির্ম্মল ক'রে
চির-উজ্জ্বল আদর্শখানি উর্দ্ধে তুলিয়া ধ'রে!
হাসিতে খুসিতে যে শিক্ষা তুমি দিয়ে গেলে শিশুমনে
তুলনা তাহার দুর্লভ হেরি বিপুল অন্বেষণে!
কোথায় সে প্রীতি, কোথা সে মমতা, কোথা বিগলিত হিয়া?
শিশু-কল্যাণে কোথা তপস্যা জীবন বিসর্জ্জিয়া?
সস্তায় নাম কিনিতে মোদের দুশ্চেষ্টার তাড়া!
শিশুসাহিত্যে ওস্তাদী করি কম্পিত ক'রে পাড়া!
পড়িতে পড়িতে ভুলিবে যে লেখা, সেই লেখা চারিদিকে!
শিশুদের কাছে ডাকি নাই, যাই শিশুদের বই লিখে।

* * * *

মনোহরণের মন্ত্র শিখিব তাঁহার চরণতলে,
প্রথম যে মোরে করিয়াছে কবি, অসীম কৌতূহলে!
বিনয়ে এবং সারল্যে ছিলে চির প্রণম্য তুমি!
ছেড়ে চলে গেলে জয়ন্তীহীন মলিন জন্মভূমি!"

১৯৩৭ সনের ২৬শে জুন যোগীন্দ্রনাথের তিরোধান হ'ল। এরপর সেক্সপীয়রের ভাষায় "The rest is silence" বলতে পারলেই হ'ত কিন্তু

"শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?
আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জ্বলবে।"

জীবন প্রবাহ তো সমানে চলছে। তাঁকে স্মরণ করবার জন্য তাঁর উত্তরপুরুষরা —যাঁরা তাঁর রক্তের সম্বন্ধের বংশধর আর যাঁরা তাঁর আত্মার সম্বন্ধে আত্মীয় —অনেকেই তো আজও বর্ত্তমান। তাঁর দীর্ঘ সত্তর বৎসরের জীবনের শেষ ৭।৮ বৎসর মাত্র আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে। বাকী সবই আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ করে দিদিমা (যোগীন্দ্রনাথের পত্নী গিরিবালা দেবী) ও মেজমামার (যোগীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার) নিকটে শুনেছি।

২৬শে মে, ১৯৩৩ সনে তিনি আমাদের চার বোনকে একসঙ্গে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে দেখছি,

"আমি জানতাম গাছে আর আম নেই, কিন্তু এখন দেখছি, প্রায় সব গাছেই পাতার ঝোপের মধ্যে ৫।৭টা করে আম লুকিয়ে আছে! ঝড়ের দাপটেরও শেষ নেই, আমের লড়াইএরও অন্ত নেই!"

চিঠিখানি পড়ে অবধি এই কথাই মনে হচ্ছে যে, আমি জানতাম এতদিন পড়ে স্মৃতিপট ঝাপসা হয়ে গেছে, বেশী কথা মনে নাই কিন্তু এখন দেখছি যে অতীতকে ভুলিয়ে দেবার জন্য প্রাত্যহিক জীবনের "ঝড়ের দাপটেরও শেষ নেই" আর স্মৃতির "লড়াইএর অন্ত নেই।" দাদামশায়ের গাছের পাতার ঝোপের মধ্যে আমের মতনই মনের অতল গহনের পথহীন অরণ্যের মধ্যে লুকিয়েছিল কত কথা। স্মৃতিখাতার পাতায় পাতায় ধুলো জমেছিল মাত্র। আজ বাক্যের ফুৎকারে তাকে উড়িয়ে দিয়ে দেখছি, এখনও সে খাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে অনেক কথাই লেখা আছে।

গিরিডি আজও আছে, যদিও আমাদের শৈশবের সেই গিরিডি আর নেই। আমরা যে গিরিডিতে গোলকুঠির মাঠে ছুটোছুটি করে খেলা করেছি

আর ক্লান্ত হলে মাঠের ধারে ধারে সাজিয়ে রাখা শাদা উঁচু পাথরের আসনে বসে বিশ্রাম করতে করতে বারান্দায় উপবিষ্ট দাদামশায়কে দেখেছি, সে গিরিডি আর নেই। যে গিরিডিতে সকালবেলা উঠে গোলকুঠির প্রাঙ্গণে শিউলি গাছের ফুল কুড়িয়েছি, আর উশ্রী নদীর অগভীর জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে কখনও রুমালে করে চুখিয়া মাছ ধরেছি, কখনও বালির পাহাড় বা টানেল তৈরী করে খেলা করেছি, কখনও বা উশ্রী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ঘোর গর্জ্জনে বান আসা দেখেছি, সে গিরিডিকে আর হাজার চেষ্টা করলেও ফিরিয়ে আনা যাবে না। করণ শুধু আমরাই বড় হই নি, গিরিডিও বড় হয়েছে। সে এখন ধনী মাইকাওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের শহর। ওপারে যে ঝিলের ধারে শিকার করতে গিয়ে দুপুরে জেলে "বুধনা"র বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করে সন্ধ্যাবেলা একরাশ তিতির, ভাংহিল ইত্যাদি পাখী নিয়ে মামারা ফিরে আসতেন, সেই ঝিল আর জঙ্গলের ধারের গ্রাম লোপ পেয়ে সেখানে কলেজ হয়েছে। বোধহয় সেই জীর্ণ hanging bridge-এর বদলে পাকা bridge হয়েছে। গিরিডির যে শালের বন রবীন্দ্র-সঙ্গীতে অমর হয়ে আছে ("আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে" গানটি গিরিডিতে থাকতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। "শালের বনে থেকে থেকে, ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে" দ্রষ্টব্য), সেই শালবন নির্ম্মূল হয়ে গেছে। আরও হয়তো কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। পচম্বার দিকের "আধানাচুয়া" আর "দাশডিহি" নামের গ্রামগুলি কি আজও আছে? উশ্রী নদীর ১০।১২টি ঘাটের যে কোনটিতে দাঁড়িয়ে যে একদিন ওপারে দিগন্ত পর্য্যন্ত দেখা যেত, আর দূরে দেখা যেত খান্‌ডুলী পাহাড়, সে কি আজও দেখা যায়? ভাদুয়া পাহাড়ে যাবার পথে কি এখনও তেমনি খড় বোঝাই গরুর গাড়ী দেখা যায় আর দেখা যায় পথের পাশে সারিসারি গ্রাম? জানি না, শুধু জানি, সে গিরিডি নেই কারণ আমাদের শৈশবও নেই আর আমাদের দাদামশায়ও নেই। তাঁকে কলকাতায়ও দেখেছি কিন্তু গিরিডিতে তাঁকে যেভাবে দেখেছি, সেই কথাই বেশী মনে পড়ে। তাই আমাদের নিকট দাদামশায় মানেই গিরিডি আর গিরিডি মানেই দাদামশায়। উশ্রী নদী গিরিডিকে কত পাকে পাকে ঘুরে আজও নেচে নেচে চলেছে কিন্তু তার বাঁকে বাঁকে যে রহস্য একদিন ছিল, সে আর ফিরবে না কারণ দাদামশায় নেই। আর কোন শীতের দিনে গরম জামায় আপাদমস্তক মুড়ে তাঁর সঙ্গে

মোটরে তোপচাঁচি যাব না, তাঁর হয়ে চিঠি লিখে দেব না, অথবা শুনবো না তাঁর মধুর স্বরে রহস্যালাপ।

কিন্তু দাদামশায়ের কণ্ঠ কি একেবারে নীরব হয়েছে? তাঁর "খেলার সাথী", "আষাঢ়ে স্বপ্ন", "হাসিরাশি" ইত্যাদি রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি আজও নূতন যুগের নূতন শিশুদের গল্প বলে চলেছেন। তাঁর হাসিখুসি আজও অম্লান আছে। কান পাতলেই শোনা যায়,

"আদরের ধন শিশির শোভন
এ নব কুসুমহার,
ধীরে কাছে এসে সুমধুর হেসে
লয়ে যাও উপহার।"

(আবাহন— "ছবি ও গল্প")

আর শোনা যায় তাঁর আশীর্ব্বাণী :—

"হ'ক ভাই তোমাদের সুন্দর জীবন,
শত শত আশার কিরণ!
নিরাশার অন্ধকারে ল'য়ে যেন যেতে পারে,
নবশক্তি, নবোৎসাহ, উদ্যম নূতন,—
তোমাদের সুন্দর জীবন,
হ'ক ভাই, তোমাদের প্রফুল্ল জীবন,
স্নেহভরা আনন্দ-ভবন!
দীন অসহায় যারা, স্থান যেন পায় তারা,
মুছাইতে পারে যেন সজল নয়ন,—
তোমাদের প্রফুল্ল জীবন।
হ'ক ভাই, তোমাদের পবিত্র জীবন,
স্বরগের নন্দন-কানন!
ন্যায়, সত্য, সরলতা, বিকশিত হ'ক তথা,
সুধীর সৌরভে মত্ত করুক ভুবন,—
তোমাদের পবিত্র জীবন।"

(আশীর্ব্বাদ—"ছবি ও গল্প")

প্রথম খণ্ড—সংশোধন পত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	নীচে থেকে ২	মাতৃ সমাজের	মাতৃ স্বসাদের
৮	১	বয়ে না	বলে না
১০	১০	আস্তিনায়	আঙিনায়
১২	৫	সে নিছক	সে কি নিছক
১২	৮	তার	তাঁর
১২	নীচে থেকে ২	চলে না	চলে না।
১৫	১১	বলে	বশে
২৫	নীচে থেকে ৭	১৯৬৩	১৮৬৩
২৫	নীচে থেকে ৯	তার	তাঁর
২৭	৬	আরো	আর
২৭	৮	পংক্তিগুলি	পংক্তিগুলি হল
৩৬	৪	তার	তাঁর
৩৮	১	অনুরূপভাবে	অনুরূপভাব
৩৮	২১	ভারেরই	ভারেই
৩৯	৯	"লাসি রাশি"র	"হাসি রাশি"র
৩৯	২০	Sttnza	stanza
৪০	১৬	এমন একটা বর্ণনা	এমন একটা ব্যাপারের বর্ণনা
৪৫	১১	না পাড়ায়	না পারায়
৪৯	নীচে থেকে ৪	জানোয়ারের	জানোয়ারের দেশে
৫০	নীচে থেকে ২	Buttcr	Butler

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২	নীচে থেকে ৭	লেজের আসনেই	তিনি লেজের আসনেই
৫৩	১৪	কধা	কথা
৫৮	১৮	চিরকালালই	চিরকালই
৬০	৯	তাঁদেরকার	তাঁদের কার
৬০	নীচে থেকে ৪	বিপদ সে এড়াতে	বিপদ এড়াতে
৬৬	নীচে থেকে ৩	১৮৯১ সন) তখন পর্য্যন্ত	১৮৯১ সন পর্য্যন্ত
৬৭	১৪	জোগানের	জোগানর
৬৮	১	বিষয় নিয়ে	বিষয় নিয়ে
৬৯	২০	দুষ্টমী	দুষ্টুমী
৭০	২	দাময়ের	দামুর
৭৫	১৫	বাংলা শিশু	বাংলা শিশু সাহিত্যের
৭৫	১৮	কৌতুকরম	কৌতুকরস
৭৫	২৪	দাসগুপ্তকে	দাশগুপ্তকে
৭৬	নীচে থেকে ৬	কৌতুকরষ	কৌতুকরস
৭৯	৮	পোষমান	পোষমানা
৭৯	নীচে থেকে ৪	দেখা সম্ভব	দেখা পাওয়া সম্ভব
৮৬-৮৭	শেষ ছত্র ও প্রথম ছত্র	ইন্টারল্যুড নাটকে	ইন্টারল্যুড নামক লঘু বিষয়ক নাটকে
৯০	নীচে থেকে ৪	প্রতিঠিত	প্রতিষ্ঠিত
৯০	,,	সহযোগী	সহযোগে
৯৬	১১	যুগে	যুগের

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০১	১৭	দাড়ির	দাঁড়ির
১০২	৩	স্মৃরণ	স্মরণ
১০৪	১	গপ্পগুলি	গল্পগুলি
১১০	১৭	শিঝার	শিকার
১১১	নীচে থেকে ৩	তার	তাঁর
১১২	১২	ছাগলশিশু	ছাগশিশু
১১৩	৪	আকস্মিক	আকস্মিক
১১৩	১৫	নৃতনত্ত্ব	নূতনত্ব
১১৬	১	তাঁহার	তাঁহারা
১২০	২	ভবতু ভৃৎকৃপা	ভবতঃ কৃপা
১২১	নীচে থেকে ৫	লভে	লতে
১২৫	২	কুম	কুসুম
১২৬	১৯	মেমন	যেমন
১৩৭	১৯	ঘিয়ে ঘিয়ে	থিয়ে থিয়ে
১৩৮	৬	পুটুলীটি	পুঁটুলীটি
১৪০	১৯	শিশু কান্না	শিশুর কান্না
১৪০	নীচে থেকে ১	শিস্তকে	শিশুকে
১৪৪	১৯	ভুলাতে ভুলাতে	ভোলাতে ভোলাতে
১৪৫	৪	মাই গো	আই গো
১৪৯	১৭	মেয়ের বরণ	মেঘের বরণ
১৫৫	নীচে থেকে ৬	তাঁর	তার
১৫৯	নীচে থেকে ৭	পরে	পড়ে

দ্বিতীয় খণ্ড—সংশোধন পত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১১	তারা	তাঁরা
৩	১	যোগীন্দ্র নাথেয়	যোগীন্দ্র নাথের
৩	১৬	তাঁর অতিবাহিত	তাঁর শৈশব অতিবাহিত
৪	১৪	খাদ্য	খাদ্য
৪	নীচে থেকে ১১	প্রস্তুত	প্রস্তুত
৪	নীচে থেকে ২	ছিনু	তিনু
৫	৪	কলা খেয়ে	কলা খেয়ে
৯	১৪	বয়ঃপ্রাপ্ত ন	বয়ঃপ্রাপ্ত না
৯	১৬	যলজ্জ	সলজ্জ
৯	নীচে থেকে ২	একান্নবত্তা	একান্নবর্ত্তী
১৫	২৩, ২৬, ২৭, ৩০	মফতপুর	মকতপুর
১৮	৮	তাঁরা একজন	তাঁরা এক একজন
২০	১১	তার	তাঁর
২১	নীচে থেকে ৫	আনন্দ মোহন বসু সুতরাং	সুতরাং আনন্দ মোহন বসু
২৩	৩	পুস্তক	পুস্তক
২৫	৫	কবিতায়	কবিতা
৩১	১	একটু	একটু বিশেষ
৩৪	৩	তাঁর	তার
৩৬	২	ছিল	ছিলই
৩৭	১০	লেজ	"লেগ" (leg)

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮	নীচে থেকে ৬	তার	তাঁর
৪৬	নীচে থেকে ৪	ওদের	ওঁদের
৫১	২০—২১	প্রেমসঙ্গীত	প্রেমসঙ্গাত
৫৫	নীচে থেকে ৩	তা নয়	শুধু তাই নয়
৫৭	৭—৮	লোক এসে	লোক গোলকুঠীতে এসে
৫৮	নীচে থেকে ১১	স্মৃতিতেই	স্মৃতিতে
৫৯	নীচে থেকে ১১	মিয়া সুন্দরী	সিয়া সুন্দরী
৬৭	নীচে থেকে ২	তপ্ত বীজ	উপ্ত বীজ
৮০	নীচে থেকে ২	সুধীর	সুধার

গ্রন্থপঞ্জী

১। শতাব্দীর শিশুসাহিত্য—শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র
২। বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ—শ্রীমতী আশা গঙ্গোপাধ্যায়
৩। বাংলা শিশুসাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী—শ্রীমতী বাণী বসু
৪। সাহিত্য সাধক চরিত মালা (বিভিন্ন খণ্ড)—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
৫। রবীন্দ্র রচনাবলী—(বিভিন্ন খণ্ড)
৬। বাংলা সাময়িক পত্র (দুই খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। আত্মজীবনী—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী
৮। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী
৯। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস—শ্রীঅজিত কুমার দত্ত
১০। সাহিত্য চর্চ্চা—শ্রীবুদ্ধদেব বসু
১১। ব্রহ্ম সঙ্গীত—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কলিকাতা
১২। দেবদাস—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৩। আবোলতাবোল—সুকুমার রায়
১৪। বর্ণপরিচয় (প্রথম ভাগ)—ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর
১৫। পথের পাঁচালী—বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬। গড্ডলিকা—পরশুরাম

গ্রন্থপঞ্জী - ইংরাজী

1. Nonsense Rhymes — a Collection
2. The Animal Farm — George Orwell.
3. Short Stories — Somerset Maugham.
4. Indian Journal — Edward Lear.
5. Alice in Wonder land — Lewis Caroll.
6. Pilgrim's Progress — John Bunyan.
7. The Jungle Books or Mowglie Stories — Rudyard Kipling.
8. The Adventures of Baron Munchhausen Rudolph Erich Rapse
9. Gulliver's Travels — Jonathan Swift.

Journals and Reports

1. The Spectator — Joseph Addison.
2. Children's Books and International Goodwill Report and Books — 1932
3. Modern Review — July, 1937.
4. The Calcutta Municipal Gazette, July 3, 1937.

পরিশিষ্ট

যোগীন্দ্র রচনাবলী পরিচিতি

(ক) শিশু ও কিশোরদের জন্য রচিত বা সঙ্কলিত।

১।	আগমনী	...	...	২য় সংস্করণ
২।	আষাঢ়ে স্বপ্ন	...	...	১৮শ সংস্করণ
৩।	খুকুমণির ছড়া (সঙ্কলন)	...	...	১৬শ সংস্করণ
৪।	খেলার গান	...	...	৭ম সংস্করণ
৫।	খেলার সাথী	...	...	২৭তম সংস্করণ
৬।	গল্প-সঞ্চয়	...	...	৫ম সংস্করণ
৭।	ছড়া ও পড়া	...	...	১১শ ,,
৮।	ছড়া ও ছবি	...	...	১০ম ,,
৯।	ছবি ও গল্প	...	...	১৮শ ,,
১০।	ছবির বই	...	...	২৫শ ,,
১১।	ছোটদের উপকথা	...	...	৫ম ,,
১২।	নূতন ছবি	...	...	১৭শ ,,
১৩।	মজার গল্প	...	...	২৫শ ,,
১৪।	মোহনলাল	...	...	২য় সংস্করণ
১৫।	রাঙাছবি	...	...	৩১শ ,,
১৬।	শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী	...	...	
১৭।	হাসিখুসি, ১ম ভাগ	...	...	৯১তম ,,
১৮।	হাসিখুসি, ২য় ভাগ	...	...	৩৮তম ,,

১৯। হাসিখুসি (হিন্দি)	...	...	৩য় সংস্করণ
২০। হাসিখুসি (অসমীয়া)	...	...	বর্ত্তমানে লুপ্ত
২১। হাসিরাশি	...	...	৩৩শ সংস্করণ
২২। হাসি ও খেলা	...	...	২৪শ ,,
২৩। হাসির গল্প (সঙ্কলন)	...	...	১০ম ,,
২৪। হিজিবিজি	...	...	২১শ ,,

(খ) কিশোরদের জন্য রচিত রামায়ণ-মহাভারতের গল্প

১। অন্ধমুনি	...	...	২য় সংস্করণ
২। অভিমন্যু	...	...	২য় সং
৩। উশীনর	...	...	লুপ্ত
৪। একলব্য	...	...	৩য় সং
৫। কুরুক্ষেত্র	...	...	
৬। গান্ধারী	...	...	২য় সং
৭। ছোটদের রামায়ণ	...	...	৩৬শ সং
৮। ছোটদের মহাভারত	...	...	৩৪শ সং
৯। দ্রৌপদী	...	...	২য় সং
১০। ধ্রুব	...	...	৪র্থ সং
১১। নল-দময়ন্তী	...	...	৩য় সং
১২। প্রহ্লাদ	...	...	লুপ্ত
১৩। ভীষ্ম	...	...	লুপ্ত
১৪। রত্নাকর	...	...	২য় সং
১৫। লঙ্কাকাণ্ড	...	...	৪র্থ সং
১৬। লব-কুশ	...	...	৩য় সং
১৭। শকুন্তলা	...	...	৬ষ্ঠ সং
১৮। শ্রীবৎস	...	...	লুপ্ত

১৯।	সপ্তকাণ্ড রামায়ণ	...	...	১ম সং
২০।	সাবিত্রী-সত্যবান	...	...	লুপ্ত
২১।	সীতা	...	...	৫ম সং
২২।	সুভদ্রা	...	...	২য় সং
২৩।	হরিশ্চন্দ্র	...	...	৭ম সং

(গ) প্রাণিতত্ত্বমূলক

১।	ছোটদের চিড়িয়াখানা	...	...	৭ম সংস্করণ
২।	জানোয়ারের কাণ্ড	...	...	৫ম সং
৩।	পশু-পক্ষী	...	...	৫ম সং

(ঘ) শিকার কাহিনী

১।	বনে জঙ্গলে	...	...	৮ম সংস্করণ

(ঙ) স্বদেশী সঙ্গীত

১। বন্দে মাতরম্

(চ)	অন্যান্য বই	(কবিতার বই)	অধুনা লুপ্ত
১।	বিকাশ	(বয়স্কপাঠ্য কবিতা পুস্তক)	১ম প্রকাশ
২।	দীপ্তি	(„)	১ম প্রকাশ

———